তানসেন

উৎপল ভট্টাচার্য

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা

তানসেন-কে যাঁরা ভালবাসেন

অকস্মাৎ নয়ন সম্মুখে তাঁর নেমে এল কোমল লজ্জাশীলা আঁধার : নির্বাপিতদীপ আঁধার এক গৃহাভ্যন্তর! তাঁর দিব্যনেত্রের সামনে উদ্ভাসিত হ'লো অতি চমকপ্রদ এক দৃশ্য : সেই আঁধার গৃহ আলোকিত ক'রে এক দিব্যকান্তি পুরুষ দিব্যঙ্গনাদের সঙ্গে সহবাসে রত! সহসা—

সহসা ছেদ পড়লো। চমকিত বিস্ময়ে দিব্যকান্তি পুরুষ মুখ তুললেন! ফিরে তাকালেন! কোমল দৃষ্টি ওঁর ক্রমশঃ কঠোর হ'তে লাগলো। কঠোরতর হ'লো। অক্ষিগোলক দীর্ঘ হ'তে হ'তে দিক্‌চক্র আবৃত করে ফেললো। এবং শত সূর্যের প্রখর অগ্নিবাহী উত্তাপ বর্ষণে সমগ্র চরাচর দগ্ধ হ'তে লাগলো। কোথায় মুহূর্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল সেই কোমল অন্ধকার। সেই দিব্যকান্তি পুরুষ এখন প্রজ্জ্বলন্ত লোহিত-কান্তি! রক্তরাঙা সিন্দূরের মত অগ্নিবর্ষি লাল পোষাক ওঁর পরনে। অতিবৃহৎ উজ্জ্বল মোতির মালা ওঁর গলা বেষ্টন করে বিশাল কবাটবক্ষে লম্বমান। মদমত্ত হস্তীপৃষ্ঠে উনি আসীন। স্ত্রীগণ ওঁকে—সাহচর্য প্রদান করছে। কিন্তু উনি অস্থির! কে ওঁকে আহ্বান করছে? মর্ত্যভূমে এত সাহস কার? সেই হতভাগ্য কি জানে না যে এর একটিই মাত্র পরিণাম—মৃত্যু! তবে সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে স্ব-ইচ্ছায় আহ্বান করছে কেন? এতে তার কি অভীষ্টলাভ হবে?...

...অভীষ্টলাভ! যজ্ঞে আহুতি দেবার মুহূর্তে মর্ত্যধামের সাধক-শিল্পীর বুকের মধ্যে কথাটা গম্‌গম্ করে বেজে উঠল। আহুতি দিতে দিতে তিনি মনের মধ্যেই বলে উঠলেন,—না, প্রভূ! কোন ইষ্টাপত্তি নয়, তোমারই বাণীবাহক এই অধম কলাবন্ত—জীবনের অপরাহ্ণে আজ তোমারই শরণ আকাঙ্খায় এই কঠিন অগ্নিব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছে। তুমি আমার সহায় হও :

"প্যারে তুঁহি ব্রহ্ম, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ, তুঁহি মহেশ।

তুঁহি আদ, তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ, তুঁহি গণেশ

তানসেন কহে ব্যান তুঁহি, দেন তুঁহি রমন।
তুঁহি ঘর পলয়ুন, তুঁহি বরুণ তুঁহি দীনেশ॥"

যজ্ঞে শেষ বারের মত আহুতি দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন সুরাচার্য তানসেন। চারিপাশে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একবার। তাঁর মুখে হাসির রেশ জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল।

সমগ্র ভারতবর্ষই বুঝি আজ সমবেত হয়েছে দিল্লী মহানগরীতে। তামাম হিন্দুস্থানের শাহন্‌সা বাদশাহ্ সম্রাট আকবর বুঝতে পেরেছিলেন প্রভূত জনসমাগম হবেই। তানসেন দীপক রাগ গাইবেন। না জানি কি অলৌকিক কাণ্ড হবে। কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। সুতরাং মিত্রগণ, সামন্তরাজগণ আসবেন তো বটেই, সহস্র সহস্র প্রজাগণও আসবেন। বস্তুতঃ তাই ঘটেছে। গত পনের দিনে দিল্লী মহানগরী—জনসংখ্যার ভারে টল্‌মল্ হ'য়ে উঠেছে। সম্রাটের আদেশে সেই বিশাল জনমণ্ডলী ধারণপোযোগী প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপ প্রস্তুত করা হ'য়েছে।

কিন্তু সেই বিশাল সভামণ্ডপ উপ্‌চে পড়ে আজ লোকারণ্যের আকার নিয়েছে। রাজাগণ একদিকে, উজীরগণ অন্যদিকে। অর্ধ-বৃত্তাকারে বসেছেন সভাসদ্‌গণ; মধ্যমণি স্বয়ং সম্রাট আকবর। তাঁর ডানদিকে বসেছেন হিন্দুস্থানের সেরা ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়ের দল। এদেরই প্রবল প্ররোচনায় ভুলে বাদশাহ্ তানসেনকে দীপকরাগে সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে বাধ্য করেছেন। সম্রাটের বাঁদিকে রমণীকুল বসেছেন।

তানসেনের জীবননাশই যাদের কাম্য সেইসব ঈর্ষান্বিত ওস্তাদের দল চাপাস্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল:

সুজান্ খাঁ বলল,—'আমার বিশ্বাস হয় না যে তানসেন সত্যিই দীপক রাগ গাইতে সক্ষম।'

'আমারও প্রত্যয় হয় না।' দাউদ খাঁ ঢাঢ়ী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

সুরগিয়ান্ খাঁ বলল,—'আসলে ধাপ্পা দিয়ে সম্রাটকে মুগ্ধ করে রেখেছে তানসেন।'

'আসলে তানসেন "অতাঈ", সঙ্গীতশাস্ত্রে কোন জ্ঞানই নেই!' মুল্লা আস্হাক্ ঢাঢ়ী জোর দিয়ে বলে উঠল।

ফতেপুরী চান্দ্ খাঁ বলে উঠল,—'অথচ, লোকে বলে যে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরুয্ খাঁ বলল, "জানি, জানি। কিন্তু লোকেরা অজ্ঞ। তারা এসব গূঢ় ব্যাপার কি ক'রে বুঝবে?

'অথচ সমস্ত শহরে, দোকান-পাটে, আজারে-বাজারে, অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাবে—তানসেন, তানসেন! তাঁর মত মহান্ সঙ্গীতবিদ্ নাকি হাজার বছরের মধ্যেও আর হয়নি, হাজার বছরের মধ্যে আর হবেও না।' মদনরায় ঢাঢ়ীর কথা শেষ না হতেই— মহম্মদ খাঁ ঢাঢ়ী বলে উঠল,—'ফির্ ভী দীপক রাগ গানা ইত্নি আসান্ নহী হ্যায়,—এত সোজা নয় দীপক রাগ গাওয়া, স্বয়ং তানসেন হলেও নয়! যদি কোন রকম একটু ভুল হয়, হয়ে যায়, তো ফির্ বিগ্ড়ী তানোকো সুধারনা একদম্ না-মুম্‌কিন্—একেবারে অসম্ভব! গায়কের শরীর তখন একেবারে অঙ্গার হ'য়ে যাবে। সেই সন্তাপের পরিণাম—নিশ্চিত মৃত্যু!'

'তা বটে। যদি ভুল করে;' রামদাস মুন্ডিয়া মাথা নেড়ে নেড়ে বলে,—'কিন্তু ভুল করবে কেন? সবাই জানে সারা জীবন ধরে কি কঠোর সাধনায় লব্ধ জ্ঞান!'

'শুনেছি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, গুরু হরিদাস স্বামীর নির্দেশমত, অরণ্যের নিভৃতে বসে মোহাবিষ্টের মত সা থেকে নি থেকে সা"—বিষাদ মাথা স্বরে বলতে বলতে থেমে যায় মদন রায় ঢাঢ়ি।

'মিঞার বয়স বোধহয় সত্তর হলো প্রায়?' কেউ একজন বলল।

'বেশী! তার চেয়েও বেশী। প্রায় বৃদ্ধই বলা যায়!' অন্য একজন।

আরেকজন বলল, 'ছেলেমেয়েরা কত বড় হ'য়ে গেছে ! স্বাভাবিক ভাবেই তো বৃদ্ধ বলা যায় !'

'তা হ'তে পারে। তবে শরীর স্বাস্থ্য দেখে তো বেশ রূপবান তরুণ বলেই মনে হয় !' শহরে নবাগন্তুক একজন বলল।

'আমি তো গত বিশ বছর এই রকমই দেখে আসছি।' এই দিল্লী শহরেরই নাগরিক লোকটি সন্দেহ নেই।

তার পাশের জন বললে, 'ঠিকই বলেছেন। বিশ বছর আগেও তো মিঞাজীর বয়স পঞ্চাশের আশে পাশেই ছিল। কয়েকটি ছেলে-মেয়ের বাবা। অথচ দেখুন, সম্রাটের অমন নৃত্য-গীত-পটিয়সী সুন্দরী গুণবতী কন্যা, যার বয়স মাত্র উনিশ বছর, সেই মেয়েই কিনা তাঁর প্রেমে পড়ে গেলো !'

'তা প্রেম কি বয়স বিচার করে হয় নাকি ? আজব কথা একটা বললেন যা হোক !' একজন ধমকের স্বরে বলে উঠল।

'আচ্ছা, প্রেমের কথা থাক। আপনি বললেন, সম্রাটের কন্যা। তা এই কন্যা সম্রাটের কোন্ কন্যা ? মানে, কোন্ বেগমের ? সম্রাটের খাস্ বেগমের কন্যা কি ?' কৌতূহলী একজনের প্রশ্ন।

'অতশত জানি না, মিঞাভাই। আপনি মুখ তুলে ওই দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন ! সম্রাটের বাঁ দিকে চিল্‌মনের (ঝরোকা) আড়ালে মহিলাগণ বসেছেন। সম্রাটের ঠিক বাঁ দিকের প্রথম নারীই ওই কন্যা, যার নাম—মেহের !'

সকলেরই দৃষ্টি একবার চিল্‌মনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

তখনই তানসেন সভামধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। দীপক রাগের যজ্ঞ ও অর্চনা তাঁর শেষ হয়েছে। সভাস্থ সকলেই তাঁর দিব্য গৌর কান্তির দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও ভক্তিতে মাথা নত করতে বাধ্য হলো। কি এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে ! সেদিকে যেন বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না !

ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে বেদীর ওপর আসন গ্রহণ করলেন তানসেন। প্রতিজ্ঞায় অটল তার সুকোমল মুখমণ্ডল। মনে মনে

গুরুদেবেকে স্মরণ করলেন তিনি। গুরুদেবের আদেশ ছিলো ঃ অকারণে, অপ্রয়োজনে, অথবা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বাহবা পাওয়ার লোভে, নিজি করামৎ দেখানে কি কোশিষ্ মৎ কর্না—নিজের বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা করো না। তাতে নিজেরই হবে সব চেয়ে বড় ক্ষতি। কারণ, দীপক রাগের যে ভয়ঙ্কর তেজ তা স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবতাই সহ্য করতে পারেন না, তো কোন মর্ত্যগায়কের পক্ষে তা অতি মারাত্মক—সুরের আগুনে তার সমস্ত শরীর জ্বলে যাবে!

"প্রভু! তার কি কোন প্রতিকার নেই?" শিক্ষার্থী তানসেন বিনত প্রশ্ন রেখেছিলেন সাধক প্রভু হরিদাস স্বামীর পাদপদ্মে।

"আছে বৈ কি!" মৃদু হেসে গুরু হরিদাস স্বামী তাঁর প্রাণাধিক শিষ্যকে বলেছিলেন ঃ সুর ব্রহ্মস্বরূপ; তাতে তেজস্তত্ত্ব যেমন আছে, অপ্-ও আছে তেমনি। রাগভেদে যে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রকাশ পায়, তা তো জেনেছোই। দীপকের তেজে যেমন প্রবল অগ্নির সৃষ্টি হয়, তেমনই মেঘরাগের সঠিক প্রয়োগে বর্ষিত হয় বিপুল বারিধারা। কণ্ঠে যখন দীপক রাগ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে যদি তখনই কোনও সাধক সঙ্গীত-শিল্পী আবাহন করতে পারে মেঘ রাগকে সঙ্গে সঙ্গে সুরের সেই শীতল ধারাসার সেই আগুন নিভিয়ে দিতে পারে। তবেই জীবন রক্ষা। নচেৎ নয়।

কিন্তু, বাদশাহ্ আকবরের অতশত জানার কথা নয়। তিনি বোঝেননি বা বুঝতে চানও নি। তাই তানসেন যখন বললেন, "জাঁহাপনা! আমি জানি, তামাম হিন্দুস্তানে এখন আমিই একমাত্র জানি এবং পারি দীপক রাগে গান গাইতে। আর পারতেন গুরু হরিদাস স্বামী। সে তো আপনিও জানেন! কিন্তু—"

সম্রাট তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কোন কিন্তু নয়, মিঞা। দীপক রাগ শোনার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি। তুমি আমাকে ওই রাগ গেয়ে শোনাও!'

'কিন্তু, জাঁহাপনা! দীপক রাগ গাইলে আমার নিশ্চিত মৃত্যু!'

সম্রাট আকবর হা-হা করে সহজ, সরলভাবে হেসে উঠলেন। কি

যে বলো, মিঞা! গান গাইলে না কি আবার মৃত্যু হয়! আরে, তুমি হচ্ছো তানসেন। সঙ্গীতের "তান" দিয়ে তুমি "স্যায়ন্" করে দিতে পারো, দিল্‌কো ব্যহ্‌লা দেতে হো, মানে, শুদ্ধ ভাষায় কি যেন বলে?—

'হৃদয় দ্রবীভূত করা। তানসেন মৃদুস্বরে বললেন।

'হাঁ-হাঁ, তাই হবে। তবে, তুমি ওসব মৌত্-মৃত্যুর কথা কেন বলছো, মিঞা?

তানসেন বুঝলেন। বাদশাহের একবার যখন ইচ্ছা হয়েছে, কৌতূহল হয়েছে জানবার, তখন এঁকে নিবৃত্ত করতে যাওয়া অর্থহীন। গান তাকে গাইতে হয়ই। দীপক রাগও শোনাতে হবেই বাদশাহ্ কে। অগত্যা, স্বীকৃতি জানালেন তিনি বাদশাহ্‌কে। দীপক রাগ তিনি গাইবেন। তবে, এক পক্ষ কাল পর। তার আগে নয়।

বাদশাহ্ আকবর সানন্দে পনের দিন মঞ্জুর করলেন।

তানসেন চলে এলেন আপন গৃহে; রাজমহলেরই একান্তে তাঁর আপন মহলে। মনে মনে তিনি স্থির করেই এসেছেন। কন্যা সরস্বতী তাঁর অতিশয় গুণবতী। তিনি নিজেই কন্যাকে সর্বপ্রকার সঙ্গীতে পারঙ্গম করে তুলেছেন। মেঘ রাগও শিখিয়েছেন তিনি কন্যাকে। এইবার পরীক্ষা নিতে হবে কন্যার। কেবল মেঘরাগে ঠিক কতটা পারঙ্গম, সেই পরীক্ষা। কতটা সঠিক এবং শুদ্ধভাবে পরিবেশন করতে পারে—সেটুকু শুনে নিশ্চিন্ত হতে হবে। যদি বা সামান্য কোনও ত্রুটি থাকে, এই পনের দিনের মধ্যে তা ঠিক করে নিতে হবে। কারণ, শুদ্ধভাবে পরিবেশন করার ওপরেই তাঁর ভাল বা মন্দ, অবশ্যই শারীরিক, নির্ভর করছে। অবশ্য, এবিষয়ে তিনি আর একজনের সহায়তাও পাবেন। এইবার তাঁর মনে পড়ল। গুরুজী স্বামী হরিদাসেরই শিষ্যা রূপবতী এক্ষনে তাঁরই অতিথি হয়ে আছে। একথা তিনি ক্ষণকালের জন্য যেন ভুলে গেছলেন। যা হোক। রূপবতীও অতিশয় দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞা। একেও তিনি প্রস্তুত করে নেবেন। একজন যদিই বা কোন কারণে মাত্রাচ্যুত হয় বা কোনক্রমে স্বরের হানি ঘটায়,

অন্যজন তা সহজেই শুধরে নিতে পারবে। অবশ্য এমনটি হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবু!

মহলে প্রবেশ করে তিনি অনুচ্চস্বরে রূপবতীর নাম ধরে ডাকলেন।

রূপবতী স্নানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। তানসেনের আহ্বানে ভেতরের ঘর থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা। পরনের বেশ বাসে স্বভাবতই কিছুটা শিথিলতা। রূপবতী রূপসী নয়। কিন্তু বয়স অনুপাতে তাকে কাঁচা যুবতী বলেই ভ্রম হয়। তার কারণ, রূপবতীর অতি সুগঠিত লাবণ্যময় শরীর। বয়স তার তিরিশের ওপরে, পঁয়ত্রিশের আশে পাশে। তানসেন কন্যা সরস্বতীর চেয়ে অনেক বড়। গুরু স্বামী হরিদাসের সাক্ষাৎ শিষ্যা রূপবতী গুরুর নির্দেশেই এখানে, তানসেনের কাছে এসেছে। শিক্ষা সম্পুর্ণ করা তো বটেই, সুরের বরপুত্র তানসেনের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খাও কম ছিল না রূপবতীর মনে। রূপবতীর মনোভাব তানসেনের অজ্ঞাত নয়। তবু প্রত্যক্ষতঃ এখনও কোনও রকম দুর্বলতা দেখান নি। যদিও মনের অনেকখানিই তাঁর রূপবতী দখল করে আছে। তার একটা কারণ অবশ্য সঙ্গীত শাস্ত্রে রূপবতীর অবিসম্বাদিত অধিকার। সে জন্যেই কন্যা সরস্বতীর ওপর মূল দায়িত্ব দেবার পরও রূপবতীকেও প্রস্তুত রাখতে চান তিনি।

তাঁর সঙ্গীত জীবনের এক মহাক্ষণ উপস্থিত হয়েছে আজ! একদিকে সম্রাটের আকাঙ্খা পুরণ; অন্যদিকে তাঁর জীবন! যদিও বয়সের দিক থেকে তিনি পরিণত জীবনেই এসে পেঁাছেচেন। সেদিক থেকে তাঁর কোন বৃথা শঙ্কা নেই। তবুও তানসেন তানসেনই। সম্মানচ্যুত হয়ে জীবনের দাবী পুরণ,—না, সে তাঁর কাম্য নয়। সম্রাট আকবরের প্রীতি অভিষেকে তাঁর সৌভাগ্য পুষ্পিত ও ফলিত হ'তে দেখে যে সব ওস্তাদেরা ঈর্ষাপরায়ন হ'য়ে তাঁর জীবন নাশের এই উপায় উদ্ভাবন করেছে, তাদের সেই ষড়যন্ত্র তিনি কদাপি সফল হ'তে দেবেন না। বাদশাহ্ স্পষ্টতই তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পারেন নি। গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারেন নি তিনি। অবশ্য সম্রাট আকবরের চরিত্রের

এই বিশিষ্ট দিক্‌টি তানসেনের অজ্ঞাত নয়। সবকিছু জানার এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাঁকে সবসময় তাড়না করে। সেই তাড়নার পালে ঈর্ষান্বিত ওস্তাদদের প্ররোচনার বাতাস লেগে আরও উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে তাঁর মন-তরী, এটা তানসেন সহজেই বুঝতে পেরেছেন। তাই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই তিনি গৃহে এসে প্রথমেই রূপবতীকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আনতমুখী রূপবতীর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে তানসেন এগিয়ে গেলেন। দুই বাহু রূপবতীর দুই কাঁধে রাখলেন। অজ্ঞাতসারেই রূপবতীর সারাদেহ কেঁপে উঠল একবার! তানসেন ডান হাত রূপবতীর কাঁধ থেকে সরিয়ে চিবুকের নিচে রেখে ঈষৎ তুলে ধরলেন। রূপবতীর দৃষ্টি তখনও আনত। কি এক অধীর তৃষ্ণায় তার বুকের পুষ্পোদ্যান ঝটিকা—উচ্ছল!

'রূপবতী!' তানসেন মৃদুস্বরে ডাকলেন।

রূপবতী চোখ তুলে তাকালো।

'আজ থেকে পনেরদিন পর রাজসভায় আমাকে দীপক রাগে গান গাইতে হবে! কোনরকম ভনিতা না করেই বললেন তানসেন রূপবতীর চোখে চোখ রেখে।

'সে কি? রূপবতী চম্‌কে উঠল! 'কার আবদার পুরণের জন্য আপনি এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন?'

'আবদারই বটে।' মৃদু হাসলেন তানসেন। 'এ আবদার করেছেন স্বয়ং শাহান্‌সা বাদশাহ্‌ আকবর!'

না, না, এ তো অন্যায় আবদার! আপনি সম্মত হলেন কেন? রূপবতীর স্বরে যতটা অনুযোগ, উৎকণ্ঠা তার চেয়েও বেশী।

'সম্মত আমাকে হতেই হতো,' ধীর স্বরে বললেন তানসেন, 'অন্য কিছুর জন্যে না হোক, নিজের—তানসেনের, তোমার তানসেনের সম্মান রক্ষার জন্যেই অন্ততঃ!'

পলকে রূপবতীর লজ্জালু দুই গালে রক্তাভা ফুটে উঠল! তানসেনের বুকে মুখ লুকালো সে। সারাদেহ আর একবার থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল!

মুহূর্তকয়েক সেই স্পন্দন উপভোগ করে তানসেন বলতে লাগলেন, শোন রূপবতী। দীপক রাগে গান আমাকে গাইতেই হবে। রাজ-সভায়, অন্যান্য বরেন্য ওস্তাদদের সামনে। এখন আর দ্বিধার কোন অবকাশ নেই। আমি পনেরদিন সময় চেয়ে নিয়েছি অনেক ভেবেই। এই সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। কি তোমাদের করতে হবে, আপাততঃ তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। শোন !'—

তোমরা দুজন, সরস্বতী আর তুমি, পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে মেঘরাগের পূজার জন্য প্রস্তুত থাকবে। সময়-সঙ্কেত আমি যথাসময়ে জানিয়ে দেবো। দীপক রাগের যজ্ঞ এবং অর্চনা শেষ করে যখনই আমি দীপক রাগের আলাপ শুরু করব সেই সঙ্গে তোমাদেরও ঘরে মেঘরাগের পূজা সমাপ্ত করে ফেলতে হবে। যাতে মুহূর্তের ত্রুটিতেও কোন রকম বিপদপাত না হয়, সেজন্য ঠিক সময়-সঙ্কেত অনুযায়ী তোমাদের কাউকে মেঘরাগের আলাপ শুরু করে দিতে হবে। তুমি এবং সরস্বতী—তোমরা দুজনেই উপযুক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছো। তোমাদের মত সঙ্গীত-সাধিকা আছে বলেই আমি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। সরস্বতীই আলাপ শুরু করবে। কিন্তু তুমিও সতর্ক থাকবে। কোনরকম বিচ্যুতি ঘটলেই তুমি ধরে নেবে। আশা করি, এর বেশী তোমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না !'

রূপবতীর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল। বুকের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো, কিছুতেই যেন তা থামতে চাইছিলো না। সে কেবল রুদ্ধ স্বরে বলতে পারলো আপনি যেমনটি চাইছেন, তাই করবো।

তানসেন বুঝলেন। তবু স্থির স্বরে বললেন, "সরস্বতীকে তুমিই বুঝিয়ে বলে দিও ! আমিও সময়মত বলবো। এখন যাও ! তুমি তো স্নানে যাচ্ছিলে ? যাও ! স্নানাহার সেরে নাও। আমিও স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করে নিই একটু। তারপর সন্ধ্যেবেলা থেকে আমরা রেওয়াজ শুরু করব। এই পনেরদিন, নেহাৎ জরুরী প্রয়োজন না হলে, আমি আর দরবারে যাব না। যাও !'

রূপবতী ভেতরে চলে গেলো।

তানসেন একবার সভার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সভার চতুর্দিকেই বহুসংখ্যক প্রদীপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাঁরই কথা মতো। তানসেন বাদশাহকে বলেছিলেন, "জাঁহাপনা! আমার দীপক রাগে গান শুরু হবার পর যে মুহূর্তে ওই প্রদীপ গুলি আপনা আপনি জ্বলে উঠবে, সেই মুহূর্তেই আমি গান বন্ধ করে দেবো। আপনি আমাকে এই অনুমতি দিন!'

শাহান্‌সা বাদশাহ্ আকবর চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন একথা শুনে! বিস্ময় এবং অবিশ্বাস মাখানো স্বরে তিনি বলে উঠলেনঃ "বল কি তানসেন? তোমার গানের সুরের প্রভাবে ওই প্রদীপগুলি জ্বলে উঠবে? এ তো নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা! তুমি আমার ওপর যাদু টোনা করছো না তো?'

'না, জাঁহাপনা। আপনি স্ব-চক্ষে, স-জ্ঞানেই তা দেখতে পাবেন।' ধীর স্বরে বললেন তানসেন।

'বেশ, বেশ, তাহলে আমি অনুমতি দিলাম।' বাদশাহ্ খুশী মনেই মেনে নিলেন তানসেনের আর্জি।···

···তানসেনের দৃষ্টি সম্রাটের ওপর পড়ল। সম্রাট তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সকলেরই দৃষ্টি এখন তাঁর ওপর। তাঁর দৃষ্টি ঘুরে গেলো ঝরোখার ওপর। সেখান থেকেও বেগম ও তাদের অনুচরীদের বহুজোড়া চোখের দৃষ্টি তাঁরই দিকে।

মুখ ঘুরিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসলেন তানসেন। বাদশাহের কাছ থেকে সঙ্গীত আরম্ভ করার অনুমতি চেয়ে নিলেন। তারপর চোখ বুঁজে গুরু স্মরণ করে পাশে রাখা যন্ত্রটি হাতে তুলে নিলেন।

যদিও এখন ভরা দ্বিপ্রহর, তবুও পৌষ মাসের দিল্লী নগরীতে ভীষণ ঠাণ্ডা। আকাশ ঘন নীল। মেঘের লেশ মাত্রও নেই। সূর্য তাঁর দিবা পরিক্রমার পথে মধ্যগগনে এসে পড়েছে। কিন্তু রৌদ্র কিরণে

বিন্দুমাত্রও উত্তাপ নেই। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সে বাতাস সূঁচের মত পশমের পোষাক ভেদ করে সমবেত জনমণ্ডলীর হাড়ে হাড়ে কাঁপন তুলছে। রৌদ্রতাপে তার কিছুমাত্র উপশম হ'চ্ছে না। সকলেই নিজ নিজ পোষাক শরীরের সঙ্গে আরও লেপ্টে নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে গোলাকৃতি মঞ্চের উপরে আসীন সুরগুরু তানসেনের দিকে। তাদের সকলের চোখে মুখেই বিস্ময়! কারণ, তানসেনের উর্দ্ধগাত্রে কোন পোষাক নেই! কেবলমাত্র একটি ভাঁজকরা শুভ্র রেশম উত্তরীয় তাঁর গলা বেড় দিয়ে দুই স্কন্ধ থেকে লম্বমান। তাঁর গৌরবর্ণ শরীর থেকে যেন কি এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উনি কি শৈত্যবোধ করছেন না! এই প্রশ্ন, এই বিস্ময় সবার চোখে মুখে! কিন্তু কেউ-ই এই বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় আগ্রহী নয়। তাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা এখন আচার্য তানসেনের কণ্ঠে দীপক রাগের গান শুনে আপন আপন জীবন ধন্য করা।

সুরাচার্য্য তানসেন তম্বুরে সুর বেঁধে স্বনন তুললেন। তারপর তাঁর মন্দ্র-কণ্ঠস্বরে আলাপ সুরু করলেন। লঘু হতে দ্রুত্ তালে সঞ্চারিত দীপক রাগের গান তানসেনের কণ্ঠনিঃসৃত হ'য়ে সমগ্র পরিবেশে অচিরেই উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি করল। আলাপের এই প্রথম অভি-ঘাতেই সভাপ্রাঙ্গনে সমবেত জনমণ্ডলীর সকলেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, যেন বোধ করতে লাগল, তাদের শৈত্যবোধ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়। তাদের মনে হ'তে লাগল যেন প্রখর গ্রীষ্মের আবির্ভাব হ'য়েছে! অজান্তেই তারা তাদের পশমের পোষাকগুলির মুখ আলগা করে দিতে লাগল।

সঙ্গীত চলতে লাগল। এতক্ষণ প্রবল শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসে যে রৌদ্রতাপ অতি আরামদায়ক বলে বোধ হচ্ছিলো, এখন, প্রথম গীত শেষ হ'তেই সেই সুখদায়ক রৌদ্রতাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরিধানের পশম বস্ত্রাদি সকলেই গা থেকে খুলে ফেলল। সম্রাট, পারিষদবর্গ, সমবেত ওস্তাদগণ এবং অবশ্যই চিল্‌মনের আড়ালে সমবেত

বেগম ও অনুচরীরাও তাদের পরনের পশম আবরণ খুলে ফেলল। কেবল আকবর কন্যা মেহের, তানসেনের প্রেমিকা-বধূ, পরিবেশ বিযুক্ত হ'য়ে একমনে মঞ্চের দিকে, দয়িত তানসেনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সে তানসেনের ঘর্মাক্ত কলেবর। গৌরবর্ণ শরীর বেয়ে অজস্র ধারায় স্বেদ নির্গত হচ্ছে। তানসেন উত্তরীয়র একপ্রান্ত দিয়ে মুখমণ্ডলের স্বেদধারা মুছলেন। একবার, দুবার। পাশে রাখা পানীয় জলের পাত্র থেকে একচুমুক পান করলেন। তারপর তম্বুর তুলে নিলেন।

শুরু করলেন দ্বিতীয় গীত। মেহের এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আলাপ শুরু হ'তেই, মেহের অনুভব করলো, তার শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থিরতা শুরু হ'য়েছে! সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখমণ্ডলে এসে জমতে শুরু ক'রেছে। সে লক্ষ্য করল তানসেনের গৌরবর্ণ মুখেও কি এক অপার্থিব রক্তাভা! সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যেও অদ্ভুত এক অস্থিরতা দেখা দিল। একটু আগেও প্রবল শীতার্ত বাতাসে যারা পরস্পরের গায়ে গায়ে মিশে বসেছিল, এখন যেন আর কেউ কারো সামান্য স্পর্শও সহ্য করতে পারছে না। এ ওকে, সে তাকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে। রোদ্রের তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আর নেই। বরং মাঝে মাঝে গরম হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে লাগছে সবার গায়ে। পরিধানের জামাও কেউ গায়ে রাখতে পারছে না আর। এক এক করে সকলেই খুলে ফেলছে।

দ্বিতীয় গীত যখন শেষ হ'লো, মেহের সভয়ে দেখলো তানসেনের চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। যেন তাঁর দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে দুই চক্ষুর মধ্যে। মেহের জানে দীপক রাগ গাইলে শেষ পরিণতি কি। সে ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ভেবে মেহেরের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। সে জানে যে দীপক রাগের প্রভাব কাটাতে মেঘ রাগের আবাহন অনিবার্য্য। কিন্তু সে আবাহন হওয়া চাই নিখুঁত শাস্ত্রীয় ঢঙে। কোনমতে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলে সমূহ সর্বনাশ! মেহেরের যাবতীয় সঙ্গীত শিক্ষা তানসেনের কাছেই। অজানা বা

অনায়ত্ত। নয় তার কিছুই। তবু এই মুহূর্তে কি এক ভয়ঙ্কর শঙ্কায় তার দেহ যেন অবশ হয়ে আসছে। কিছুতেই যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে না। তবু মনে মনে সে মেঘরাগের আলাপ সুরু করে দিতে চাইল। কিন্তু গভীর আশঙ্কায় বা উত্তেজনায় কিছুতেই যেন আলাপে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছিলো না। ফলে উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল মেহেরের। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতলয়ে বাড়তে লাগল। উষ্ণ স্বেদধারায় দেহের পোষাক ভিজে গিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেল। অথচ ভয়ের ভয়ঙ্কর একটা শীতল স্রোত শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে প'ড়ে শরীরের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি শিরা উপশিরা গ্রন্থিকে যেন শিথিল করে দিতে চাইছিলো! হাত-পায়ের জোর যেন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিলো! কিছুতেই মনকে স্ব-বশে আনতে পারছিলো না মেহের।

ততক্ষণে তানসেন তৃতীয় গীত সুরু করে দিয়েছেন। আলাপ ক্রমশঃ বিস্তারে যেতেই মধ্যাহ্ন সূর্যের রৌদ্রতাপ ভীষণভাবে বেড়ে যেতে লাগল। এ বুঝি আর শীতকাল নয়, পৌষ মাস নয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন খরতাপে সমগ্র সভাপ্রাঙ্গনে সমবেত জনমণ্ডলীর যেন গাত্রদাহ সুরু হলো। চারিপাশের জড়-প্রকৃতি যেন ক্রমশঃ সচল হয়ে উঠতে লাগল। উষ্ণ-বাতাসের ঘূর্ণবাত সুরু হলো। সভাপ্রাঙ্গনের মাথার ওপরের শামিয়ানা ভেদ করে যেন অগ্নিবর্ষণ হ'তে লাগল। উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে শরীরের চামড়া পুড়িয়ে দিতে লাগল যেন। কেউ কারো শরীরের সামান্য স্পর্শেই চমকে উঠছে। এ বলছে ওকে—ভীষণ গরম হ'য়ে গেছে আপনার শরীর। সে বলছে তাকে—আপনার শরীরও ভীষণ গরম। আপনার বোধ হয় ভীষণ জ্বর এসেছে। বাড়ী চলে যান!

তৃতীয় গীত শেষ হ'তেই সুরগুরু তানসেন অনুভব করলেন তাঁর শরীর থেকে সমস্ত জলীয় পদার্থ যেন উধাও হ'য়ে গেছে। শরীরটা এখন যেন তাঁর সহজ-দাহ্য অঙ্গার! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে যেন! মনে হ'চ্ছে কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। বারে বারে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু জিভের জলও যেন শুষ্ক হ'য়ে

গেছে ! শরীরের মধ্যে সুতীব্র দহন। সমস্ত শরীর জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। কিছুতেই নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছেন না। তবুও এই অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ রূপ তাঁকে দিতেই হবে। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল রয়েছেন তিনি। যারা—যেসব ওস্তাদেরা তাঁর প্রতিভাকে হেয় করতে চেষ্টা করেছে, তাদের প্রতিভার দম্ভকে আজ তিনি চুরমার করে দেবেন। তারা যেন আর কোনদিনও মুখ তুলে তাকাবার স্পর্ধা না করে। এদের যত না সঙ্গীতশাস্ত্রে দখল, তার চেয়ে বাগাড়ম্বরে অনেক বেশী দড়। অশিষ্ট স্তাবকের দল কেবলই হাম্‌বড়ামীর ভান করে বাদশাহের অন্ন ধ্বংস করছে। এদের শরীরে লজ্জা বলতে কোন পদার্থ নেই। নিজেদের চরম অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য চরম কপটতার আশ্রয় নিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই তাদের। বুকভরা কেবলই হিংসা, দ্বেষ। পরশ্রীকাতর স্তাবকের দল তানসেনকে হেয় করার সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করে না। আজ তানসেন তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে নিবৃত্ত হবেন। সত্যকথা, এতে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হবে, জীবন সংশয় হবে। তা হোক। এখন আর মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। আর জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে সে ভয় তিনি কেনই বা করবেন ? এখন গুরু চরণের আশ্রয়ই তাঁর একান্ত কাম্য !

তানসেন একপাত্র জল চুমুক দিয়ে নিঃশেষে পান করলেন। কিন্তু ভেতরের শুষ্কতার কিছুমাত্র উপশম হ'লো বলে বোধ করলেন না। আবার সভাস্থলের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অসংখ্য, অগুন্তি শ্রোতার দল। কেউ একজনও নিজ স্থান ছেড়ে নড়ে নি। যদিও সকলেই বহির্বাস মুক্ত হ'য়ে বসে আছে। সমবেত ওস্তাদের দলও আদুর গায়ে বসে আছেন। স্বয়ং বাদশাহ্‌ এবং পারিষদ বর্গেরও একই অবস্থা। ঝরোখার আড়ালে বেগমদের অবস্থাও তিনি সহজেই অনুমান করতে পারলেন। মেহেরও সেখানে আছে, তা তিনি জানেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। সভামণ্ডপ ঘিরে শামাদান গুলিতে অজস্র প্রদীপ সাজানো। সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন উনি। এত জনসমাগম সত্ত্বেও চারিদিকে কেমন একটা থম্‌থমে অবস্থা। কি এক

আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় সমগ্র প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে। রৌদ্রতাপ এতই প্রখর হ'য়ে উঠেছে যে দূরে, শামিয়ানার শেষ সীমানার পাড়ে উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণের দিকে তাকালে দৃষ্টি ঝ'ল্‌সে যায়। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে স্থির হ'য়ে বসলেন সুরাচার্য্য।

তম্বুরে তান তুলে দীপক রাগের চতুর্থ ও শেষ গীতের আলাপ সুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত শ্রোতার দল অনুভব করলো যেন শত-সহস্র বিদ্যুৎ প্রবাহ তাদের মাথার ওপর দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। আর তাদের শরীরে জ্বলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা যেন তপ্ত কটাহের ওপর পড়ে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। অসহ্য হ'য়ে কেউ কেউ উঠে দাঁড়াতেই গরম হাওয়ার তীব্র হল্‌কা তাদের মুখ-চোখ-শরীর আরও ঝল্‌সে দিল। আবার বসে পড়ল তারা।

দ্রুত্‌ লঘু দ্রুত্‌ বিস্তার শেষ হয়ে গীত তুঙ্গে যে মুহূর্তে পৌঁছলো, সেই মুহূর্তে অসংখ্য শামাদানে সাজিয়ে রাখা অগুন্তি প্রদীপগুলি আপনা আপনি জ্বলে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে শামিয়ানাগুলিতে আগুন ধরে গেল! সমগ্র সভামণ্ডপই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের ফুট্‌কি ছুটতে লাগল চতুর্দিকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে সেগুলি পড়তে লাগল শ্রোতাদের মাথায়, গায়ে!

মস্ত কোলাহল উপস্থিত হলো। সকলেই কোনমতে শামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি সুরু করে দিল। প্রাণ বাঁচাতে সকলেই বদ্ধপরিকর। গানের বা গায়কের ভালমন্দ বিচারের অবসর এখন তাদের নেই। এখন আপন আপন প্রাণ নিয়ে পালানোতেই সকলে তৎপর হয়ে উঠলো। ওস্তাদের দল আলাদা এলাকায় বসেছিলেন। তারাই সকলের আগে শামিয়ানা ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলেন। তারপর পালালেন আমীর, ওমরাহ, সভাসদ-পারিষদের দল। তারা অবশ্যই বাদশাহ আকবরকেও একরকম জোর করেই মণ্ডপের বাইরে নিয়ে গেল। বাদশাহ্‌ একবার তানসেনের নাম করে কি যেন বলতে গেলেন। একজন পারিষদ নিশ্চিত করে বলল যে তানসেন নিশ্চয়ই এতক্ষনে মরে গেছে! কারণ সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে

যে গান শেষ করে তানসেন দাঁড়িয়ে উঠে উর্ধবাহু হয়ে পতনোম্মুখ জ্বলন্ত শামিয়ানা আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছিলো। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে !

তবু, এভাবে পালিয়ে যেতে মন চাইছিলো না বাদশাহের। তিনি একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে চাইলেন। সকলকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়েই বাধা পেলেন। বড়িবেগম রাকেয়ার শিবিকা নিয়ে বাহকেরা এগিয়ে এল বাদশাহের দিকে। আর রাকেয়া জোর করেই বাদশাহ্‌কে শিবিকার মধ্যে তুলে নিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হলো। বাদশাহের কোন কথাই রাকেয়া বেগম শুনলোনা।

শিবিকা দ্রুতবেগে প্রাসাদের দিকে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ মৃত্বস্বরে, যেন কতকটা আপন মনেই বলে উঠলেন, ,এ ভাবে আমার পালিয়ে আসা খুবই অন্যয্য কাজ হলো।'

বড়িবেগম রাকেয়া তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, 'হুজুর-এ-আলা ! আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। তানসেনজীর অমন খুবসুরত্‌ বদন আঁখ-এর সামনে অমন কালা হয়ে যেতে দেখে তাঁর পেয়ারী বিবি, আপনারই বেটি, মেহের, একেবারে পন্‌ছি-মাতা-কি-ভাঁতি পক্ষী-মায়ের মত তাঁকে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে !'

'বেশ করেছে, ভাল করেছে, মেহের উচিত কাজই করেছে ! কিন্তু সে একা কি করবে ?' বাদশাহ্‌ বেশ চিন্তিত ভাবেই বললেন।

'একা কেন ? বেগম রাকেয়া বলল, 'মেহেরের মা, মঝ্‌লিবেগম সালিমা সুলতানাও তো আছে ! সঙ্গে দাসী-ঝাঁদীও আছে।

'দাসী-বাঁদি দিয়ে কি হ'বে, আর মঝ্‌লি বেগমই বা কি করবে ?' বাদশাহ আকবর কিঞ্চিৎ অধৈর্য্যস্বরে বলে উঠলেন, ,'আসলে একজন বা তুজন হেকিমের জরুরত ছিল।'

"হেকিম ? হেকিম কি করবে ? বেগম রাকেয়া বলে উঠল, কোনও হেকিমের সাধ্য নেই কি এই বিমারির এলাজ্‌ করে। হেই আম্মা ! আজ যা দেখলাম, শুনলাম, এমন জীন্দগিভর না দেখেছি না শুনেছি। গানা গাইতে গাইতে শামদানের দীপ জ্বলে ওঠে, শামিয়ানায়

আগ লেগে যায়, এমন জারার (ঠাণ্ডা) সময় ধুপ রোদ এমন কড়ি হ'য়ে যায়, এমন গরম হাওয়া দিতে লাগে যে বদনের (শরীরের) চামড়ায় জ্বলন সুরু হয়ে যায়; সারা বদন পসিনা (ঘাম) হ'য়ে যায়! হায় আল্লাহ্! তবে কি হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে যাদু ভরা আছে?'

বেগমের এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। উত্তর দেবার চেষ্টাও করলেন না মহামতি আকবর। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে দিল্লী নগরীতে মহা সোরগোল পড়ে গেছে। বস্তুতঃ, হুলুস্থুল কাণ্ডই বাঁধিয়ে দিয়েছেন তানসেন দীপক রাগে গান গেয়ে। বেগমের প্রশ্নের তিনি উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু বিস্মিত তিনিও কম হন্ নি। গান গেয়ে, তা যে রাগেই হোক, এমন বিপর্যয়কর কাণ্ড ঘটানো যেতে পারে, এ যেন তিনি চোখে দেখে, কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ অবিশ্বাস করার মত কোনও সুযোগই নেই। তানসেনের যে এমন অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তা তো তিনি ভাল করেই জানেন। তাঁর মনে পড়লো সেই দিনটির কথা।

তখন তিনি মাত্র কয়েক বৎসর হলো দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। রেওয়া রাজ্যের অধিপতি রাজারামের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা হ'য়েছে। কয়েক বৎসর পর বিশেষ কার্যোপলক্ষ্যে তাঁকে রেওয়া রাজ্যে যেতে হয়। রেওয়ার অধিপতি রাজারাম বাদশাহ্ আকবরের উপযুক্ত আতিথ্যে কোন ত্রুটি রাখেন নি। সেই সময় একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর, সামনের বিস্তৃত বাগীচায় বেড়াচ্ছিলেন। এটা তাঁর নিত্যকার অভ্যাস!

বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা দূরে চলে এসেছিলেন তিনি। বাগীচাটি বেশ বড়। এক সময় তিনি ফিরে যাবার জন্য ঘুরলেন। ঠিক তখনই অপূর্ব এক সঙ্গীতের রেশ তাঁর কানে এসে বাজল। কি ছিল সেই সঙ্গীতে, বাদশাহ্ আকবর দাঁড়িয়ে রইলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। কতক্ষণ যে কেটে গেল! সময়ের কোন হদিশ তাঁর রইল না। তিনি সঙ্গীত শুনেছিলেন, সেই অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত; আর চোখে দেখেছিলেন। দেখছিলেন যেন ধব্‌ধবে সাদা মস্‌লিনের পোষাক পরা, সুন্দরী, রূপসী

পরীর দল বেহেস্ত থেকে নেমে আসছে, নেমে এল। বাগীচার ফুলগাছ-গুলোর ওপর এসে খেলতে লাগল আনন্দে, নাচতে লাগল!

স্থিরচিত্রের মত দাঁড়িয়ে থেকে, মোহাবিষ্টের মত শ্রবণে দর্শনে তিনি যেন আপ্লুত হয়ে গেলেন! তারপর একসময় যখন সঙ্গীত থেমে গেল, পরীরা কোথায় উধাও হলো, তখন তাঁর হুঁশ ফিরল। কিন্তু বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল তাঁর জন্য। বাদশাহ্ আকবর সহর্ষ চিত্তে লক্ষ্য করলেন বাগীচার সমস্ত গাছ ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! যখন তিনি বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন, তখন তো এত ফুলের সমারোহ তিনি দেখেন নি! সেই চিত্ত বশ করা সঙ্গীতের প্রভাবেই যে ফুল ফুটে উঠেছে, পরিবেশে এত আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে, এতে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। ঘরে ফেরার পথটুকু পার হ'তে হ'তে কেন জানি অকারণেই তাঁর মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে গেলো! বুকের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা! বাকী রাতটুকু তাঁর আর ঘুম হ'লো না। পরদিন সকাল বেলাটা কাজের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। দুপুরে, আহারের সময়, গতরাতের মোহময় সঙ্গীতের কথা বললেন বাদশাহ্ রেওয়াধিপতি রাজারামকে।

রাজারাম শুনে একটুও আশ্চর্য হলেন না। মৃদু হেসে তিনি কেবল বললেন, 'আজ সন্ধ্যের পর দরবারে, আপনারই সম্মানার্থে, সঙ্গীত নৃত্যের আয়োজন করেছি। সেখানেই আপনি চোখে দেখবেন, কানে শুনবেন। তবে আগেই বলে রাখছি, তামাম হিন্দুস্তানের শাহান্সা বাদশাহ্ আকবরকে, গুস্তাকি মাফ করবেন, গান শুনে সঙ্গীতকারকে যেন চেয়ে বসবেন না! জানি বলেই বলছি। তাহলে কিন্তু আপনাকে নিরাশ হ'তে হবে। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না।"

বাদশাহ্ কেবল মৃদু হাসলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। আহার সমাপ্ত করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর—

সহসা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে অতীত চারণের তন্দ্রাবেশ থেকে রূঢ় বাস্তবে নেমে এলেন বাদশাহ্। তারপরের কথা এখন থাক। অলস স্মৃতি নিয়ে খেলা করার সময় এখন নয়। তানসেন এখন কি অবস্থায় আছে সেটা জানাই জরুরী প্রয়োজন। শিবিকা বেগম মহলের সামনে

এসে থামতেই তিনি নেমে পড়লেন। একজন বান্দাকে ডেকে আদেশ দিলেন তৎক্ষনাৎ তানসেনজীর বাড়ী থেকে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসতে। তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে মেহের নিশ্চয়ই এতক্ষণে তানসেনকে নিয়ে তার বাড়ীর দিকেই গেছে! কিন্তু আগের ঘটনাটুকু তিনি দেখে আসবার সুযোগ পান নি।

গীত শেষ হ'তেই তানসেন বুকে দুই হাত চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সমস্ত সভামণ্ডপ তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। চারিদিকের বিশৃঙ্খলা. পলায়নরত শ্রোতৃবৃন্দের সমবেত কোলাহল, কিছুই তাঁর কানে যাচ্ছিলো না। তিনি অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুহাত মাথার ওপর তুলে বুকভরে যেন নিঃশ্বাস নিতে চাইলেন। তাঁর দেহটা টল্‌তে লাগল। স্থির হয়ে দাঁড়তে পারছিলেন না তিনি। এক্ষুনি হয়তো টলে পড়ে যাবেন।

এতক্ষণ ভীষণ উদ্বেগে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে যতনা গান শুনছিল মেহের তার চেয়েও বেশী আতঙ্কভরা বুকে অপলক তাকিয়েছিল তানসেনের দিকে। এখন তানসেনের অবস্থা দেখে ঝরোখার বাধা পেরিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে এসে মঞ্চের ওপরে তানসেনের পতনোন্মুখ দেহটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। কন্যাকে ওভাবে ছুটে চলে যেতে দেখে মেহেরের মা, মেজো বেগম সালিমা সুলতানাও ঝরোখার বাইরে ছুটে এসে-ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে এসেই তিনি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কন্যার বক্ষলগ্ন তানসেনকে দেখেই আর এগুনো সমীচিন বোধ করলেন না তিনি। ইতিমধ্যে আরও দুজন ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন তিনি মঞ্চের দিকে। চিনতেও পারলেন। দরবারেই দেখেছেন। বড় গায়ক। একজন বাবা রামদাসের সুযোগ্য পুত্র সুরদাস; অন্যজন বাজ বাহাদুর। অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন তিনি।

মেহেরের স্পর্শে দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন তানসেন। চোখদুটি তাঁর ঘোর রক্তবর্ণ। যেন এক্ষুনি বা যে কোন মুহূর্তে চোখ ফেটে রক্তধারা

বয়ে যাবে। তবু চিনতে পারলেন যেন মেহেরকে অতিকষ্টে। ক্যাস্-ফেসে গলায় বলে উঠলেন' 'আমাকে ঘরে নিয়ে চল ; এক্ষুনি !'

এক মুহূর্তের জন্য কেমন অসহায় বোধ করল মেহের। একা সে কি করে নিয়ে যাবে ! খুব দূরে না হ'লেও, কাছে তো নয় একেবারে তানসেনের মহল। নাকি বেগম মহলেই নিয়ে যাবে ! তখনই সুরদাস আর বাজ বাহাদুরকে মঞ্চে উঠতে দেখে তানসেনকে ধরে রেখেই একটু আলগা হ'য়ে দাঁড়ালো মেহের।

বাজবাহাদুর এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি সরে দাঁড়ান, বেগম। আমরা ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি ! এস, সুরদাস !'

প্রায় অর্ধদগ্ধ শরীর তানসেনকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বাড়ীতে নিয়ে এল তারা। পেছু পেছু মেহেরও এল।

তানসেন কন্যা সরস্বতী এবং শিষ্যা রূপবতী প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। তাড়াতাড়ি উঠোনেই শয্যা পেতে দিল। তানসেনকে সযতনে শুইয়ে দেওয়া হলো।

মেঘরাগের পূজা সাঙ্গ হয়েছে সময় মতই। যেমনটি পিতা তানসেন বলে গেছলেন, ঠিক সেই সময় মতই। কিন্তু যে মুহূর্তে পিতার অর্দ্ধদগ্ধ শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল, কেমন যেন আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল সরস্বতীর। কেবলই ওর মনে হ'তে লাগল—আমি ভুল আলাপ করবো, বোধ হয় আমার ভুলেই বাবা আর বাঁচবে না ! এই আতঙ্ক ওকে এমন পেয়ে বসল যে মাহেন্দ্রক্ষণ পার হ'য়ে যায় যায়, তবু ও নিজেকে সংযত করে উঠতে পারে না !

রূপবতী ওপাশ থেকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'কি হলো, সরস্বতী ! সময় বয়ে যাচ্ছে, আলাপ সুরু কর !'

রূপবতীর ধমক খেয়ে চেতনা ফেরে সরস্বতীর। সংহত হ'য়ে আসনে গিয়ে বসে। পিতাই ওর গুরু। পিতার নাম স্মরণ করেই মেঘরাগে আলাপ আরম্ভ করে। কিন্তু, অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভয়টাকে কিছুতেই দূর করতে পারে না সরস্বতী। মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটে অনিবার্য্যভাবেই। সুর বিকৃত হয়ে যায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে স্বর

নির্গত হ'তে চায় না আর। রূপবতীর দিকে ব্যগ্র, অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়।

রূপবতী প্রস্তুত হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে শুদ্ধ মেঘরাগে গান আরম্ভ করে দেয়। ক্রমশঃ রূপবতীর কণ্ঠের আকুতি তরঙ্গ তোলে প্রকৃতির বুকে। পরিবেশ, চতুর্দিকের পরিবেশ, হঠাৎই কেমন বদলে যায়। কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ ভেসে আসে আকাশের বুকে—প্রজ্বলন্ত সূর্যকে ঢাকা দিয়ে দেয়। গানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে,—সূর্যদেবকে সম্পূর্ণ আবৃত করে ফেলে। সমগ্র দিল্লী নগরীতে নেমে আসে মহাআঁধার! প্রবল বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলে দিকচক্র কাঁপিয়ে ধরণী ত্রস্ত করে ব'হে যেতে লাগল সহসা! সেই সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক এবং অশনিপাতে ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের আসন্ন সম্ভাবনা দেখা দিল। চারিপাশের প্রকৃতিও এই সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য সুরু করে দিল।

সমগ্র দিল্লী নগরীর জনগণ—সম্রাট থেকে ভৃত্য; ধনী থেকে দরিদ্র, প্রকৃতির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কিছুই বুঝতে পারল না! সকলেই জানে, প্রত্যক্ষ করেছে, মাত্র কয়েক দণ্ড আগে, গানের যাদুগর, সঙ্গীত-নবী-পয়গম্বর তানসেনজী, কিভাবে গান গেয়ে, প্রচণ্ড শীতের হাওয়াকে গরম হাওয়ায় বদলে দিলেন। কিভাবে মিঠা রোদ কড়া রোদে পাল্টে দিলেন। এখনও তাদের শরীরের জ্বালা কমে নি।

এরই মধ্যে কোথা থেকে এমন বাদলে ছেয়ে গেল আকাশ? এমন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠলো? ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে। এখনই হয়তো আসমান ভেঙে প্রবল বারিষ, ভীষণ বৃষ্টি শুরু হবে! কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও যার যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

ওদিকে, তানসেনের গৃহের প্রাঙ্গনের একধারে দাঁড়িয়ে বাজবাহাদুর, সুরদাস এবং মেহের চমৎকৃত হ'য়ে দেখছিল, শুনছিল। রূপবতীর গান শেষ হ'তেই এবার আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হ'য়ে অটল দৃঢ়তায় সরস্বতী মেঘরাগে দ্বিতীয় গান আরম্ভ করল।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছাপিয়ে সেই ঘোর ঘনঘটা অকস্মাৎ বারিধারার

রূপ ধরে অঝোর ধারে বর্ষিত হ'তে লাগল। এতক্ষণের শুষ্ক, তাপিত ধরাতল অভিষিক্ত হ'লো সেই প্রবল বর্ষনে। সেই প্রবল বারিধারা তানসেনের দগ্ধ অঙ্গের ও পরবিধাতার আশীর্বাদের মতো ঝ'রে পড়তে লাগল। তানসেনের দগ্ধ অঙ্গ সেই বর্ষাসারে শীতল হ'লো।

বর্ষণ একসময় থামল। আকাশে যত মেঘ ছিল ভেসে ভেসে তারা দুরদিগন্তের পথে পাড়ি দিল। নেমে এলো নিদারুণ শীতের অপরাহ্ন বেলা। তখন যেন সকলের হুঁশ ফিরে এলো। সুরদাস, মেহের, বাজবাহাদুর এতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে সরস্বতী ও রূপবতীর মেঘরাগের সঙ্গীতের প্রভাবে প্রকৃতির লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করছিল। এমন ঘটনা না তারা কোনদিন দেখেছে বা শুনেছে না বাকী জীবনে আর কোনদিন দেখবে বা শুনবে। এরা তিনজনেই সঙ্গীতের জগতে মান্যগন্য ওস্তাদ বলে খ্যাত। বাজবাহাদুর আর সুরদাস তো নিজেদের অপূর্ণতার কথা ভেবে ম্লান হ'য়ে গেল। আর মেহের! মেহের নিজেকে ধন্য মনে করল। গর্বিত বোধ করল যে ওস্তাদদের ওস্তাদ তানসেনের সে প্রণয়িনী-প্রিয়া!

সকলের আগে মেহেরই এগিয়ে গেল। প্রবল বারিধারায় সকলেই ভিজেছে। ভিজেছে না বলে স্নান করেছে বলাই ঠিক। সকলেরই পরিধানের বস্ত্রাদি শরীরের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। দুজন পুরুষের উপস্থিতিতে বিশেষ করে পর্দানসিনা বেগম মেহেরের লজ্জাই করছিলো। সরস্বতী এবং রূপবতীর অবস্থাও একই রকম। খাটিয়াতে শায়িত তানসেনের মাথার দিকে সরস্বতী ও পায়ের দিকে রূপবতী আচ্ছন্নের মত বসেছিলো। তারা বুঝি ঠিক করতে পারছিলো না কি করবে।

মেহের এগিয়ে গিয়ে সরস্বতীর মাথায় হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল, "এবার ওকে ভেতরে নিয়ে যাই চল! ভিজে কাপড়ে বেশীক্ষণ আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। সন্ধ্যে নেমে আসছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

এখন সঙ্কোচের কোন অবকাশ নেই। সুরদাস আর বাজবাহাদুর ধরাধরি করে তানসেনের নিস্পন্দ দেহ ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

দেহ নিস্পন্দ হলেও মৃদুভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে গুরু তানসেনের। তারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত বোধ করলেও, একটা মৃদু অস্বস্তির ভাব রয়েই গেল। তবু সাহস দেবার জন্য সরস্বতীকে সম্বোধন করে বলল, "কোনও চিন্তার কারণ নেই মা! তোমরা অসাধ্য সাধন করেছো। বিপদ কেটে গেছে। এখন উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তোমরা গুরুজীর ভিজে কাপড় চোপড় বদলে গা-হাত পা মুছিয়ে দাও! আর তোমরাও পোষাক পালটে নাও! আমরা এখন যাচ্ছি। আগামীকাল এসে সংবাদ নেবো।'

সুরদাস ও বাজবাহাদুর চলে গেল।

সরস্বতী মেহেরের বুকে অশ্রুসজল মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল: "আম্মাজী"!

কন্যাসমা সরস্বতীর মাথায়, পিঠে কেবল সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মেহের। সহসা কিছু বলতে পারল না। একটা উদ্গত ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস তারও গলার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছিলো। সে বুঝতে পারছিলো এখন, এই মুহূর্তে, সামান্যতম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে সেই ক্রন্দনোচ্ছ্বাস উন্মত্ত ঢেউয়ের মত তার কণ্ঠ হ'তে আছড়ে পড়বে। তাতে গুরু, পতি, তার দ্বিতীয়প্রাণ, তানসেনের শুশ্রূষার ব্যাঘাত ঘটবে। এই মুহূর্তে যা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। বুঝতে পেরেও অশ্রুজল রোধ করা মেহেরের পক্ষেও কষ্টকর হ'য়ে উঠছিলো। কেবলই চোখ দুটি জলে ভ'রে ভরে আসছিলো। তবু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে সরস্বতীকে বলল সে, 'যাও বেটি, ভিজে কাপড় পাল্টে এসো! তার আগে আমাকে একটা শুকনো ধুতী আর কামিজ দিয়ে যাও! আমি ওঁর—তোমার আব্বাজীর পোষাক পালটে দিই।' বলেই মেহেরের দৃষ্টি পড়ল রূপবতীর ওপর। রূপবতী তখনও পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল তানসেনের পায়ের কাছে। তানসেনের মুখের দিকেই স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি তার।

মুহূর্তে হৃদপিণ্ডে কিছু একটা যেন দংশন করল' মেহেরের! তবে তা ক্ষণেক মাত্র। ধীর, শান্ত স্বরে পরক্ষণেই খানিকটা আদেশ এবং

অনুরোধ মেশানো স্বরে রূপবতীকে লক্ষ্য করে মেহের সুমিষ্টস্বরে বলল, 'বহেন্! তুমিও যাও! ভিজে কাপড় পালটে এসো! এখন শোক করবার সময় নয়! যাও বহেন্!'

রূপবতী একবার মুখ ফিরিয়ে মেহেরের দিকে তাকালো। কি দেখলো সে-ই জানে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরস্বতীর সঙ্গে ভেতরে চলে গেলো।

সরস্বতী অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে এলো। হাতে ওর এক নয়, দু-প্রস্থ পোষাক। বাবার জন্য ধূতী ও কামিজ এক হাতে। অন্য হাতে পরিধেয় বসন মেহেরের জন্য। শাড়ী, বক্ষাবরণ, অন্তর্বাস এইসব।

'আম্মাজী!' সরস্বতী মৃদুস্বরে বলল, 'বাবার পোষাক পালটে আপনিও এই পোষাক পরে নিন! ভিজে পোষাকে আপনিই বা কতক্ষণ থাকবেন! অবশ্য আপনার উপযুক্ত পোষাক তো নেই। আপনার হয়তো অসুবিধা হবে।'

'আমার কিচ্ছু অসুবিধা হ'বে না, বেটি!' মেহের পোষাকগুলো নিতে নিতে বলল, 'এতেই যথেষ্ট হ'বে। তুমি যাও! তাড়াতাড়ি পোষাক পালটে নাও! তারপর কিছু খাবার তৈরী করো! তোমার আব্বাজীর জন্য ঠাণ্ডা শরবৎ তৈরী করো আগে। একটু বেশী করেই করো। তোমাদেরও প্রয়োজন হবে! যাও বেটি! তাড়াতাড়ি এসো!

পোষাকগুলো হাতে নিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল মেহের শয্যায় শায়িত তানসেনের, প্রিয় তান্নো'র অচেতন মুখের দিকে। না, —সময়ের ছোঁয়া এখনও তেমনভাবে পড়েনি তান্নোর মুখে। এখনও তেমনি সজীব টান্‌টান্ বদন! বুকের ভেতরটা হঠাৎ মুচ্‌ড়ে উঠল মেহেরের! কত দিন, কত যুগ আগে যেন ওই দেব-প্রতিম মুখের দিকে তাকিয়ে উনবিংশতি বর্ষিয়া বালা. শাহান্‌সা বাদশাহ্ আকবরের অহঙ্কারী কন্যা মেহের, মুজরুদ্দ, অপরিণীতা ; মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিলো। সেই আকাঙ্খার পুরণ হ'তেও দেরী হয়নি। কারণ,

স্বয়ং বাদশাহ্ আকবরই কন্যার সঙ্গীতগুরু রূপে তানসেনকে চেয়েছিলেন।....একটা দীর্ঘশ্বাস বুকভেঙ্গে বেরিয়ে এল মেহেরের !....

দ্রুতহাতে নিজের ভিজে পোষাক ছেড়ে ফেলল মেহের। সরস্বতীর দিয়ে যাওয়া গাত্র-মার্জনী দিয়ে কোনমতে দেহ মুছে নিয়ে শাড়ী, জামা সব পরে নিলো। তারপর প্রিয় তান্নো'র শয্যার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো !

প্রিয় তান্নো'র চেতনা ফিরেছে এর মধ্যে কখন ! তান্নো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ! কতক্ষণ ? ভাবনাটা মনে আসতেই মুহূর্তে যেন সেই কিশোরী বয়সে ফিরে গেল মেহের। কুরঙ্গলোচনা সেই কিশোরীকে স্পষ্ট দেখতে পেলো যেন সে। যার রূপগর্বিত আচরণ সখিজনকে মুগ্ধ করে; যৌবনের উপগমে আচরণে দেখা দেয় বিভ্রম ! কারণে, অকারণে হেথাহোথা চলে যায় চঞ্চল প্রজাপতির মত। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে রোষ প্রকাশ করে, কোন কাজে পারে না মন বসাতে; অস্থির হয়ে উঠে পড়ে কাজ অসমাপ্ত রেখেই। আবার এই উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যেই ক্ষণে ক্ষণে আপন চরনের নূপুরশিঞ্জন শুনে নিজেই সহসা স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে যায় ! এমনই এক সময়ে, দেবদুর্লভ কণ্ঠে সেই গান, গানের সুর, সহসা মেহেরের অনুভবের জগতে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব উন্মেষ ঘটিয়ে দেয় ! যৌবন উপগমের সেই অশান্ত ক্ষণে গানের সেই অর্থঁা, অনুভূতি, তার ভাবের জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়; তার সমস্ত অভিমান এবং রূপগর্ব মুহূর্তের মধ্যে অভিভূত করে ফেলে, একটা বিপর্যয়কারী বিপ্লবের মধ্য দিয়েও কি এক অতুল সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে মেহের নামে সেই যুবতী কিশোরী বা কিশোরী-যুবতী ! সেই গান যেন তাকে উদ্দেশ করেই বলেঃ এতদিন তুমি ছিলে নেহাৎই এক কিশোরী। এখন যৌবনশ্রী তোমার দেহধামে রাজনন্দিনীর সত্যরূপে ফুটে উঠেছে; তোমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার প্রিয় সখিগণের মতো নিজ নিজ রূপ-গুণ-শোভা-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হয়ে তোমার রাজনন্দিনী যৌবনশ্রীকে সাগ্রহে অভিনন্দন জানাচ্ছে !···শুনতে শুনতে মেহেরের অনুভবের জগত আকাঙ্খা আর অনুরাগে ভরে উঠেছিলো। তান-প্রতান, সূক্ষ্ম

গমকের নিস্বন, শব্দ-বাক্যের সেই অলৌকিক ধ্বনি ; যেন গানের চৌবন্দিতে মেহেরেরই ছবি এঁকে যাচ্ছিলেন সঙ্গীতের এই দৈবী-প্রতিভা। গুণীর হৃদয়ের প্রতিভার উন্মাদনার চরম সেই মূর্তি চিনে নিতে মেহেরের এতটুকু ভুল হয়নি সেদিন। আজ যেন সেই অনুপ-মুহূর্ত আবার রূপ পরিগ্রহ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মেহেরের।

চোখে চোখ পড়তে তানসেনের মুখে মধুর হাসির রেখা জাগলো !

ব্রীড়াময়ী মেহেরও এগিয়ে গিয়ে শয্যার ধারে দাঁড়ালো। কোন কথা না বলে তানসেনের ভিজা কাপড় মুক্ত করে শুকনো বস্ত্রাদি পরিয়ে দিল। অতিযত্নে শরীর মুছিয়ে দিল ওঁর। তানসেনকে তুলে বসালো মেহের। শয্যার ওপরেই। সুজনীটাও পাল্টে দিতে হবে। কিন্তু তুলে বসাতেই তানসেন টলে পড়তে চাইলেন। এখনও পুরোপুরি সচেতনতায় ফেরেন নি তিনি। এবং শরীর তো অপটু বটেই। মেহের সঙ্গে সঙ্গে টলায়মান দেহটা দু'হাত বেড়ে বুকের মধ্যে টেনে নিল। মেহেরের কাঁধে মুখ রেখে খুবই ক্লান্ত, অস্পষ্ট স্বরে তানসেন ডাকলেন ঃ —"মওরি !" আদর করে মেহেরকে "মওরি, ময়ুরী" বলেই ডাকতেন তিনি।

সমস্ত শরীরটা একবার কেঁপে উঠল মেহেরের ! অনন্ত সীমার পারে স্মৃতির কোন্ বীণার তারে ঝনন্ ঝনন্ রনন্ উঠল যেন ! দুচোখ জলে ভরে উঠলো। হাতের বাঁধনে দৃঢ় করে বেঁধে অস্ফুটে বলল মেহের ঃ "বল, তান্নো !"

হঠাৎ খুব স্বাভাবিক স্বর বেরিয়ে এল তানসেনের মুখ থেকে। "মওরি ! তুমি কখন এসেছো ?"

"আমি সব সময় তোমার পাশেই আছি, তান্নো।' কান্নাভেজা স্বরে মেহের উত্তর দিল।

"তাই থেকো, মওরি, যাবার সময় পর্য্যন্ত।—আহ্ !"

"তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ? তাহলে শুয়ে পড়ো ! আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি !' মেহের উদ্বেগাকুল স্বরে বলল।

"না। আমার কোন কষ্ট নেই।" তানসেন বললেন, আমাকে একটু বসিয়ে দাও।"

মেহের তাড়াতাড়ি তিনটে তাকিয়া সাজিয়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল তানসেনকে। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। কিন্তু গলার ভেতরটা তাঁর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঠোঁটদুটোও শুকনো লাগছে। যেন আগুনে ঝল্সে গেছে—এমন অনুভব করলেন। জিভটাও শুকনো। দু'একবার ঠোঁটে বুলিয়েও স্বস্তি পেলেন না।

মেহের বুঝতে পারলো। একবার মুখ ফিরিয়ে পেছনের দরজার দিকে তাকালো। সরস্বতী এখনও শরবত নিয়ে আসছে না কেন?'—

মৃদুস্বরে ডাকলো মেহের: "সরস্বতী, বেটি!"

সরস্বতী কোনমতে ভেজা পোষাক পাল্টে শরবৎ তৈরী করছিলো আর নিঃশব্দে অঝোর ধারে কাঁদছিল। হায়, হায়! ওর ভুলেই আজ পরমগুরু পিতা হয়তো মৃত্যুমুখে পড়েছেন! এ দুঃখের তো কোনও পারাপার নেই। ওর এই যন্ত্রণার কথা ও কাকেই বা বলবে আর কে-ই বা বুঝবে! কাকে ও বোঝাবে যে, যে মুহূর্তে ও শুনলো বাবা দীপক রাগ গাইবেন, গেয়ে শোনাবেন ভরা দরবারে; সেই মুহূর্ত থেকেই কেবলই ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে বলে উঠতে লাগল,—দীপক রাগ গাওয়ার পরে বাবা আর বাঁচবেন না! এইবারে তিনি চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাবেন, আমাকে, আমাদের সবাইকে!

তিন দাদা। একজনও এখানে নেই। সুরতদাদা আর সরত দাদা গোয়ালিয়রে মায়ের কাছে গেছে। তরঙ্গদাদা রয়েছে আগ্রাতে কোন কাজে। ছোট ভাই বিলাস গেছে ফতেপুর সিক্রিতে দাদিমার কাছে। অবশ্য মেহের আম্মাজী আছেন, তার পিতা সম্রাটের কাছে। কিন্তু এই বাড়ীতে এক রূপবতী ছাড়া ওর আর কোন সঙ্গী নেই। অবশ্য রূপবতী একাই একশ'। পিতার সঙ্গে গুরু শিষ্যার সম্পর্কের চেয়েও রূপবতীর হৃদয়ের টান আরও অধিক, এ সত্যও সরস্বতীর অগোচর নয়। তবু পিতার কিছু ঘটে গেলে রূপবতী কি আর এখানে থাকতে চাইবে! কোন্ সম্পর্কের জের টেনেই বা থাকবে! রূপবতীও তো

স্বামী হরিদাসেরই সাক্ষাৎ শিষ্যা। তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধ হ'য়েছেন বলেই তাঁর সেরা শিষ্য তানসেনের কাছে রূপবতীকে পাঠিয়েছেন শিক্ষা সম্পূর্ণ-করার জন্য। সে তো কবেই পূর্ণ হয়েছে। এতদিনে তো চলে যাবারই কথা রূপবতীর। কেন যায় নি, যেতে চায়নি রূপবতী, সরস্বতী অন্ততঃ তা ভালই বুঝতে পারে। এবং মনে মনে ও খুশীই হয়! পিতার মনোভাবও কিছুটা ও আন্দাজ করতে পারে বৈ কি! আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওর, রূপবতীর এখানে থেকে যাওয়া ঈশ্বরেরই অশেষ করুণা! ভাবতেই ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ হয়! লজ্জায়, ঘৃণায় নিজেকে শত আঘাত করতে ইচ্ছা হয়! পিতার এত যত্নে শেখানো বিদ্যা সবই কি ওর ক্ষেত্রে বিফল হ'লো! নইলে এমন ভুল ওর হলো কেন? ওর কি অজানা যে সুরেরও পরিমাণ আছে, আছে কথারও পরিমান, তাদের ওজনের তারতম্য ঘটলেই অতি যত্নে সাজানো সুরের ফুলগুলি ফুটে ওঠার আগেই একে একে ঝরে যায় দলগুলি; রাগগুলি পুষ্ট হ'য়ে ওঠার আগেই তাদের কঙ্কালের মত চেহারা বেরিয়ে পড়ে। তানসেনের বেটির কি এ তথ্য অজানা। তবু অমন শ্রীহীন সঙ্গীত ওর কণ্ঠ থেকে কি করে বেরিয়ে এল? কি করে ও এমন ভুল করতে পারলো? বিশেষ করে, গত পক্ষকাল ধরে পিতার কাছ থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি আয়ত্বে নিয়ে আসার পরও?

এমন সাংঘাতিক বিস্মরণ ওর কেন ঘটলো! চঞ্চল হয়েছিল ওর মন, অজানা আশঙ্কায় বিচলিতও হয়ে পড়েছিলো, এটাও সত্য; তাই বলে গানের তাল-বেতাল, সুর আর আন্দাজে এমন গরবর হয়ে যাবে! তখন পাশে যদি রূপবতী না থাকত এবং সেই ঐশী মুহূর্তে সার্থক করে না তুলতে পারতো সেই অপূর্ব আবির্ভাবকে·····! নাঃ! তার ভয়ানক পরিণতির কথা আর ভাবতেও পারে না ও!

স্নানাগার থেকে পোষাক পাল্টে বেরিয়ে রসুই-ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো রূপবতী। শরবৎ তৈরী ক'রে কাঁচের পাত্র হাতে নিয়ে সরস্বতী বসে আছে বিষাদময়ী প্রতিমার মতো। চোখ দুটি থেকে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরছে। সমবেদনায় আর্দ্র হলো রূপবতীরও

কোমল দুটি আঁখি। কিন্তু মেহেরের গলা শুনেছে সে। নিশ্চয়ই শরবৎ নিয়ে যেতে বলেছে তাড়াতাড়ি!

রূপবতী এগিয়ে গেল। যত্ন করে শাড়ীর অাঁচল দিয়ে সরস্বতীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন কান্নার সময় নয়, সরস্বতী। যাও! আম্মাজী তোমাকে ডাকছে! তাড়াতাড়ি শরবৎ নিয়ে যাও! ওঠো!

পাত্রে শরবৎ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সরস্বতী। একবার তাকালো রূপবতীর দিকে। সে চোখের দৃষ্টিতে কেবল অসীম কৃতজ্ঞতা! রূপবতী বুঝলো। মৃদু হেসে কেবল বলল, "আমাকে লজ্জা দিও না, সরস্বতী! তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শিকড় আরও অনেক গভীরে নিহিত। যাও! দেরী করো না!'

ঘরে ঢুকতেই মেহের বলল, 'আও বেটি! শরবতের পাত্রটা আমার হাতে দাও!' বলেই নজর পড়লো সরস্বতীর চোখের দিকে। অতি দুঃখের মধ্যেও মেহের নিঃশব্দে হাসলো। সস্নেহে বলল, 'বেটি! অভী রোনে কা ওয়ক্ত নেহী—এখন কাঁদবার সময় নয়! ডরনে কি ভী কোই বাত নেহী। এখন দরকার সেবা শুশ্রূষার। ইস্ সময় অগর তুম ভী রোতি রহোগী তো উন্‌কো সাহি-সালামত্ দেখ্‌ভাল্ কৌন্ করে গা?—ঠিকমত সেবা শুশ্রূষা করবে কে যদি তুমি—কেবলই কঁাদতে থাকো?

এইসময় তানসেনজী চোখ খুলে তাকালেন। কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়তে ইশারায় কাছে ডাকলেন। তাঁর দুচোখে স্নেহ-ভালবাসার উত্তাল সমুদ্র!

সরস্বতী বিছানার ওপরে পিতার পাশে বসতেই ওর মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তানসেনজী! পিতার হাতের ছোঁয়ায়, ভালবাসার উত্তাপে সরস্বতীর ব্যাকুল চিত্ত শান্ত হ'য়ে এলো।

মেহের পিতা-কন্যার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে সরস্বতীকে বলল, 'যাও বেটি! এবার তুমি আর রূপবতী কিছু খেয়ে নাও! দিনভর অনেক ধকল গেছে! আমি ততক্ষণ ওঁকে শরবৎ

খাইয়ে দিচ্ছি !"

সরস্বতী উঠতে উঠতেই একবার বাবার দিকে তাকালো। উনিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সরস্বতী। মেহেরকে লক্ষ্য করে বলল, 'আম্মাজী! আপনিও তো দিনভর কিছুই খান নি। কিছু নেবেন না? একটু শরবৎ নিয়ে আসি?"

"তোমরা যাও! খেয়ে নাও! একটু পরে পাঠিয়ো আমার জন্যে।"

সরস্বতী আর কথা না বলে চলে গেল।

মেহের শরবতের পাত্র নিয়ে আধশোয়া হ'য়ে বসা তানসেনের পাশে শয্যাতেই বসলো। তিনি চোখ বুঁজে আছেন। অতি ধীর গতিতে তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে। ঠোঁট দুটো খুবই শুকনো লাগছে। সমস্ত মুখটাও ফ্যাকাশে। যেন দেহের সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নেবার ফলেই মুখ চোখের সেই সতেজ উজ্জ্বলভাব আর নেই! সেই মুখ! সেই চোখ! মনে পড়ে গেল মেহেরের।·········খিড়্‌কীর আগড় সামান্য একটু ফাঁক করে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলো সেই উনিশবছরের যুবতী, সম্রাট দুহিতা। স্বয়ং সম্রাট পিতাও দাঁড়িয়ে আছেন একটু পেছনে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কন্যার মুখভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিলেন।....

খানিক পরেই নিঃশব্দে আগড় বন্ধ ক'রে ফিরলো সম্রাট দুহিতা। পিতার দিকে তাকালো। ইশারায় তাকে সরে আসতে বললেন পিতা।

"দেখা, বেটি?" সম্রাট প্রশ্ন করলেন কন্যাকে, "দেখেছো? গওর্ সে দেখা?"

"হাঁ, আব্বাজান!—দেখেছি বাবা!' কন্যা সলজ্জস্বরে উত্তর দিল, "ভাল করেই দেখেছি!"

"ক্যয়া খ্যায়াল্ হ্যায়, তুম্‌হারী?—কি মনে হ'লো তোমার?" সম্রাট সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন কন্যাকে।

"কি রকম যেন দুঃখ বা বেদনায় কিংবা কোন অনির্দেশ্য চিন্তায়

বিমর্ষ, বিষাদগ্রস্ত হ'য়ে বসে আছেন, অন্‌জান্ ফিক্র্ মে খোয়া সা······!
আব্বাজান! উনি কে?" কন্যা প্রশ্ন করলো এবার!

পিতা আর কন্যা বারান্দা দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে যেতে কথা—বলছিলেন। পিতা কন্যার পিঠের ওপর স্নেহের হাত রেখে চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটলেন। তাঁর অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চলতে চলতেই তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেহের বেটি! তোমার গানা-বাজানা কেমন চলছে?"

কন্যা মেহের সম্রাট পিতা আকবর-এর মেজাজ-মর্জির খবর ভাল-মতই জানে। সে বুঝতে পারলো যে পিতা কোন কারণে সেই ব্যক্তির পরিচয় এক্ষুনি দিতে চাইছেন না হয়তো। যে কারণেই হয়তো তিনি চুপে চুপে জানালা দিয়ে লোকটাকে ভাল করে দেখতে বলেছিলেন। যাই হোক। পিতার প্রশ্নের উত্তরে মেহের বলল, "মিঞা খোদাবকস্‌জী বীমারিতে পড়েছেন। এখন তাই মিঞা মস্‌নদ আলী খাঁ-জীর কাছে তালিম নিচ্ছি, আব্বা!"

"কেমন হ'চ্ছে তালিম?" প্রশ্ন করলেন আকবর।

মেহের একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর চোখ তুলে একবার পিতার মুখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে হেসে ফেলল।—"উনি তো সবসময় খালি খাচ্ছেন! বদন যা হ'য়েছে, হাথী ভী তুলতে পারবে না। গলা দিয়ে তো আওয়াজ বহুত কষ্টে বেরোয়! ওরই মধ্যে যা যা বলেন, আমি তুলে নি।

"হুঁ! বুঝেছি।" সম্রাটও মৃদু হাসলেন। "ওঁরা সব গুণী-জ্ঞানী। কত দিন রাত আমার ওঁদের সঙ্গে আনন্দে কেটেছে! এখন একটু আয়েশী হ'য়ে পড়েছেন। তা যাক। ওঁদের কাছে আর তোমাকে যেতে হবে না। এবার থেকে তুমি ঐ যাকে দেখে এলে, ওঁর কাছে যাবে। ওঁর মতো গুণী ওস্তাদ; শুধু ওস্তাদ নয়, বলা উচিত ওস্তাদোঁ-কে-ওস্তাদ-ওস্তাদদের ওস্তাদ উনি, অনেক কষ্টে, অনেক বিনতি করে, অনেক খোসামদ করে তবে ওঁকে এখানে আনতে পেরেছি; ওঁর মতো ওস্তাদ হিন্দুস্তানে কেউ নেই!"

"আব্বাজান! আপনিও তো তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহ্! উনি এমন কি বড় ওস্তাদ যে আপনাকে খোসামদ্ করে নিয়ে আসতে হলো?" আসলে পিতার কথা শুনে বাদশাহ্ কন্যার অহঙ্কারে কোথায় যেন একটু চোট লেগেছে! তাই মেহের এমন কথা এত' সহজভাবে বলতে পারলো!

সম্রাট আকবরও তা সহজেই বুঝলেন। বুঝেই এখনও নাবালিকা কন্যার অজ্ঞতায় মনে মনেই হাসলেন। সস্নেহে বললেন, "বেটি। তুমি যখন ওঁর কাছে গান শিখবে তখন বুঝতে পারবে। অবশ্য উনি যদি তোমাকে শেখাতে রাজী হন তবেই!"

বাদশাহ্ আকবরের কন্যাকেও শেখাতে রাজী হবেন না?" অহঙ্কার মেশানো বিস্ময়ের স্বরে মেহের বলে ওঠে।

"রাজী হবেনই না, তা বলছি না," সম্রাট কেমন যেন অন্যমনস্কস্বরে বলতে লাগলেন, "ওস্তাদ লোকেরা একটু খেয়ালী হয় তো! তাঁরা কোনও রাজা বাদশার হুকুমের পরোয়া করে না, মাথা নোয়ায় না কারো কাছে, কেবল দীন দুনিয়ার মালিক খোদার কাছে ছাড়া।"······....

······হঠাৎ বাহুতে স্পর্শ লাগতেই চিন্তার জগতে হারিয়ে যাওয়া মেহের সচেতন হলো! তানসেন কখন চোখ মেলেছেন। তাকিয়ে আছেন মেহেরের মুখের দিকে। তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা। চোখে চোখ পড়তেই বড় লজ্জায় শরীরের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল মেহেরের! কত প্রতীক্ষার সময়, কত প্রহর, কত মুহূর্ত, কত রাত্রিদিন কি এক অসহ ভাবনার ভারে কেটে যাচ্ছে! তাঁরই চিন্তায় আমার তনুমন আচ্ছন্ন, আমার আহত চেতনা শূন্য হ'য়ে গেছে! সেই আমার কমনীয় প্রিয়তমকেই তো আমি সব কিছু সঁপে দিয়েছিলাম। তবু আমার প্রীতম কোথায় যে হারিয়ে গেল! আমার নিজের চেয়ে তাঁরই ওপর যে আমার সারা জীবনের শান্তি আশ্রিত ছিলো! তবে কি এতদিনে প্রিয়তম তা বুঝেছে! মনে হ'তেই অনামা সুখের আবেশে বাষ্পাচ্ছন্ন হলো চক্ষু দুটি!

"মণ্ডরি! কি হয়েছে?" মৃদু, ক্লান্তস্বরে তানসেন বললেন।

"কিছু হয়নি। তুমি শরবতটুকু খেয়ে নাও!" তাড়াতাড়ি শরবতের পাত্রটা মুখের কাছে ধরলো। তারপর মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলো : ছি, ছি, কতক্ষণ আগে না জানি শরবত দিয়ে গেছে সরস্বতী! সেই সময়ের হিসেবটুকুও ওর নেই। নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো।

কয়েক চুমুক খেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন তানসেন।—'আর ভাল লাগছে না! আর খেতে পারবো না, মওরি!'

"অউর থোড়া পিয়ো, আর একটু খাও! নইলে আরও দুর্বল হ'য়ে যাবে যে!' মেহের মিনতি করলো, "দিনভর কুছ খায়া ভী নেহী— কিছুই তো খাওয়া হয়নি সারাদিন!"

তানসেন মাথা নাড়লেন। "তুমি কখন এসেছো, মওরি? কিছু খেয়েছো? সরস্বতীকে ডাকো! সে কোথায়?"

মেহের কি বলতে যাচ্ছিলো, সেই সময় বাইরের দরজার দিকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। সরস্বতীর গলা শুনতে পেলো মেহের —"অনেকটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কথাবার্তাও বলছেন! আম্মাজী আছেন! এইদিকে আসুন!

মেহের বুঝতে পেরেই শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তানসেন তেমন কিছু খেয়াল করেননি। জিজ্ঞাসু চোখে মেহেরের দিকে তাকালেন।— 'তুমি উঠলে কেন, মওরি? এখনই চলে যাবে?"

তানসেনের স্বরে যে কি আকুতি ছিলো। বুঝতে পেরেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো মেহেরের!—'আমি যাচ্ছি না, তান্নো! আব্বাজান, সম্রাট আসছেন! তোমাকে দেখতে, খবর নিতে। তাই!" বলে তানসেনকে বসিয়ে চাদরটা টেনে দিল বুক পর্য্যন্ত। তারপর একপাশে সরে দাঁড়ালো!

সরস্বতীর পেছন পেছন সম্রাট আকবর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। সোজা আধ-শোয়াবস্থায় তানসেনের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে চোখে স্পষ্টতঃই অপরাধী ভাব! দৃষ্টি সরিয়ে শয্যাপাশে দাঁড়ানো কন্যা মেহেরের দিকে একবার তাকিয়েই ধীরপায়ে এগিয়ে

গেলেন শয্যার দিকে। মেহের চোপায়া আসনটা এগিয়ে দিল শয্যা-পাশে। সম্রাট বসলেন। মেহের সরে এলো।

সম্রাটের দিকে তাকিয়ে তানসেন যুক্তকরে প্রণাম করতে যেতেই সম্রাট নিজের দু'হাতে তানসেনের দুটি হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, "মিঞাজী! ম্যয় বহুত্ শর্মিন্দা হুঁউ! আপ্ মুঝে মাফ্ কর দিজিয়ে! আমি সত্যি কথাই বলছি! আমার জেদ্ বজায় রাখতে গিয়ে আপনাকে যে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে, আপনি বলার পরেও, আমি তার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। স্বীকার করি, আমার বোঝা উচিত ছিল। সঙ্গীত-কলায় আমিও তো একেবারে অনভিজ্ঞ নই। কিন্তু, আমার যে নতুন বস্তুর প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা! আমার কৌতূহলের যে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না! এ তো আপনি জানেন! তবে আজ আপনি আমাকে, দেশবাসী রসিকজনদের, যা শোনালেন, যা দেখালেন, অন্যদের কথা জানি না, আমি তো যিন্দগীভর মনে রাখবো!—এই দেখুন! আমি ফজুল বলে যাচ্ছি। আপনার শরীর কেমন আছে? অব্ ক্যায়সে হো আপ্?"

সম্রাট আকবর কথা বলে যাচ্ছিলেন, আর তানসেন কতকটা সস্মিত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে মসৃণ গাল ও রক্তিম ওষ্ঠাধর, দীর্ঘকুঞ্চিত কেশ, চোখে প্রাণের উত্তাপ, সাধারণ নাগরিকের মত বেশভূষা পরনে যুবক সম্রাটকে মুগ্ধ চোখে দেখছিলেন। হ্যাঁ, তার পাশে সম্রাট এখনও যুবক বইকি। অনেক বছর ধরে তো তিনি দেখে আসছেন অন্তরঙ্গভাবে। কোন খাদ নেই সম্রাটের অন্তরে। তাঁর বাহিরের কর্মচঞ্চলতার উত্তাপ, নতুন কিছুর জন্য অসীম কৌতূহলের উত্তাপের অন্তরালে আছে বিষাদ বহনের এক আশ্চর্য ক্ষমতা! তাই তাঁর সাধারণ নাগরিকের বেশে এখানে আসা এবং ব্যাকুল প্রশ্নে তানসেনের কুশল জিজ্ঞাসাও নির্ভেজাল, খাঁটি, একথা তানসেন ভালই জানেন। তিনি ক্ষীণ, আন্তরিকস্বরে বললেন, "অত উতলা হবেন না, জাঁহাপনা। আমি ভালই আছি, ম্যয় আচ্ছা হুঁউ।"

"কি বলছেন মিঞাজী! আমি উতলা হবো না! আপনি তো

শুধু অন্যসব গাইয়ে বাজিয়েদের মত নন্! আমি কারোকেই ছোট করছি না, বলছিও না। তবে আপনার পাশে তারা সব কাউয়া, ধার-কাউয়া-কাক-দাঁড়কাক কি মুর্গা, বাতাখের—হাঁস-মুর্গীর চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

তানসেন বাদশাহ্‌র কথা শুনে, চরম অসুস্থতার মধ্যেও বিস্মিত বোধ করলেন! এমন ভাষায় কথনও কথা বলেন না বাদশাহ্! আজ তিনি খুবই বিচলিত যে এটা বুঝতে অসুবিধা হ'লো না তানসেনের। সম্রাট আকবর তো কেবল হিন্দুস্তানের কঠোরপ্রাণ, নীরস, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসকই নন। এ সবের আড়ালে আছে আর একজন আকবর, যিনি সাধারণ মানুষের মতোই সরল, সহজ, আবেগে অধীর, ভালবাসায় অকৃত্রিম, যার কাছে বন্ধুত্বের দাবীর চেয়ে বড় দাবী আর কিছু নেই। জানেন তানসেন এসব। মনে মনে স্বীকার করেন যে বাঘেলারাজ রাজারাম তাঁর প্রথমজীবনের সেরা বন্ধু হ'লেও, বাদশাহ্ আকবরের কাছে এসে, তার বন্ধুত্ব অর্জন করে যে আনন্দের স্বাদ তিনি পেয়েছেন, তার কোনও তুলনা নেই। তাই চুপ করে রইলেন তানসেন। বাদশাহের আবেগ প্রকাশে বাধা দিতে চাইলেন না।

বাদশাহ্ কতকটা যেন আত্মমগ্ন হয়ে বলে যেতে লাগলেন: মিঞাজী! আপনি আমার জিগ্‌রী দোস্ত—বাদশাহ্ আকবরের সর্বোত্তম, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, দোস্ত। তানসেনজী! আপনাকে ছাড়া আকবরের জীবন তো শুখা, নীরস রেগিস্তান,-মরুভূমির মতো! মিঞা তানসেনই বাদশাহ্ আকবরের শান্তি আর আনন্দের একমাত্র ফোয়ারা,-উৎস, তানসেনের সঙ্গীতই আকবরের জীবনের সারতম রসায়ন, বেঁচে থাকার দাওয়াই, ওষুধ। এখন আকবরের কি হবে? কার কাছে গিয়ে সে বলবে—আমার অন্তরে বড় দুঃখ! একটা গীত শোনান্!' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। চুপ করে গেলেন বাদশা ্।

কতক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। দুজনে দুজনের হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে আছেন।—অবশেষে সম্রাট আকবরই কথা বললেন: "এবার কয়েকটা কাজের কথা বলে নিই। আমি বুঝতে পারছি। এই সময়

আপনার কাছে রসকষহীন রাজনীতির কথা বলতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু, আপনাকে শয্যাশায়ী রেখে আমাকে কিছু-দিনের জন্য অনুপস্থিত থাকতে হবে, এইটা আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছে! অথচ, উপায় নেই। একদিকে গুজরাট ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশেও বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েছি। আমাকে এখনই অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতেই হবে। অবশ্য কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। এবার এই অভিযানের মূল দায়িত্ব আমার কবি-বন্ধু আবুল ফজলের ওপর সঁপে দিয়েছি।"

তানসেন সম্রাটের কথা শুনে, বিশেষ করে আবুল ফজলকে সেনাপতিত্ব দেওয়ার কথা শুনে চমৎকৃত, বিস্মিত হলেন!—"আবুল ফজল? সেনাপতি? তাকে তো পণ্ডিত, সুরসিক লেখক বলেই জানি। তিনি তরোয়াল বাজীতেও এতো দক্ষ নাকি?"

"হ্যাঁ, আমার এই সুরসিক বন্ধুটি বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রচর্চাও ভাল মতোই করেছেন। এইবার তার হাতে নাতে পরীক্ষা হবে। আমার অবশ্যই ইচ্ছা ছিল না তাঁকে এই বিপদের মুখে পাঠাবার। কিন্তু তিনিই জেদ করলেন।"

তানসেনের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো। বুকের ওপর পাষানভার অনুভব করছিলেন। শরবৎ খাওয়ার পরে গলাটা একটু সাফ্ লাগছিল ঠিকই। কিন্তু কথা বলতে বেশ কষ্ট বোধ করছিলেন। তবুও সম্রাট আক-বরের উপস্থিতিকে তো উপেক্ষা করা যায় না। যদিও তাঁর আজ এই অবস্থার জন্য স্বয়ং সম্রাটই দায়ী। নইলে দীপক রাগে গান গাওয়া তো তিনি বন্ধই করে দিয়েছিলেন। কারণ পরিণতি তো তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু সম্রাট আকবরকে তা বোঝানো যায় নি। আশ্চর্য মানুষ এই তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহ আকবর! মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তানসেনের, একজন যুবক যিনি কেবল শারীরিক এবং হয়তো বা কিছুটা স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রয়োগে এতবড় সাম্রাজ্য রক্ষা করেছেন, বাড়িয়েও চলেছেন। রাজনীতি ও রণনীতির এই তুমুল হট্টগোলের মধ্যে থেকেও আপাত নিরক্ষর এই যুবকের অসীম জ্ঞানতৃষ্ণা, অজানাকে জানবার,

কেবল জানবার নয়, বোঝবার, হৃদয়-মন দিয়ে গ্রহণ করবার, আত্মস্থ করে নেবার এই আকুল আগ্রহ, বলতে দ্বিধা নেই, তানসেনকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলো! একগুঁয়েমী মনে হ'লেও বাদশাহ্‌র অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন নি। করতে পারেন নি। প্রথমে মনে হয়েছিলো যে বাদশাহ্ বুঝি ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল হ'য়ে গেছেন। কিন্তু বাদশাহ্‌র মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে থেমে গেছলেন! সে মুখে সরল কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না। একথা সত্য যে তিনি অন্যসব ঈর্ষাপরায়ন ওস্তাদদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'য়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রকৃত মনোভাব ও উদ্দেশ্য অবশ্যই তিনি বুঝতে পারেননি। পারলে আজ তিনি এখানে এসে এমন অসঙ্কোচে অনুশোচনা ব্যক্ত করতে পারতেন না। তিনি যে এসময় থাকতে পারছেন না, প্রিয় বন্ধু তানসেনের জীবনের এমন সঙ্কটময় মুহূর্তেই যে তাঁকে রাজকার্যে, অভিযানে যেতেই হচ্ছে, একথা বলে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতে পারতেন না!

একটা গভীর ক্লান্তির শ্বাস ফেললেন তানসেন! শরীরের ভেতর কেমন ঝির্‌ঝির্ একটা অনুভূতি! সব কেমন ঝিমিয়ে আসছে! ঘুম? না কি চিরপ্রশান্ত সেই মহানিদ্রা?—হঠাৎ সচেতন হলেন তিনি। বাদশাহ্ বসে আছেন। তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে আছেন বাদশাহ্ঃ "কি অত ভাবছেন, মিঁঞাজী? আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন, উঠতেই হবে। আমি গিয়ে দরবারের হেকিম প্রধানকে পাঠিয়ে দেবো। আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আবার গান শোনাবেন আমাকে। আপনি তো জানেন, আপনার গান শুনে আমি সুখে ঘুমিয়ে পড়ি। আপনারই ভৈরোঁ শুনে আমার ঘুম ভাঙ্গে! অভিযানের কটা দিন আমি তো আর সে সুখ পাবো না। এখন আপনার তন্দোরস্তিই (সুস্থতা) আমার খোদাতালার কাছে একান্ত কামনা! বুঝতে পারছি, আমার যিহল্লৎ, আমার হেমাক্কৎ—আমার অজ্ঞানতা, নির্বুদ্ধিতার সাজা আমাকে পেতেই হবে। আমার জন্যই আপনার আজ এই অবস্থা!" বলতে বলতে গলা ধরে এলো সম্রাটের। মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে কতকটা নিজের মনেই যেন আবার বলতে লাগলেন বাদশাহ্ঃ আকবরের আর

কোন্ ধন আছে তানসেন-ধন ছাড়া ?" দুচোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হলো সম্রাটের।

তানসেন খুবই বিচলিত বোধ করলেন। তাঁর দুর্বল শরীরও আবেগে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। বাদশাহের অন্তরের ব্যথা তিনি নিজেও অনুভব করতে পারলেন। তাই প্রসঙ্গ পালটে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ফজল মিঞাঁ কবে যাত্রা করছেন ? আপনি তাঁকে কোন দিকে পাঠাচ্ছেন ? বাংলা না গুজরাতে ?"

সম্রাটও নিজেকে সংযত করে নিলেন। তানসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু লজ্জিত হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, "ফজল মিঁঞাকে বাংলাতেই পাঠাবো মনস্থ করেছি। আসলে বাংলা আর বিহার দুটোই এখন আফগানদের হাতে। বাংলার তথ্‌তে (সিংহাসনে) দাউদ নামে এক ছোকরা বসেছে। তার বড়সড় এক সৈন্যদল আছে। ধনরত্নও আছে প্রচুর। তাইতে সে নিজেকে খুব হিম্মতওয়ালা ভেবে নিয়ে স্বয়ং সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এমন কি সীমান্তের একটা দুর্গও দখল করে নিয়েছে।"

"এতটা করতে সাহস পেলো দাউদ ? ওখানে আপনার কোন সেনাপতি নেই ?" ধীরস্বরে প্রশ্ন করলেন তানসেন।

"হ্যাঁ, মুনীম খাঁ আছে।" সম্রাট জবাব দিলেন, "কিন্তু তিনি খুবই বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। দাউদকে মুকাবলা করার মতো শক্তি তাঁর নেই। তবু তিনি পাটনাতে সৈন্য চালনা করে দুর্গ অবরোধ করেছেন। কিন্তু তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা আর তার নেই। সে জন্যেই সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি। আমাকেই যেতে বলেছেন।"

"কিন্তু গুজরাতেও বিদ্রোহ ঘটেছে বললেন না ?" তানসেন প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ।" সম্রাট বললেন, "আর সে জন্যেই আমি নিজে গুজরাতের দিকে যাচ্ছি। ফজল মিঁঞাকে পাঠাচ্ছি বাংলার দিকে। পরে জরুরত হ'লে আমিও যাব।" বলেই সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন, "থাক ! এখন এসব জঙ্গ্-লড়াইয়ের কথা থাক ! তকলিফ্ হচ্ছে আপনার। আপনি

আরাম করুন!" বলে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, "মেহের বেটি!"

"জী আব্বাজান!" মেহের সামনে এসে নতমুখে দাঁড়ালো।

"বেটি! তোমাকে বেশী কিছু বলার নেই। ইন্‌কি দেখ্‌ভাল্ করো মেরে লৌট্‌নে তক্‌,—আমি ফিরে এসে যেন সুস্থ দেখি! সরস্বতী বেটি কোথায়?"

সরস্বতী বাইরেই অপেক্ষা করছিল। ডাকশুনে এগিয়ে এলো।

সম্রাট আশ্বাসের স্বরে সরস্বতীর মাথায় হাত রেখে বললেন, "ডরো মাত্, বেটি! সব ঠিক হয়ে যাবে। খোদার দোয়া মাঙ্গো। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন! আমি এখন যাচ্ছি!"

সম্রাট চলে গেলেন।

তানসেনের চোখ দুটিও অসীম ক্লান্তিতে বুঁজে এলো।

এক অজ্ঞাত, সুপ্ত, মায়া-তন্দ্রার ঘোর নেমে এলো তাঁর চেতনার আকাশ ঘিরে…যেন বা বিস্মৃতির যবনিকা সরে গিয়ে সজীব স্মৃতির পথ উন্মোচিত হলো। কিন্তু, সেই পথ এখন গভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কাঁটা, ঝোপ-জঙ্গলে আকীর্ণ। তবু তাঁর সাধ হলো সেই পথে একবার ঘুরে আসতে।…তখনই কে যেন তাঁর হাত ধরে তুললো। সেই পথের মুখে এনে তাঁকে ছেড়ে দিল। আর সেই ক্ষণেই কুয়াশা ভেদ করে এক চিল্‌তে আলো এসে পড়লো সেই পথের উপর।…আশৈশবের চেনা নাম ধরে মধুর, স্নেহভরা ডাক বাতাস বাহিত হয়ে তাঁর কানে এসে বাজলো……

"তন্নু! আরে এ তন্নু! কাঁহা ছুপ্ গ্যয়া তু? কোথায় লুকোলি বাবা! আয়! দুধ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে! কোথায় গেলি! এ তন্নু বেটা!"

তখনই গোয়াল ঘরের দিক থেকে বাছুরের ডাক শোনা গেল। কেমন যেন ভয়ার্ত স্বর বাছুরটার! গিয়ে একটু দেখা দরকার। কিন্তু ছেলেটা এই ছিল। কোথায় যে গেলো! হাতে দুধের বাটি নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেল তন্নুর মা! ছেলেটা এত দুরন্ত! একটা মুহূর্তও স্থির হ'য়ে বসে না!

হঠাৎ বাঘের চাপা গর্জন শোনা গেল! পরক্ষণেই বাছুরটার ভয়ার্ত আর্তনাদ!

"হায় রাম! এ শের কাঁহাসে আ গয়া! বাঘ এলো কোথেকে?

জঙ্গল তো এখান থেকে অনেক দূর ?" কথাগুলো নিজের মনেই বলে তাড়াতাড়ি দুধের বাটিটা দাওয়ার খুঁটির পাশে নামিয়ে রাখলো তন্নুর মা। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা কাঠের ঠ্যাঙ্গা মতন দেখতে পেয়ে সেটাই হাতে তুলে নিয়ে সাবধানে গোয়াল ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়েছে তন্নুর মা আর ঘাঁউত্ শব্দ করে তার পিঠের ওপর পড়েই গলা বেড় দিয়ে ধরেছে—!

"উই-ম্মা!" চম্‌কে উঠলো তন্নুর মা। হাত থেকে ঠ্যাঙ্গাটা পড়ে গেল। আর তন্নু খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠলো মায়ের কাঁধে মুখ রেখে। হাসতে হাসতেই বলতে লাগল মজা করে,—"ডর্ গই, মা-নি ডর্ গই! মা ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়ে গেছে মা-নি!"

"আরে ছাড়্, ছাড়্! আমার গলায় লাগছে!" মা যত হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে, তন্নু তত জোরে অাঁকড়ে ধরে বলতে থাকে, "আগে বল, আমাকে দুটো প্যাঁড়া দেবে! তাহলে ছাড়ব।"

মা অমনি বলে ওঠে, "না। সকালে চারটে প্যাঁড়া খেয়েছিস্। এখন আর প্যাঁড়া পাবে না। দুধ খেয়ে নাও। এতক্ষণে বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"না, না, আমি দুধ খাব না। প্যাঁড়া দাও! প্যাঁড়া খাব। আমি প্যাঁড়া খাব!" বলতে বলতে মায়ের ঘাড়ে একহাত দিয়ে খাম্‌চি দিতে লাগল তন্নু!

"উঃ! অত জোরে খাম্‌চালে আমার লাগে না!—আচ্ছা, আচ্ছা,! দেবো প্যাঁড়া। আগে দুধটুকু খেয়ে নে।"

"না। আগে প্যাঁড়া দাও! আমি প্যাঁড়া দিয়ে দুধ খাব।" তন্নু কিছুতেই ছাড়বে না।

"আরে দুধের মধ্যে তো গুড় দিয়েছি। আবার প্যাঁড়া খেলে বেশী মিষ্টি হবে। বেশী মিষ্টি খেলে পেটের মধ্যে কিরা (কৃমি) হবে। আর পেটের মধ্যে কিরা হলে যা দর্দ (ব্যথা) হবে, তখন বুঝবে মজা!" মা ভয় দেখালো তন্নুকে।

ভয় পাবার ছেলেই নয় তন্নু। সে বললে, "কিরা হলে দাবাই (ওষুধ) খেয়ে নেবো। ব্যস্! সব কিরা মরে যাবে। দর্দও হবে না।"

ছেলের কথা শুনে মা এবার হেসে ফেলে।—"আচ্ছা, আচ্ছা, চল!

প্যাঁড়া দিয়েই দুধ খাবি। এবার নামতো ঘাড় থেকে। গলাটা ব্যথা হয়ে গেল।"

লাফ দিয়ে মায়ের পিঠ থেকে নেমে দু'হাত দিয়ে মাকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের দাওয়ার কাছে নিয়ে এল তন্নু! তারপর মায়ের চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে বলতে লাগল, প্যাঁড়া দাও, প্যাঁড়া দাও! তারপরে দুধ খাব!"

"আগে দুধ খেয়ে নে! তারপর প্যাঁড়া দিচ্ছি।" মা বলল।

"না। আগে প্যাড়া খাব; তারপর দুধ খাব! আগে প্যাঁড়া দাও! না হলে আবার আমি পালিয়ে যাব।" বলতে বলতেই দুম্‌দাম্ ঘুষি মারতে লাগল মায়ের পিঠে।

"উ-হু-হু! তোর সঙ্গে আর পারিনা বাপু! এবার তোর বাবা এলে তার সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দেবো!" বলতে বলতে তন্নুর মা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। শিকেয় ঝোলানো হাঁড়িটা নামিয়ে তার থেকে দুটো প্যাঁড়া তুলে নেয়।

ঠিক সেই সময় ভীষণ জোরে ঘর্‌ঘর্ ঘর্‌ঘর্ শব্দ শোনা যায় বাইরে। তন্নুর মা চম্‌কে ওঠে! একটা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে ওঠে! দুরন্ত ছেলেটা আবার কি বিপত্তি ঘটায় কে জানে!—"তন্নু! আরে এ তন্নু! কি করছিস্ তুই ওখানে?" বলতে বলতে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে আসে তন্নুর মা রান্না ঘর থেকে! যা ভেবেছে তাই। দস্যি ছেলেটা কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে জল তোলার জন্য দড়িতে বাঁধা বাঁটলোটা (বড় ঘটি) ছেড়ে দিচ্ছে কুয়োর মধ্যে, আর অর্‌ঘট্টটা বন্‌বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে দড়ির পাক ছাড়তে ছাড়তে ঘর্‌ঘর্ ঘর্‌ঘর্ শব্দ তুলছে। দাঁড়িয়েও আছে ছেলেটা এমন কিনারায় যে একটুখানি এদিক ওদিক হলেই একেবারে কুয়োর মধ্যে গিয়ে পড়বে! ছাঁৎ করে উঠল মায়ের বুকের ভেতরটা! এ ছেলেটাও কি শেষ পর্যন্ত···! কথাটা পুরোপুরি চিন্তায় আসার আগেই হাত-পা হিম হয়ে গেল! একটা ভীষণ কান্নার আঁধি গলার কাছে এসে তোলপাড় করতে লাগল। কোনও রকমে নিজেকে সংযত করে, বেশ রাগ দেখানো স্বরে ছেলেকে ডাকতে গেল।

কিন্তু তার বদলে কেমন একটা ভাঙ্গা আর্তস্বর বেরিয়ে এল গলা থেকে ঃ "তন্নু ! নেমে আয় ওখান থেকে, বাবা ! কূয়োর মধ্যে পড়ে যাবি শেষে !"

কি জানি কি ছিলো সেই গলার স্বরে, তন্নু ঘুরে একমুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়েই হাতের দড়িটা ছেড়ে দিয়ে শান্ত পায়ে নেমে এলো। গুটি গুটি পায়ে হেঁটে এসে মায়ের সামনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালো অপরাধীর মতো !

ছেলের নত মুখের দিকে তাকিয়ে বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল মায়ের। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ঝপ্ করে দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল তন্নুকে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মুখ। ছেলেটা যে কি সুন্দর দেখতে হ'য়েছে ! সারা বিহট গ্রামে এমন সুন্দর ছেলে, এমন রূপবান ছেলে আর একটাও নেই ! গর্বে মায়ের বুক ভরে ওঠে ! কিন্তু, পরক্ষনেই আবার নিজেকে শাসন করে, তিরস্কার করে। ছিঃ ! অত ঘমণ্ড্ (অহঙ্কার) ভাল নয়। দেবতার দয়ায়, সিদ্ধ ফকিরের আশীর্বাদে পাওয়া এই ছেলে ! আগের তিনটে সন্তানের একটাও তো জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হয়নি। গাঁয়ের বউ-ঝি-রা সবাই তো জানতো যে তার মৃতবৎসার দোষ আছে। তার যত সন্তানই হোক, কোনটাই বাঁচবে না। তবু এই দোষ কাটাতে যে যখন যা বলেছে, সবই করেছে সে। কত কবচ-তাবিজ-মাদুলি হাতে, কোমরে পরতে হ'য়েছে। তবু কিছু হয়নি। তখন রাগমাগ্ করে সব তাবিজ, কবচ, মাদুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মনের দুঃখে !

তারপর !....না, থাক। এখন ওসব কথা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই। ছেলেটাকে এখন ভুলিয়ে ভালিয়ে দুধটুকু খাইয়ে দিতে হবে। যা খেয়ালী দুরন্ত ছেলে ! গাঁয়ের সব বাড়ীই এই ছেলের দৌরাত্মে তটস্থ হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষতি কিছু করে না। বাড়ীর পুরুষেরা হয়তো ক্ষেতে টেতে কাজ করতে গেছে। বাড়ীর বউ রান্না ঘরে ব্যস্ত। সেই সময় চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকে ছাগলের ডাক ডাকতে লাগল। বউ ভাবলে বুঝি কার ছাগল বাগানে ঢুকে ফল ফুলের গাছ খেয়ে গেল।

সে তো হৈ হৈ করে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোথায় ছাগল! বাড়ীর ত্রি-সীমানাতেও ছাগল নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই রান্নাঘর থেকে ম্যাঁও ম্যাঁও বিড়ালের ডাক! হায়, হায়! দুধের পাত্রটা বুঝি ঢাকা দেওয়া হয়নি। খেয়েই গেল বুঝি দুধটা বিড়ালে! ছুটে রান্নাঘরে এসে দেখলে বিড়ালের চিহ্নও নেই। দুধের পাত্রটাতো ঢাকা দেওয়াই আছে!

তখনই—ডর্ গয়ি, মৌসি ডর গয়ি—ভয় পেয়েছে, মাসী, ভয় পেয়েছে বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে তন্নু দৌড়ে পালিয়ে যায়।

হেসে ফেলে মাসীও। দুষ্টু ছেলেটার জ্বালায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হলেও অসন্তুষ্ট কেউ হয় না। ছেলেটা এমন ফুলের মত যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মাসী তাই ডাক দেয়,—"ইধর আইয়ো তন্নু মিঠাই দুঙ্গি!" মিষ্টির লোভ দেখিয়েও তন্নুকে আর ফেরানো যায় না।

সেই সাত বছরের তন্নু এখন মায়ের কোলে উঠে চুপটি করে মায়ের আদর খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কচি আঙ্গুল দিয়ে মায়ের পিঠে আস্তে আস্তে চিম্‌টি কাটছে। যে কারণেই হোক, মা ভয় পেয়েছে, এটা তন্নু বুঝতে পেরেছিলো।

মা একেবারে ওকে কোলে নিয়েই দাওয়ায় এসে বসল। ঢাক্‌না খুলে দুধের বাটিটা উঠিয়ে ছেলের মুখের কাছে ধরলো। বেশ বাধ্য ছেলের মতো তন্নু একচুমুক, দু-চুমুক দুধ খেলো। তারপরই হাত বাড়িয়ে দিল,—প্যাঁড়া?

মা হাসতে গিয়েও সামলে নিয়ে নকল রাগের স্বরে বলল, "আগে সবটা দুধ খেয়ে নাও। তারপর প্যাঁড়া দেবো।"

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি কি বুঝলো তন্নু, চুপচাপ দুধ খেয়ে নিল। মা আঁচলের খুঁট দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিল। ছটফট করে মায়ের কোল ছেড়ে নেমে পড়লো তন্নু।—প্যাঁড়া দাও, জল্‌দি!"

তখনই বাইরে একদল ছেলে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই প্রায়

তন্নুর বয়সী বা কিছু ছোট বড়। দু-তিন জন চেঁচিয়ে ডাকলো,—"এই তন্নু! আয়! খেলবি না? আমরা মাঠে যাচ্ছি!"

ডাক শুনেই তন্নু আরও চঞ্চল হয়ে উঠলো, "কই প্যাঁড়া দাও!"

মা তেমনই কৃত্রিম গম্ভীর গলায় বলল, "প্যাঁড়া নাও! কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ঘরে চলে আসবে। দুদিন বাদেই পাঠশালা খুলবে। মনে আছে! লেখা পড়া না করে শুধু খেললেই হবে! লোকে বলবে কি দেখো, দেখো! পণ্ডিত মুকুন্দরাম পাঁড়ের ছেলে একটা যাহেল্-মুর্খ্-আন্‌পঢ়!,' ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখতে লাগল মা! হবে যে না সে তো জানাই। লেখাপড়ায় একদম মন নেই ছেলেটার!

তন্নু মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে মায়ের কথাগুলো শুনছিলো না পালাবার তাল খুঁজছিলো। অবসর বুঝেই একছুট দিল। ছুটতে ছুটতেই বলতে লাগল: "আমি যাব না, পাঠশালায় যাব না, কিছুতেই যাব না-আ-আ....!....

এক লাফে মেহেদীর বেড়া পার হয়ে ছেলেদের দঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লো তন্নু। হৈ হৈ করে ছুট দিল ছেলের দল একদিকে। দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে মায়ের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল! ছেলেটার সবই একরকম ভাল। কিন্তু লেখাপড়ার কথা হলেই আর ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ নিয়মমত পাঁচ বছর বয়সেই হাতে-খড়ি হয়েছে। কিন্তু গত দু'বছরের মধ্যে ছেলের অক্ষর পরিচয়টাই ভাল করে হয়নি। আচার্য্য মশাই একেকদিন আসেন আর আক্ষেপ প্রকাশ করেন, সাত ব্যাখ্যান করে ছেলের দুষ্টুমীর কথা বলেন, পড়ায়—অমনোযোগের কথা বলেন; এবং ঠারে ঠোরে ছেলের মায়ের বিরুদ্ধেও কিছুটা অভিযোগ করে যান:

"ম্যয় মান্‌তা হুঁউ—আমি স্বীকার করছি, যদি বিদ্যার্থীর নিজেরই অন্তত: কিছুটা আগ্রহও না থাকে, তাহলে বিদ্যা গুলে তাকে খাইয়ে দেওয়া যায় না। সব ছেলেমেয়েই এইরকম বয়সে একটু-আধটু দুরন্ত-

পনা করে। তন্নু্বাবা তাদের চেয়ে একটু বেশী দুরন্ত। কিন্তু আমি তো আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করি।"

"চেষ্টা তো আমিও করি, আচার্য্য-জী!" কপাটের আড়ালে দাঁড়ানো তন্নর্ মা বলে, "ধরে বেঁধে এনে তো বসালাম। তো পত্রী-কিতাব সব একধারে সরিয়ে বলে কি—মা-নি! গল্প বল! কিস্‌সা ব'লো! যত বলি কি আগে পড়া কর, লেখা শেষ কর, তারপর গল্প-কিস্‌সা বলব'! তা কিছুতেই শোনে না, মানে না।" আরও যা যা করে—মাথার চুল ধরে টানাটানি, আঁচড়ানো, খাম্‌চানো, কামড়ানো, পিঠের ওপর বসে দুমাদুম্ ঘুষিমারা—এসব কথা আর আচার্য্য-জীকে বলল না তন্নুর মা। এইসব বললে বৃদ্ধ লোকটা আবার কি বলে বসবে কে জানে! হয়তো বলবে—ঐ তো, ঐ-আদর দিয়ে দিয়েই তো ছেলের আখেরটা খাচ্ছো। এখন থেকে কড়া শাসন না করলে ওই ছেলে আর কোনদিন মানুষ হ'বে! উচ্ছন্নে যাবে। তখন তোমাদেরই বসে বসে কাঁদতে হবে।—তা কি আর হবে! কান্নাই যদি কপালে লেখা থাকে তো কাঁদতে হবে ছেলের অমঙ্গলের কথা ভেবে! কিন্তু ছেলে নেই—একেকবার পেটে আসছে আর মড়ামুখ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে—হা ঈশ্বর! তেমন কান্না যেন—পৃথিবীর কোন মেয়েকে কোনদিন কাঁদতে না হয়!

"ওই-ওই-ওই, ওই যা বললে বহূরাণী, গল্প শুনতে ওর কোনও ক্লান্তি নেই। তখন ও ভাল ছেলের মত চুপ করে বসে থাকে। খুব মন দিয়ে শোনে। মাঝে মধ্যে এটা সেটা প্রশ্নও করে। বলে কি—গুরুজী এটা কেন হলো, তো ওটা কেন গেলো; পাজী দৈত্যটা রাজ-কুমারীকে বন্দী করবার আগেই সেই রাজকুমার গিয়ে উদ্ধার করল' না কেন?" তা আমি বলি—কি করে উদ্ধার করবে? রাজকুমার তো জানতেও পারেনি বুঝতেও পারেনি।—তো তন্নু্ প্রশ্ন করল, "রাজ-কুমার কেন জানতেও পারলো না বুঝতেও পারলো না?"—তা আমি বলি—'কি করে পারবে? রাজকুমারী তো আগেই একটা খত্ (চিঠি) লিখে, পোষা পায়রার পায়ে বেঁধে রাজকুমারের কাছে পাঠিয়ে

দিয়েছিলো। তাতে লিখেছিলো কি এক দৈত্য আমাদের রাজ্যে এসে খুব অত্যাচার করছে, সবাইকে মেরে ফেলছে, খেয়ে ফেলছে, তাকে কেউ জব্দ করতে পারছে না ; আমার মা-বাবা, মানে রাজা-রাণীকেও মেরে ফেলেছে, এক্ষুনি আমাকে বন্দী করতে আসছে। রাজকুমার! তুমি শিগ্‌গীর এসে আমাকে উদ্ধার কর!'—তো রাজকুমার চিঠিটা পেয়ে ভাবলো কে না কে পাঠিয়েছে। এখন থাক। উজিরের ছেলে তার খুব বন্ধু। তা সে গেছে তার মামা-বাড়ীতে। সে ফিরে আসুক। তখন তাকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নেবে।"

"কেন?" তন্নু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, "রাজকুমার নিজেই তো তক্ষুনি চিঠিটা পড়ে, সোজা গিয়ে দৈত্যটাকে মেরে ফেলে দিয়ে রাজ-কুমারীকে উদ্ধার করতে পারতো?"

তো আমি বললাম, "কি করে উদ্ধার করবে? সে তো লিখতেও জানে না পড়তেও জানে না। সে একটা যাহেল,—মুর্খ রাজকুমার। তাই তো সে কিছু জানতেও পারলো না, বুঝতেও পারলো না। রাজ-কুমারী দৈত্যের হাতে বন্দী হ'য়ে গেল!"

"তখন কি বললে তন্নু?" সাগ্রহে জানতে চাইল তন্নুর মা।

আচার্য্যমশাই হেসে ফেললেন।—'বহুরাণী, তোমার ছেলের কি অতশত বোধ হয়েছে যে বুঝে-সুঝে জবাব দেবে? কত বয়স হ'লো এখন তন্নুবাবার?"

"এই আঘানে (অঘ্রান মাসে) সাতে পড়েছে।" তন্নুর মা জবাব দিল।

"তবে? পুরো সাতও হয়নি। তবে হ্যাঁ। অক্ষর লিখতে শিখে যাওয়া উচিত এই বয়সে।" আচার্য্যমশাই বলতে থাকেন, "আমি ঐ গল্প বলা শেষ করে তখন বললাম—সব ছাত্রকে লক্ষ্য করেই বললাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল তন্নুবাবার মুখের দিকে,—তোমরা সব বুঝতে পারলে তো? যদি রাজকুমার লিখতে পড়তে জান্‌তো তো—সে তখনই চিঠিটা পড়ে সব বুঝে ফেলতো, জেনে যেতো? তাহলে বেচারী

রাজকুমারী দৈত্যের হাতে বন্দী হ'তো না।—ছেলেরা সকলে বুঝেছো? তন্নুবাবা বুঝেছো?"

তো তন্নুবাবা তখন খুব বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নেড়ে বলে—হ্যাঁ! আমি বলি, "তাহলে মন দিয়ে লিখবে পড়বে তো? বেশ। তাহলে এখন লেখো, সকলেই লেখো! আমি বলছি। তো আমি অনেকখানি লেখালাম, পড়ালাম। সকলেই পারলো, তন্নুবাবাও পারলো; একটু বেশী ভুল করলো—অন্য ছাত্রদের তুলনায়। কিন্তু পারলো তো কিছুটা!" আচার্য্যমশাই একটু থামলেন। বোধ হয়, একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে থ'মকে গেছেন কিংবা একটু নেশার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাই। ট্যাঁক থেকে শামুক-খোলের নস্যদানি বার করে বেশ বড়সড় দু'টিপ নস্য দুই নাকের গর্তে গুঁজে দিয়ে কাঁধের উত্তরীয়র খুঁটে নাক মুছে নিলেন ভাল করে।

তন্নুর মা কপাটের আড়াল থেকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো আচার্য-মশাইকে। বেশ বুঝতে পারছিলো যে এবার তাকেই কিছু উপদেশ শুনতে হবে। মনে মনেই হাসলো সে। এর আগেও যতবার এসেছেন, ততবারই বলেছেন যে ছেলেপুলেদের একটু-আধটু মারধোর না করলে ওরা লেখাপড়া করতে চায় না!

শুনে ভেতরে ভেতরেই আঁৎকে উঠেছিল তন্নুর মা! তন্নুকে মারধোর? কক্ষনো না! কত দেবতার কাছে মানত করে, সাধু-সন্তদের দেওয়া কবচ-তাবিজ ধারণ করে, শেষে ফকিরের দোয়ায় আমি তন্নুকে আমার কোলে পেয়েছি।—আমার সেই বুকের ধনকে আমি মারধোর করে লেখাপড়া শেখাবো? থাক। অমন লেখাপড়ায় আমার দরকার নেই। তন্নুর বাবা এবার আসুক। ওঁকে বলে আবার ফকির-বাবার কাছে নিয়ে যাবো একবার। তাঁকে গিয়ে সব কথা বলবো। তাঁর দোয়ায় তন্নুকে পেয়েছি। তিনি যা বলবেন—তাই হবে।

এতসব মনের কথা অবশ্য আচার্য্য-জীকে বলবার দরকার নেই, এবং বলেওনি তন্নুর মা। বরং মৃদু প্রতিবাদের স্বরে আচার্য্য-জীকে

বলেছিলো ঃ "ওকে কিন্তু মারধোর করবেন না, আচার্য্য-জী!"

আচার্য্য-জীও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে শিখাগুচ্ছ দোলাতে দোলাতে বলেছিলেন,—'আরে না, না! তাই কখনো মারি! মুকুন্দরাম আমাকে অত করে বারণ করে গেছে। তা ছাড়া, বহুরাণী, আমি তো জানি, কত সাধু-ফকির করে তবে তন্নুকে পেয়েছো! তবে একথাটাও বলি, বহুরাণী, মা যদি ছেলেকে দু'চার ঘা মারে, তাতে কোনও দোষ হয় না; বরং তাতে আখেরে ছেলের মঙ্গলই হয়! নইলে দুষ্টুমী এমন বাড়বে যে সামাল দিতে পারবে না শেষে!'

আজও হয়তো সেই মারধোরের কথাই বলবেন আচার্য্যমশাই। তন্নুর মা মনে মনে প্রস্তুত হ'য়ে রইল কি উত্তর দেবে আচার্য্য-জীকে!

কিন্তু আচার্য্য-জী মারধোরের প্রসঙ্গে গেলেন না। খানিক ইতস্ততঃ করে শেষে বললেন, "বহুরাণী! তুমি তো পাঠশালায় পড়েছো বিবাহের আগে? কতমাস পড়েছো?"

তন্নুর মা লজ্জিতস্বরে জবাব দিল, "পাঁচ থেকে আঠ, এই তিন বছর পড়েছি, আচার্য্য-জী। তারপর তো—'

"তারপর বিবাহ হয়! সে তো বুঝেছি।" চোপায়া থেকে উঠে দাওয়ার ধারে এসে ফোঁৎ ফোঁৎ করে দুবার নাক ঝাড়লেন আচার্য্য-জী। তারপর উত্তরীয়র খুঁট দিয়ে নাক মুছতে মুছতে এসে আবার চোপায়াতে বসে বলতে লাগলেন, "তা তুমি তো বহুরাণী, বেশ কিছুটা লিখাই-পড়াই করেছো। তুমি তো নিজেই তন্নুবাবাকে পড়াতে পারো? পাঠশালাতে যা পড়াই-লিখাই হয়, তা তো হয়। কিন্তু ঘরে মা-য়ের কাছে যে শিক্ষা হয়, সেটাই হলো আসল শিক্ষা। আমাদের শাস্ত্রে একথা বলেছে। আমাদের শাস্ত্রে আরও বলেছেঃ

„অজাতমৃতমুর্খানাম্ বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।
সকৃদ্দুঃখকরাবাদ্যাবন্তিমস্তু পদে পদে॥"

"—অর্থ্যাৎ কিনা, পুত্র না জন্মান, জন্মে মরে যাওয়া এবং মূর্খ পুত্র—এই তিনের মধ্যে, পুত্র না জন্মান অথবা জন্মে মরে যাওয়া বরং ভাল; কিন্তু মূর্খ পুত্র আদৌ ভাল নয়; সন্তান না হলে বা জন্মে মরে গেলে

একবার—মাত্র একবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়; কিন্তু পুত্র যদি মূর্খ হয়, তাহলে চিরকাল, পদে পদে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়!"

"তো বুঝেছো, বহুরাণী? তোমাকে এত' কথা বলতে হ'তো না, যদি মুকুন্দরাম এখানে থাকতো! তা সে তো কাশী গিয়ে বসে আছে। বছরে এক দু'বার আসে—"

"কিন্তু আচার্য্য-জী!" তন্নুর মা বাধা দিয়ে বলতে যায়!

"হাঁ-হাঁ, জানি-জানি, বহুরাণী", আচার্য্য-জীও তন্নুর মায়ের কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠে, "আমি কি এত বড় আন্‌পঢ় কি এই সাধারণ কথাটা বুঝি না! সে কত বড় পণ্ডিত! তার কি এই ছোট গাঁয়ে বসে বসে খেতে ভাল লাগে! কাশী হলো বড় বড় সব পণ্ডিতের জায়গা! দুনিয়ার সবচেয়ে মানি-জানি-পরিচিত্ বিদ্যাস্থান। সেখানে কত বিশ্ব-বিশ্রুত বিদ্বান ও গুণীজনের সঙ্গে নিত্য বিদ্যালাপ হয়! তারপর কথকতা তো তাঁকে করতেই হয়! তাতে উপার্জনও তো তাঁর ভালই। নাহলে, যখন আসে তখন সবার জন্যে কত রকম জিনিষ পত্র নিয়ে আসে। আমার জন্যে তো এক এক জোড়া ধুতি-গামছা আনেই। তাঁর মত লোক আমাদের গাঁয়ে আর কে আছে! আরে বহুরাণী! সে জন্যেই তোমাকে বলি আর আমিও চিন্তা করি যে মুকুন্দরামের কত বড় বংশ! আর সেই বংশের লহু (রক্ত) তো তন্নুবাবার শরীরেও বহে যাচ্ছে? তো সেই বংশের ছেলে যদি একটা যাহেল্, মূর্খ হ'য়ে থাকে তবে তার চেয়ে দুঃখজনক, বেদনাজনক আর কি হ'তে পারে: "স জাতো যেন জাতেন বংশ সমুন্নতিম। পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে॥"—ইস্ পরিবর্তী দুনিয়ামে—এই পরিবর্তনশীল জগতে—কে না জন্মাচ্ছে কে না মরছে? বলো বহুরাণী? আমাদের এই অনিত্য সংসারে কত মানুষ জন্মায় আবার কত মানুষ মরে যায়! তো আমরা সার্থকজন্মা পুরুষ কাকে বলি? যিনি জন্ম-গ্রহণ করে নিজের বংশের উন্নতি সাধন করেন, গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাঁর জন্মই সার্থক যিনি জন্মালে বংশের সুনাম বৃদ্ধি পায়, বংশের গরিমা ফুলের গন্ধের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে!"

তন্নুর মা প্রমাদ গন্‌লো! বিহট গ্রামের একমাত্র পাঠশালার আচার্য্য এই পণ্ডিত প্রভঞ্জন চতুর্বেদী সম্পর্কে অনেক কথাই সে শুনেছে। একটু লোভী, পেটুক। তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একটু খেতে-টেতে ভালবাসে, সেটা এমন কিছু দোষের নয়। কথা একটু বেশী বলেন, তাও শুনেছে সে। কিন্তু, এ যে একেবারে কথার প্রভঞ্জন,—ঝড় বইয়ে দিয়েছেন! সার্থকনামা পুরুষ! থামতে চাইছেন না! রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। এখন কি এতশত শাস্ত্রবাক্য শোনার সময় আছে। তন্নুর মা বেশ বুঝতে পারলো যে একেবারে খালিমুখে পণ্ডিতমশাইটিকে বিদায় করা যাবে না। প্যাঁড়া, লাড্ডু তো তৈরী করাই আছে। তন্নুর জন্যে তৈরী করে রাখতেই হয়। তার থেকে কিছু দিয়ে এঁকে এখন বিদায় করাই দরকার। নইলে সব কাজ পণ্ড হবে। তাই আচার্য্য-জীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তন্নুর মা বলে উঠলো,—"আচার্য্য-জী! আপনি যেমন বললেন, আমি তন্নুকে বাড়ীতে পড়াবো। আমি যতদূর পারি। আপনিও একটু খেয়াল করবেন। আর দীপাবলী তো এসেই গেছে। তন্নুর বাবা সন্দেশ (সংবাদ) পাঠিয়েছেন কি উনি দীপাবলীতে আসছেন। তখন ওঁকেও আপনি বলবেন। তবে আমার একটা অনুরোধ। তন্নুকে যেন বেশী পেটাপিটি করবেন না!"

একেবারে একহাত জিভ কেটে, লম্বা শিখাটি দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা নেড়ে আচার্য্য বলে উঠলেন: "আরে ছিঃ, ছিঃ! আমি হাতে বেত নিয়ে ছেলেদের ভয় দেখাই। কাউকেই মারিপিটি না। তা ছাড়া তন্নুবাবা তোমার একলৌতা বেটা—একমাত্র সন্তান, তা কি আমি জানি না! তুমি কিছু চিন্তা করো না! তা মুকুন্দরাম তাহলে দীপা-বলীতে আসছে?"—আসন্ন প্রাপ্তি-যোগের কথা ভেবে আচার্য্য প্রভঞ্জন চতুর্বেদী খুশী হয়ে উঠলেন! একজোড়া ধুতি, একজোড়া গামছা, আর অন্ততঃ দুদিন পেটপুরে নানা সুখাদ্য খাওয়া! ভাবতেই তার জিভে জল এসে গেল। মুকুন্দরাম পাঁড়ে সেদিক থেকে খুবই প্রাণ-খোলা মানুষ! নিজেও খায়, অন্যকে খাওয়াতেও ভালবাসে। সে গ্রামে এলে রীতিমত উৎসব লেগে যায়। কারণ, গ্রামের সকলের জন্যই সে

কিছু না কিছু নিয়েই আসে। তারপর সমস্ত গ্রামের লোককে, ছেলে-বুড়ো সমেত, একদিন ভোজ খাওয়ায়। তারপর একদিন গান-বাজনার আসর বসায়, সঙ্গে ভোজ তো থাকেই। তবে সেদিন ছেলেপুলেরা বড় একটা থাকে না। গ্রামের মাতব্বর, সমঝদার বড়রাই প্রধানতঃ থাকে। সেদিন চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরের শহর গোয়ালিয়ার থেকে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ, বাজনদার জ্ঞানী-গুণীও আসেন। তা ছাড়া, মুকুন্দ্রাম পাঁড়ে নিজেও কেবল পণ্ডিত তো নয়, সুগায়কও। সেও সেদিন গান শুনিয়ে এই ছোট্ট বিহট গ্রামের অধিবাসীদের সম্মান বাড়িয়ে দেয়। কেননা, শহরের গায়ক-বাজনদার গুণীরাও মুকুন্দরামের গানের খুব প্রশংসা করে। সৎমানুষ মুকুন্দ্রামকে সকলেই তাই ভালবাসে। গ্রামের সে গর্ব। একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ অবশ্য আচার্য্য-জীর নিজেরও আছে। কেননা, গ্রামের একমাত্র ধনী, মানী, গুণী স্বয়ং মুকুন্দরাম তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ; তার পায়ে ধরে প্রণাম করে। যখনই কাশী থেকে গ্রামে আসে, অন্যান্যদের যা দেয় তাতো দেয়ই, তার জন্যে আরো বেশী কিছু নিয়ে আসে। মুকুন্দরামের কল্যাণে আচার্য্য প্রভঞ্জন চতুর্বেদীর কোনও অভাব নেই ; অর্থাৎ, খাওয়া-পরার উপকরণের কোন অভাব নেই। তবে, ইদানীং একটা অভাববোধ তাকে মাঝে মাঝে একটু পীড়া দেয়। মনে হয়, জীবনটা তো প্রায় কেটেই গেল। অথচ, এই এত বড় পৃথিবীটার কিছুই দেখা হলো না! সেই কবে, আদ্যিকালে এই ক্ষুদ্র বিহট নামে গ্রামের মাটিতে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল! তারপর এই সুদীর্ঘ কাল কোথা দিয়ে বহে গেল! এখন শরীরের বল কমে গেছে, দাঁত সব পড়ে গেছে, দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন তাই মনের মধ্যে বড় আকুলতা, বড় আকাঙ্ক্ষা। যতদিন যাচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়ছে।

মনে মনে তাই স্থির করেছেন আচার্য্য প্রভঞ্জন চতুর্বেদী, এবার মুকুন্দরাম এলে তাঁর হাতদুটি ধরে বলবেন : মুকুন্দবাবা! কবে যে ওপারের ডাক আসবে, তা তো জানি না ; আমার জীবনের এই শেষ আকাঙ্ক্ষাটা তুমি পূরণ করে দাও বাবা! আমাকে একবার বাবা

বিশ্বনাথ—কাশী-বিশ্বনাথের দর্শন করিয়ে দাও বাবা! আমার তো সাতকুলে কেউ নেই; অর্থ-সামর্থ্যও নেই। সারা জীবন তোমাদের দয়াতেই খেয়ে-প'রে সুখে কেটে গেল। এখন চিরতরে দিন ফুরাবার আগে এই শান্তিটুকু নিয়ে যাই।—

—"আচার্য্য-জী!" তন্নুর মায়ের ডাক শুনে চম্‌কে ওঠেন আচার্য্য প্রভঞ্জন! এতক্ষণ নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন।—"এই নিন, আচার্য্য-জী! কিছু প্যাঁড়া-লাড্ডু তৈরী করেছিলাম। আপনি কিছু নিয়ে যান। খাবেন।" বলে তন্নুর মা পাতায় মোড়া একটা পুঁটলী তার হাতে দিল।

দুহাত পেতে নিলেন আচার্য্য-জী, পুঁটলীটা। একবার ভাবলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা বহুরাণীকে বলবেন কিনা। শেষে ভাবলেন—থাক্। একেবারে মুকুন্দ্‌রামের কাছেই প্রস্তাবটা তোলা ভাল। নচেৎ কার্য্যসিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হ'তে পারে!

তিনি চোপায়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।—"আমি তাহলে আজ আসি, বহুরাণী! দুদিন পরেই তো পাঠশালা আরম্ভ করবো। তন্নু-বাবাকে সময়মত নিয়ে এসো! কোন চিন্তা করো না। তন্নুবাবাকে আমি ঠিক তৈয়ারী করে নেবো। শুভমস্তু!"

আচার্য্য প্রভঞ্জন বিদায় নিলেন।

তন্নুর মা চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত দাওয়াতেই দাঁড়িয়ে রইল'। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বেলা পড়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। অথচ কত কাজ বাকী।

কিন্তু কাজে কেন যেন মন বসাতে পারলো না তন্নুর মা। বারে বারেই সেইসব দিনগুলোর—সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কি দুঃস্বপ্নের বোঝা বয়ে দিনগুলো রাতগুলোকে যেন দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিতে হয়েছে!—

সাত বছরের গৌরী-কন্যা বধূ হ'য়ে এসেছিল পাণ্ডেদের পরিবারে। স্বামী মুকুন্দরাম তখনও ছাত্র। কাশী বিদ্যাপীঠে থেকে পড়ে। ভাল করে

চেনা-পরিচয়ের বয়স তখন দুজনের কারোই হয়নি। বিয়ের পরই মুকুন্দরাম যখন আবার ফিরে গেল কাশীতে পাঠ সমাপ্ত করতে, তখন সাত বছরের নববধূ-কন্যাও ফিরে এলো পিত্রালয়ে। তারপর ক'টা বছর তো সেখানেই হেসে খেলে কেটে গেল। বিয়ের কথা, স্বামীর কথা তেমন করে মনেও পড়েনি। পড়বার কথাও নয়। বিয়ে বস্তুটা কি, সাত বছরের কন্যার তো তা বোঝার কথা নয়। তন্নুর মা-ও বোঝেনি। বরং ধূনোর ধোঁয়া, শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, তার মধ্যে কার যেন কোলে চড়ে শেষে পিঁড়ীতে বসানো, পুরুত ঠাকুরের গমগমে গলার মন্ত্রপাঠ—এইসব মিলিয়ে একটা ঝাপ্‌সা ছবি যেন কোন্ সুদূরের গর্ভ থেকে উঠে আসে! এক রূপবান কিশোরের অস্পষ্ট মুখ ভেসে ওঠে, কারা যেন বলছিল—তাকাও, তাকিয়ে দেখ! তো সে ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখেছিল। কে যেন একটা গজ্‌রা (ফুলমালা) তার দুহাতে দিয়ে কনুইয়ের কাছে ধরে বলেছিল,—'পহ্‌নায় দো, বিটিয়া—পরিয়ে দাও, বেটি! তো সে সেই রূপবান কিশোরের গলায় সেই ঘুম ঘুম চোখেই কোনমতে মালাটি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর তার বিশেষ কিছু মনে নেই। বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল একেবারে পরদিন ভোরে।

সেই ভোরের কথা মনে পড়লে, আজ, এখনও, নিজে নিজেই লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে তন্নুর মা! বিরাট পালঙ্কের চারধার ঘিরে বৃষ্টি-ধারার মতো ফুলের ঝালর ভোরের হাওয়ায় মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে; আর সেই ফুলের মশারির মধ্যে সে আর সেই রূপবান কিশোর! কোথায় গেছে তাকিয়া, (বালিশ) তার মাথা সেই কিশোরের বাম হাতের ওপর, ডান পাও ওরই কোমরের ওপর! কি এক অজ্ঞাত লজ্জায় সাত বছরের গৌরীমেয়েও রাঙা হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি বুঝে নিতে কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল মাত্র। পরক্ষণেই নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে নেমে দরজা খুলে একেবারে ভেতর বাড়ীতে মায়ের কোলে। ভাগ্যিস্ ঘুম ভাঙেনি তখন সেই কিশোরের! সাত বছরের গৌরী-মেয়ের শরীরেও তখন কি এক অজানা সুখের মৃদু মৃদু কম্পন! — তারপর একসময় সেই মৃদু

মৃদু কম্পনই সম্ সনন্ন্ আঁধি হয়ে উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গৌরী-মেয়ের দেহতটে !......

এক শুক্ল-পঞ্চমীর উজ্জ্বল বৈকালে বেণী বেঁধে দিতে দিতে মা বলেছিল, "গৌরী-বেটি ! অব্ তুঝে সসুরাল যানা হ্যায়,—এবার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে তোকে ! সেখান থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে। মুকুন্দরাম কাশী থেকে গাঁয়ে ফিরেছে। আমিও সংবাদ পাঠিয়েছি। মুকুন্দরামকে আসতে বলেছি। সে এসে এখানে কদিন থেকে, তারপর তোকে নিয়ে যাবে ওদের গাঁয়ের বাড়ীতে। তারপর হয়তো তোকে কাশীতেই নিয়ে যাবে মুকুন্দরাম। জানিনা !" বলতে বলতে আনন্দের স্বরেও যেন একটু বিষন্নতা মিশে যায় মায়ের কথাগুলোতে !

মায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোরবেলাকার কথা মনে পড়ে-যায় গৌরীর ! মনে হয় যেন, এই তো সেদিন। ঘুমন্ত সেই নবীন কিশোরের সান্নিধ্য থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে একেবারে মায়ের কোলে গিয়ে লুকিয়েছিল ! মা কিছু বলেনি। কিন্তু ভাবীজী কি দুষ্টু ! বলেছিল,—"কিরে মেয়ে ! বরকে ফেলে পালিয়ে এলি যে ? আচ্ছা দেখবো ! আর একটু বড় হ ! তখন তো আর বরকে ছেড়ে মায়ের কাছেও আসতে চাইবি না !" বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল ভাবীজী। আর সে জিভ বার করে, অনুনাসিক শব্দ করে করে ভেঙ্গিয়ে দিয়েছিল ভাবীজীকে। ভাবীজী তবুও হাসতে হাসতে বলেছিল, "আচ্ছা, আচ্ছা ! আর কয়েকটা তো বছর। তখন দেখবো কত জিভ ভেঙ্গাতে পারিস্ !"

"কয়েকটা তো বছর !" ভাবীজীর কথাটা এখনও মনে আছে তার। সত্যিই তাহলে সেই কয়েকটা বছর চলে গেছে ! ইদানীং অবশ্য গৌরী নিজেও ভাবে, সেই আগের মত আর যেন নেই সে ! নিজের গলার স্বরটাই কেমন যেন অন্যরকম লাগে ! সে যেন অনেকটা লম্বাও হয়ে গেছে। আগে রসুইঘরে ঝোলানো শিকায় রাখা হাঁড়ি থেকে মিষ্টি চুরি করে খেতে হলে চোপায়াটার ওপর দাঁড়িয়ে তবে নাগাল পেতো। এখন সহজেই, মাটিতে দাঁড়িয়েই নাগাল পেয়ে যায়।

কারণে অকারণে মনের ভেতরটা আজকাল কেমন ফাঁকা-ফাঁকা শূন্য হয়ে যায়। ছোট ছেয়েমেয়েদের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে খেলতে আর ইচ্ছে করে না। নির্দিষ্ট ভাবনা নেই। কিন্তু একলাটি চুপ করে এক জায়গায় বসে আবোল-তাবোল চিন্তা করতে বেশ লাগে। রাত্রে একেকদিন ঘুম আসে না। শরীরটা কেমন অস্থির করে। মনে হয় যেন ভীষণ বুখার,—জ্বর এসেছে! বুক, তলপেট যেন পাকা ফোড়ার মত তাড়সে টন্ টন্ করতে থাকে। আঁকুপাকু হয়ে কি যেন, কাকে যেন আঁকড়ে ধরতে যায়! তখনই কান্না পেয়ে যায়! নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে একসময় বালিশটা আঁকড়ে ধরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর কিশোরী গৌরীর মনের আকাশে একই সঙ্গে যেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে; মনটা বিষাদের মেঘে ভার হয়ে থাকে। কারণ, স্বপনে যে নওল-কিশোর আসে, খেলা করে তার সঙ্গে, কত খুনসুটি, আদর; দিনের আলোতে আর যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না! আবার রাতের অপেক্ষায় সান্ত্বনা দিতে হয় মনকে।

এখন মায়ের কথা শুনে একটা অজানা আনন্দের হিল্লোল গৌরীর শরীরের সুদূর কোন্ থেকে অচেনা ফুলের চেতনা আচ্ছন্নকরা মধুর সুবাসের মত বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিল! একটা আচমকা শরমের উচ্ছ্বাস রক্ত-রঙীন হ'য়ে শরীরকে রাঙিয়ে দিয়ে গেল যেন! খুব ইচ্ছে করলো একলাটি বাগানের সেই নাগকেশর গাছের নীচে গিয়ে বসে থাকে। ভেতরের আনন্দের স্রোতটাকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না গৌরী!

"এত ছটফট্ করছিস্ কেন?" মা আদরের ধমক দেয় মেয়েকে, "এদিকে ফিরে বস্! কাজলটা পরিয়ে দিই!"

চঞ্চল গৌরী উঠে পড়ে।—'এখন থাক, মা! আমি নিজে পরে নেবো।' বলেই দৌড়ে বাগানের দিকে চলে যায়।

মায়ের মুখে হাসি ফোটে; কিন্তু সেই সঙ্গে একটা চাপা দীর্ঘ-

শ্বাসকেও চাপা দিতে পারে না। অপসৃয়মান কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকে মা।

গৌরী একছুটে বাগানে এসে হাঁফাতে থাকে। একবার টগর ফুলের গায়ে আদরের হাত বুলায় তো আবার দোপাটি ফুলের গায়ে। তারপর নাগকেশর গাছের নীচে গিয়ে ঘাস-মাটিতেই শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়েই বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠা আনন্দের স্ফীত উল্লাস যেন সেই নওল-কিশোরের সঙ্গেই ভাগাভাগি করে উপভোগ করতে থাকে। এবার সত্যি সত্যিই সে আসছে!......

...হঠাৎ শঙ্খধ্বনি কানে যেতেই স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এল তন্নুর মা।—'আরে! তন্নু অভিতক্ লৌটা নেহী—এখনও ফিরে এল না তন্নু! প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। গাঁয়ের একমাত্র মন্দিরে সন্ধ্যে-আরতির ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছে! অন্নুবেটী তো সাধারণতঃ এর আগেই চলে আসে! অবশ্য—হ্যাঁ! ব্যতিক্রম হয়! তখন ডেকে ডেকে খুঁজে-টুজে ধরে আনতে হয়। একটা ছোট নদী আছে এ গাঁয়ের সীমানার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। তার ওপারে এখানে-ওখানে বেশ কয়েকটা ছোট বড় টিলা। কোনটা একেবারেই ন্যাড়া। সেগুলো খুব বেশী উঁচু নয়, তেমন বিপদজনকও নয়। কিন্তু আর কয়েকটা দূরে দূরে ছড়ানো টিলা বেশ উঁচু এবং ঘন গাছ-গাছালিতে আচ্ছন্ন। চার-পাশে রুক্ষ, পাথুরে জমির ওপরে অনন্তকাল ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে এই সব টিলাগুলো। বিপদজনক জন্তু-জানোয়ার তেমন কিছু নেই। কিন্তু সাপ-বিছে তো আছে। সেজন্যে জঙ্গলে আচ্ছন্ন ওই সব বড় বড় টিলাগুলোর ধারে-কাছে যায় না বড় একটা কেউ। তবে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলেরা ন্যাড়া টিলাগুলোর ওপরে ওঠে, খেলা করে। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ শীতের দুপুরে অনেকে মিলে চড়ুইভাতিও করে। অন্যথা জায়গাটি খুবই নির্জন। আর বর্ষার সময় তো কেউ ওদিকে যায়ই না। যাওয়া সম্ভবও হয় না। বিশেষ করে নদীর এ পাশের গাঁয়ের লোকেদের পক্ষে। কারণ, ছোট নদীটি তখন ভীষণ স্রোতবতী হ'য়ে ওঠে। পরিধি বেড়ে যায় অনেক। তখন পার হয়ে ওপাশের

টিলায় যাওয়া দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেও বিপদজনক। তবু আশপাশের গাঁয়ের বড় ছেলেরা পার হবার চেষ্টা করে, হয়ও। বিপদও যে না ঘটে তা নয়। বছর দুয়েক আগে একটা ছেলে ভেসে গেছলো। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার আগেও এমন হয়েছে।

তন্নুকে নিয়ে অবশ্য তেমন চিন্তা করার কারণ এখনও ঘটেনি। কিন্তু নদী পার হয়ে সেই ন্যাড়া টিলার ওপরে ও চলে যায় কোন কোন দিন। একেবারে ওপরে উঠে গিয়ে বসে থাকে, একেবারে একা! সেই ভীতিপ্রদ নির্জনে একাকী বসে কোন বড় মানুষের পক্ষেও যেখানে অস্বস্তি বোধ হবার কথা, তন্নু সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। অবশ্য বর্ষার সময় নদী পার হ'তে পারে না বলেই যায় না। তখন এপারেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা কোন একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর সেইরকম একা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তখন দূর থেকে ওকে দেখলে মনে হয় যেন কোন বর্ষীয়ান দার্শনিক গভীর চিন্তামগ্ন। আবার কখনও কখনও মজার দৃশ্যও দেখা যায়। একা একা বসেই মাথা নেড়ে নেড়ে হাত নেড়ে নেড়ে—আ-আ-আ-উ-উ-উ ও-ও-ও করে একেবারে কালোয়াতি ঢঙে তান জুড়ে দেয় তন্নু। স্পষ্টই বোঝা যায়, তখন ওকে দেখলে যে তন্নু সেইসব গায়কদের— যাঁরা দীপাবলীর সময় ওদের বাড়ীতে আসে, গান করে, তাঁদের ভাব-ভঙ্গী এমন কি গলার স্বর পর্য্যন্ত নকল করে যাচ্ছে। ওর বাবার গায়ন-ভঙ্গীকেও নকল করতে ছাড়ে না ও। তখন ওর দিকে তাকালে একবারও মনে হয় না যে ও ছেলেমানুষ! বরং ওকে দেখে মনে হয় কি এক অদৃষ্টপূর্ব তন্ময়তা যেন ওকে ঘিরে একটা বলয় তৈরী করেছে, যাকে ভেদ করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো সেই মুহূর্তে অসম্ভব! ওকে খুঁজতে খুঁজতে যে বা যারা ওকে পেয়ে যায় সেইসব মুহূর্তে, তারাও যেন সেটা অনুভব করে, কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে ইতস্ততঃ করে। চুপ করে দূরেই একটু দাঁড়িয়ে থাকে। জোর গলায় ডাকতে গিয়েও থেমে যায়। অবশেষে তন্নু যখন আবার স্থির অবস্থা থেকে চঞ্চলতায় ফিরে আসে, তখন যারা ওকে খুঁজতে যায় তাদের যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। তারাও

অনুভব করে যে এতক্ষণ, যতক্ষণ তন্নু ওর কচি গলার আ-আ করে গান গাইছিল আপন মনে, তন্ময় হয়ে, ওর সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেন কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো। তাদের আর এক পা এগিয়ে গিয়ে তন্নুকে ধরবার বা ডাকবার ক্ষমতাও যেন ছিল না। তন্নুর কচি, মিষ্টি গলায় এখনই এক মুগ্ধতার যাদু যে তা বন্ধ করে দেবার ইচ্ছেই কারও মনে জাগতো না।

তা আজ এতক্ষণেও তন্নু যখন আসেনি, তখন নিশ্চয়ই সকলের চোখ এড়িয়ে তেমনিভাবেই কোথাও বসে আছে! তবু যাদের সঙ্গে তন্নু বেড়িয়েছে, তারা সকলে ফিরেছে কিনা দেখা দরকার। তন্নুর মা দরজায় শিকল তুলে বেরিয়ে এল চিন্তিত মনে। এই ভীষণ দুরন্ত চঞ্চল ছেলেটাকে শাসন করার কথা ভাবতেও পারে না তন্নুর মা। অথচ, ওর দুরন্তপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েও হিম্‌সিম খেয়ে যায়! নাঃ। এবার তন্নুর বাবা এলে তাকে বলে তন্নুকে নিয়ে পীরবাবার কাছে একবার যেতেই হবে। এই সন্তান তো তাঁরই দয়ায় পাওয়া! তিনিই বলে দেবেন এই দুরন্ত ছেলেকে কি ভাবে শান্ত, ধীর, স্থির করা সম্ভব হবে! এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই তন্নুর মায়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল পীরবাবা হজরত গণেসের সেই কথাগুলো! সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে রোমাঞ্চ হলো তন্নুর মায়ের! প্রতিবেশীর বাড়ীতে তন্নুর খোঁজ নিতে যাবে কি, পথের মাঝখানেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো সে! কবচটা! কবচটা আছে তো তন্নুর গলায়? চট্‌ করে মনে করতে পারল' না তন্নুর মা। অবশ্য সোনার সুতুলি দিয়ে ভাল করে বাঁধা আছে। কিন্তু যা দুরন্ত ছেলে! কোথায় না কোথায় চলে যায়। যদি হারিয়ে ফেলে থাকে? অমঙ্গল আশঙ্কায় হঠাৎ হাত-পা যেন অবশ হ'য়ে আসতে চাইলো তন্নুর মায়ের! আবার মনে মনে ভাবলো—না, না, কিছু ক্ষতি হবে না, হ'তে পারে না। পীরবাবা যা সব নিয়ম-প্রণালী বলে দিয়েছিলেন, তা তো সবই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে সে! কোনও কিছুরই তো এতটুকু ব্যত্যয় হ'তে দেয়নি, শত অসুবিধা সত্ত্বেও। পীরবাবা যেদিন আশীর্বাদ করে কবচটা তার হাতে তুলে

দিয়ে বলেছিলেন, "বেটি ! এই সিদ্ধ কবচ তোমাকে দিলাম। স্নান করে, শুদ্ধ হ'য়ে তোমার গলায় প'রে নিও। সব দোষ কেটে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই। তারপর তোমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে তার গলায় এটা পরিয়ে দিও। তোমার ঐ এক সন্তানই তোমার সব মনো-কামনা পূরণ করবে। তোমার দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটবে !" তারপর তন্নুর বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে পীরবাবা হজরত মহম্মদ গওস্ বলেছিলেন, "মুকুন্দরাম ! তোমার সন্তান, যে আসছে, সে হিন্দুস্তানে তো বটেই, তামাম দুনিয়াতেই একজন মান্যগণ্য, গুণী শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণ্য হবেই। তোমাদের শাস্ত্রে তো আছে যোগ-সাধনা একনিষ্ঠভাবে করলে তবে সিদ্ধি লাভ হয়, সেই বিভূতির অধিকারী হওয়া যায়, "যাকে তোমরা বল সমৃদ্ধিবান, বিভূতিশালী? তোমার সন্তানও তেমনই একজন হবে !"...

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তন্নুর মায়ের ! আবার দ্রুতপদে চলতে শুরু করলো। প্রথমে আদিত্য ছেলেটার খোঁজ করা দরকার। তন্নুর সঙ্গে তারই বন্ধুত্ব বেশী। বাঁ-দিকে ঘুরে আদিত্যদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল তন্নুর মা। সূর্যদেব অস্ত গেছেন। দূর-দিগন্ত থেকে অন্ধকার গুটিগুটি পায়ে নেমে আসছে। বাতাসে একটু হিমেল ভাব। তন্নুর মা আঁচলটা জড়িয়ে নিল গায়ে। এইসময় অস্পষ্ট একটা সোরগোল কানের পর্দায় এসে ঘা দিল যেন ! তন্নুর মা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে কান পাতলো। না। ঠিক সোরগোল নয়। ছোট-ছেলেমেয়েদের কলরবের মতো ! তারপরেই একটা গানের সুর ভেসে এল যেন। আদিত্যদের বাড়ীর দিক থেকেই। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল তন্নুর মা। বাড়ীর বাইরে থেকেই দেখলো উঠোনে অনেক ছেলে মেয়ে জড়ো হয়েছে। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও আছে। পুরুষ কাউকে অবশ্য দেখতে পেলো না তন্নুর মা। আগড়টা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই আদিত্যর মা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। আও বহেন্ ! দেখ ! দেখ ! তোমার লাড্‌লা তন্নু কেমন সুন্দর গান করছে ! তন্নুর মা গোল-হওয়া ভীড়ের মাঝে বসা মাথা-মুখ ভর্তি লম্বা চুলদাড়িওলা

নোংরা ঝোব্বা পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। পাশেই তন্নুও দাঁড়িয়ে আছে। তন্নুর মা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আদিত্যর মা বলল, "লোকটা বাঞ্জারা, ভবঘুরে। তবে গানটা বেশ গায়। কিন্তু ভাষা সব বোঝা যায় না। তবে সবচেয়ে মজা কি জানো? লোকটা যেমন গান গায়, সেই গানটারই সুর গলায় তুলে নিয়ে তোমার তন্নু-বেটাও গেয়ে দেয়। লোকটা তন্নুর ওপর খুব খুশী। বলে, এই ছেলে একদিন খুব বড় ওস্তাদ গাইয়ে হবে। আদিত্যর মা গর্‌গর্‌ করে বলেই যাচ্ছে। তন্নুর মা শুনছে কি শুনছে না, চেয়ে আছে ওই বাঞ্জারা লোকটার দিকে। বয়স কত তা বোঝা যায় না। তবে বুড়োই বলা যায়। কিন্তু গলাটা কি মসৃণ! তন্নুর মা-ও তো গায়কের বউ। প্রতি বছরই তো তাদের বাড়ীতে গানের আসর বসে। এত বছর ধরে শুনে শুনে তারও তো একরকম কান তৈরীই হয়ে আছে। কাজেই তন্নুর মা ঠিক বুঝতে পারলো। লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে গান ধরেছে! হাতের এক তারায় আঙ্গুলের ঘা পড়ে টুং টাং করে ঠিক তালে তালে বাজছে। বাঞ্জারা লোকটা ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গাইছে। পাশেই দাঁড়িয়ে তন্নু। গান শুনছে না যেন গিল্‌ছে! চোখ, মুখ, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন শুষে নিচ্ছে গানের প্রতিটি তান, কর্তব, সুরের প্রতিটি কণা! আর বাঞ্জারা লোকটাও গান গাইছে—তন্নুরই দিকে চোখ রেখে। চারপাশে যে আরও লোকজন, তন্নুরই বয়সী ছেলেমেয়ে সব গোল হয়ে তাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই লোকটার। যেন তন্নু নামে ছেলেটাকে গান শোনাতে পেরেই সে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছে। আর কেউ শুনলো কি না শুনলো তাতে তার কিছুই যেন আসে যায় না। গাইতে গাইতেই হঠাৎ গান থামিয়ে বাঞ্জারা লোকটা তন্নুকে বলল, "গাও, বেটা! মেরে সাথ গাও!" বলেই একতলায় বোল তুলে সপাট তানে একটা গান ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে তন্নুও ঠিক সুরে সুরে আর তালে তাল দিয়ে গেয়ে উঠলো। তারপর লোকটার নাচের সঙ্গে সঙ্গে তন্নুও নেচে নেচে ঘুরতে লাগল।

তন্নুর মা তো বটেই, উপস্থিত বড়রা সকলেই আজ, এই মুহূর্তে,

তাদের গ্রামের সব চেয়ে সুন্দর ছেলেটার একটা সুন্দর গুণের পরিচয় পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হলো! গান শেষ হ'তেই সকলে হৈ হৈ করে উঠলো বাঞ্জারা লোকটা তখন একতারাটি রেখে তন্নুকে একেবারে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বলছে : "রাজা বেটা! মেরে পেয়ারে বেটা! বহোত্‌ বড়া গবৈয়া বনেগা!"

এবারে তন্নুর মা এগিয়ে এলো। বাঞ্জারাকে বলল : "অব্‌ ছোড়্‌ দিজিয়ে গায়ন! (যে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে)। সন্‌ঝা উতার রহী হ্যায়! (সন্ধে হয়ে আসছে।) অভী পঢ়নে লিখ্‌নেকা সময়! এখন লেখাপড়ার সময়!"

"হাঁ, হাঁ মা-জী! মাফ করো!" বাঞ্জারা তাড়াতাড়ি তন্নুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল; "আপ্‌কা বেটা!—আপনার ছেলে? আপনি খুবই ভাগ্যবতী মা! আমার মন বলছে যে এই ছেলে একদিন খুব বড় গায়ক হবে। কোন বড় ওস্তাদের কাছে একে দিয়ে দেবেন মা। যাও বেটা! অব্‌ ঘর্‌ যাও—মা-কে সাথ। হম্‌ ফির কভী আবেঙ্গে—আবার আসব আমি।' বলে তন্নুকে আদর করে মায়ের কাছে দিয়ে দিল বাঞ্জারা। তারপর একহাতে তুলে নিল একতারাটা। অন্য হাতে তার একমাত্র সম্পত্তি ছোট্ট একটা পুঁটুলি তুলে কাঁধে ফেলে কোন একদিকে রওনা দিল।

"কখন সন্ধ্যে নেমেছে! আমি ওদিকে ভেবে মরছি! এদিকে ছেলে আমার কোথাকার কোন্‌ দুশমন্‌ বাঞ্জারার সঙ্গে নেচে নেচে গান করছে!" বেশ রাগের স্বরেই তন্নুর মা বলতে লাগল। ডান হাত দিয়ে তন্নুর বাঁ হাত শক্ত করে ধরা। দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে বলতে থাকে তন্নুর মা : "এবার তোমার বাবা আসুন। তোমাকে ওর সঙ্গে কাশীতে পাঠিয়ে দেবো। তখন এইভাবে দুষ্টুমি করে ঘুরে বেড়ানো তোমার বন্ধ হবে। আমিও কাছে থাকবো না। তখন বুঝবে মজা! তখন রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার বাবার কাছে পড়তে বসতে হবে। বুঝেচো? যখন খুশী, যেখানে খুশী চলে যাওয়া, তা আর হবে না।"

তন্নু অপরাধীর মত মাথা নিচু করে মায়ের হাতের টানে টানে—চলছিলো। মাঝে মাঝে একটুখানি মাথা তুলে মায়ের রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে পিট্‌পিট্ করে দেখে নিচ্ছিলো। এমনিতে মায়ের রাগ দেখে ভয় পাওয়ার ছেলে তন্নু মোটেও নয়। তবে এই মুহূর্তে কিছু বলতে গেলে মা যে আরো রেগে যাবে, এটা বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছে সে। আর সেজন্যেই সারাটা রাস্তা প্রায় চুপ চাপ চলে এল। যদিও বুকের মধ্যে একটা কেরামতি দেখাবার অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিলোই। সদর পার হয়ে বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই ছোট্ট তন্নু একেবারে পাকা ওস্তাদের মতো, একেবারে বাবার গলা নকল করে তান ধরে দিল! মায়ের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, সেই বাঁ হাত বাম কানের ওপর রেখে, ডান হাত সামনে ছড়িয়ে তনন তণনা তদেরে না দেরে, তদারে তদারে দানী তোম্ তনারে নারে; দির তোম্ দির তোম্ তনন তদিম্ দিম্, তাদিয়া না দেরদের্ তার্দে দানিম্-দিরি তাতা দিরি তাতা তরদে তাদিম্·····

তখন দূর-দিগন্তের আকাশ গোধূলীর লাল রঙ হারিয়ে ঈষৎ পাট্‌কিলে রঙ ধরেছে; নেমে আসছে এই গ্রামের আকাশ ঘিরে পাথুরে রঙের সন্ধ্যা। গাছে গাছে অসংখ্য পাখ্-পাখালির দল তাদের নীড়ে ফিরে এসেছে নিশ্চিন্তে। তাদের নানা রকম স্বরের নানা রকম ডাকে মধুর কলরবের ঐকতান। সেই ঐকতানের সঙ্গে তন্নুর গলার স্বর যেন সঙ্গত করে চলেছে যথার্থ ওস্তাদ সঙ্গতিয়ার মতো। কয়েকটা ছোট পাখী উঠোনেই হয়তো পোকা টোকা কিছু ঠুকে ঠুকে খাচ্ছিলো। এখন একেবারে তন্নুকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল। একটা উড়ে এসে তো তন্নুর মাথার ওপরেই বসে পড়ল। বসে থাকতে পারলো না অবশ্য। তন্নুর একমাথা চুলের ওপর পা দুটো বসাতে না পেরে উড়তে উড়তে তার মাথার চারপাশে ঘুরতে লাগল।

তন্নুর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলের গান শুনছে না কাণ্ড দেখছে! এক চোখে মৃদু প্রশ্রয়, অন্য চোখে রাগ; ঠোঁটের কোনেও রাগের সঙ্গে মিশে আছে যেন একটু হাসির রেখা। ছেলেটা অদ্ভুত নকল করতে শিখেছে! যেমন বাঘের ডাক থেকে গরু-ছাগলের ডাক

নকল করতে শিখেছে ; নানা রকম পাখীর ডাক তো নকল করছেই যখন তখন। এখন আবার নিজেরই বাপের গলার স্বর কি অবিকল তুলে নিয়েছে ! বড় হ'য়ে এ ছেলে যে কি হবে কে জানে ! এবারে ওর বাবা এলে সব বলতেই হবে। ছেলে বড় হচ্ছে, কিন্তু লেখাপড়া তেমন এগোচ্ছে না। এখানে থেকে আর তেমন এগোবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না তন্নুর মা। আবার এ কথাও ভাবতে পারছে না যে তন্নুকে যদি ওর বাবা নিজের কাছে কাশীতে নিয়ে যায়, তাহলে একা সে এত বড় বাড়ীতে থাকবে কি করে ? বিয়ের পরের সেই অভিশপ্ত বছরগুলোর কথা ভাবলে এখনও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তন্নুর মা-র ! তারপর সেই দীর্ঘ একাকীত্ব ! সেও একটা সময় গেছে ! তখন কটা বছর তারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে ভাল করে তাকাতে পর্য্যন্ত পারতো না। তখনও দীপাবলী আসতো, উৎসবের বাতাস এ বাড়ীতেও এসে লাগতো। বন্ধু-বান্ধবরা আসতো। মনে হ'তো ক্ষণেকের জন্য হ'লেও, এ বাড়ীর গুমোট ভাবটা বুঝি কেটে গেল ! কিন্তু তন্নুর মা লক্ষ্য ক'রতো, কোন বন্ধু এসে বলল,—"পাঁড়েজী, দীপাবলীর অভিবাদন গ্রহন করুণ !"—আর তন্নুর বাবার মুখভাব ম্লান হ'য়ে যেতো ! যেন মনে মনে তিনি বলছেন ঃ আর অভিবাদন ! সন্তানহীন সংসারে শুষ্ক অভিবাদনে আর কি প্রয়োজন " উৎসবের সুরে সুর মেলানো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হ'য়ে উঠতো। বুক ভেঙ্গে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইতো তন্নুর মায়ের। কোন রকমে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যেতো। দাসীকে দিয়ে খাবার দাবার পাঠিয়ে দিতো।

সে সময়েই এক বন্ধু একদিন বলল ঃ পাঁড়েজী ! এত হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন ? আপনাদের এমন কি-ই বা বয়স হ'য়েছে ? একটা কথা বলি শুনুন ! আপনি তো বিহটে এলেই একবার না একবার শহর গোয়ালিয়রে যান ! সেখানে একজন মস্ত বড় গুণী গায়ক আছেন। শুধু গায়কই নন্ তিনি ; সিদ্ধ পীরও বটে। একবার যান না তাঁর কাছে। তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে নিন। হ'তেও পারে আপনাদের

মনোস্কামনা পূরণ ! শুনেছি পীরবাবা অত্যন্তই সজ্জন !

খুব একটা উৎসাহিত না হলেও মুকুন্দরাম পাঁড়ে একটু কৌতূহলী হলেন,—আচ্ছা ! আপনি বলছেন যে সেই সিদ্ধ পীর একজন গায়ক ? অথচ, আমি তাঁর পরিচয় জানি না ? গোয়ালিয়রের সব ওস্তাদ গায়ক-বাদকদেরই তো আমি চিনি। সেই পীরবাবার নামটা কি বলুন তো ?"

বন্ধু আনন্দ শর্মা মৃদু হেসে বললে, "উনি লোক সমাজের আড়ালে থাকতেই বেশী পছন্দ করেন। সেজন্যেই গায়ক হিসাবে তাঁর পরিচয় খুব অল্প লোকেই জানে ! কেবল তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যরা ছাড়া। তাদেরও বারণ আছে তাঁর নাম প্রচার করার। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, যে সব ওস্তাদদের আপনি চেনেন, তাদের অনেকেই হয়তো তাঁরই শিষ্য ! এঁর নাম মহম্মদ গওস্ হজরত গোয়ালিয়রি।"

এ পর্য্যন্ত স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষ কাটাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি মুকুন্দরাম। এখনও বন্ধুর কথা শুনে খুব যে একটা উৎসাহিত বোধ করল, তা নয়। তবে একেবারে উপেক্ষাও করতে পারলো না। ডুবন্ত মানুষের কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টার মতই এই শেষ চেষ্টাটুকুও করে দেখতে চাইল মুকুন্দরাম পাঁড়ে। ফল যদি হয় তবে তো জীবনের স্বাদই পাল্টে যাবে ; নচেৎ এই বিহট থেকে একেবারে পাট তুলে দিয়ে কাশীতে গিয়েই স্বামী-স্ত্রী দুজনে ৺ বাবা বিশ্বনাথের চরনে ঠাঁই নেবে। এর বেশী আর মানুষের, তার মতো সামান্য মানুষের, কি ক্ষমতা !

রাত্রে শুয়ে পাশে স্ত্রীকে সে কথাই বলল মুকুন্দরাম ঃ "গৌরী ! সব কিছুই তো করা হলো। তাহলে এটাই বা আর বাকী থাকে কেন ? বন্ধু আনন্দ শর্মা তো জোর দিয়েই বলল উপকার হবেই। একান্তই যদি না-ই হয়, তাতেই বা কি ! আমাকে তো শহরে একবার যেতেই হবে। তুমিও একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসবে চলো ! এক ফাঁকে ফকির বাবার কাছে ঘুরে আসবোখন ; কি বল ? তোমার কোন আপত্তি নেই তো, গৌরী ?"

"আপত্তি ? না। আপত্তি কেন থাকবে ?" স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কোনও স্ত্রীর আপত্তি টেঁকে না কি? প্রশ্ন তা নয়। আসলে বরং গৌরীর ভালই লেগেছিল। এই গ্রামের মধ্যে থেকে থেকে, এই সীমাবদ্ধ এলাকায়, একই মানুষজনের মধ্যে, কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছিল গৌরীর। তার মধ্যে স্বামীর ঐ প্রস্তাব, কাজ হোক বা না হোক, আশীর্বাদের মতই মনে হ'য়েছিল!

এখন মনে হয় ভাগ্যে ফকির বাবার সাক্ষাৎ পেয়েছিলো, হাত পেতে নিতে পেরেছিল তাঁর আশীর্বাদ। তাঁর দেওয়া কবচ......আরে হ্যাঁ, কবচটা! তন্নুর গলায় কবচটা আছে কিনা দেখা হলো না তো! এক ধাক্কায় অতীতের চিন্তা থেকে বর্তমানে এসে পড়লো তন্নুর মা। কোথায় গেল আবার ছেলেটা? এই বাবার গলা নকল করে গান করছিলো? নাঃ! এই ছেলে নিয়ে আর পারিনা!—তন্নু! এই তন্নু! কবচটা হারিয়ে ফেলিস্‌নি তো, বাবা? এ তন্নু! এদিকে শুনে যা একবার, একবার শুনে যা, বাবা!......

* * * এই তো আমি! এক্ষুনি আসছি মা! কবচটাই তো খুঁজছি। কোথায় যে হারিয়ে গেল ওটা!—প্রেম্‌! প্রেম্‌! দেখো তো, আমার গলার কবচটা কোথায় ফেললাম! আমার মা দেখতে চাইছে! প্রেম! প্রেম! কোথায় গেলে তুমি! প্রেম্‌!......

...বাবা! বাবা! কষ্ট হচ্ছে? তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বাবা?'

তানসেন চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অস্থিরতা! তবু মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া কন্যা সরস্বতীকে চিনতে পারলেন।—"ও, সরস্বতী! দ্যাখ্‌ তো, আমার কবচটা কোথায় গেল! তোদের মা কোথায়? তাকে ডাক! সে বোধ হয় কবচটা লুকিয়ে রেখেছে!" বলতে বলতে আবার আচ্ছন্ন পড়লেন যেন তানসেন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সরস্বতী। আর তখনই নিজের মায়ের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো! দুচোখ জলে ভরে উঠলো!...মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল মা—পাচ্ছিল কয়েক মাস ধরেই! এমনিতেই তো মা কথা বলতো কম। তারপর বাবা যখন দিল্লী চলে এল, সম্রাটের অন্যতম সভাগায়ক হয়ে, মা-কে

সঙ্গে নিয়ে গেল না। মা তখনও কোন কথা বলে নি। তিন দাদার একজনও তখন বাড়ীতে ছিল না। কাজের সূত্রে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল। মা তাই একমাত্র ছোট মেয়ে সরস্বতীকেই বুকে ধরে বেঁচেছিলেন। তাতে সরস্বতীরই বেশী লাভ হয়েছিলো। সঙ্গীতের প্রথম পাঠের হাতে খড়ি তাদের ভাইবোনেদের মায়ের কাছেই। তাদের মা-ও শ্রেষ্ঠ কলাপটিয়সী, বস্তুতঃ যুগের শ্রেষ্ঠ গায়িকা, তানসেনের যোগ্য সঙ্গিনী, সহধর্মীনী। মা তবুও নিজেকে আড়াল করেই রেখেছিলো। কখনও স্বামীর যাত্রাপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি বা দাঁড়াতে চায়ও নি! অবশ্য বাবার দিক থেকেও কোন অনাদর বা উপেক্ষা ছিল না মোটেও। তবুও কোথায় যেন একটা। সূক্ষ্ম চিড় ধরে গেছলো আর মেয়ে বলেই হয়তো সরস্বতী তার কিছুটা আভাস পেয়েছিল!

সে যাক। বাবা দিল্লীর দরবারের আহ্বান পেয়ে চলে যাবার পর মা একেবারে কন্যা সরস্বতীকেই আঁকড়ে ধরলো। যত সঙ্গীত ছিল হৃদয়ের গহীন গোপন কন্দরে কন্দরে সঞ্চিত, সব উজাড় করে মা কন্যাকেই দিয়ে দিল। মা শুধু সুর-তান-লয় শিখিয়েই ক্ষান্ত হতো না। সঙ্গীত শাস্ত্র যে ঈশ্বরের এক তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি, এর যে 'আত্মিক সৌন্দর্য্য' এর যে একটা পরিপূর্ণ নিটোল রূপ আছে ; বস্তুতঃ প্রত্যেক রাগ বা রাগিনীরই যে একটা সম্পূর্ণ নিটোল রূপ তাকে ঈক্ষন বা ধ্যান করা, নিবিষ্ট মনে শ্রবন করা, তার গীতি-প্রতিরূপের পরম্পরাকে মনে মনে দেখা, সেই দেখার শক্তি অর্জন করা, তবেই তো সার্থক সঙ্গীতবিদ্ বা শিল্পী হয়ে ওঠা যায়। এমনি করেই মা বোঝাতো।

এরকম বোঝাতে বোঝাতেই মা অনেক সময় কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়তো। চুপ করে যেতো। চোখ দুটোতে কেমন এক দৃষ্টি, সর্বস্ব খোয়ানো দৃষ্টি। সরস্বতী মায়ের সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলতো না, সেই পবিত্র নীরবতা ভাঙ্গতে ওর ইচ্ছা হতো না। অবশ্য খানিক পরেই মা আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতো।—আহ্, —কাতর ধ্বনি করে উঠলেন তানসেন।

চম্‌কে ফিরে তাকালো সরস্বতী। এতক্ষণ নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল।

মায়ের কথা এখন আর মনে করার অবকাশ নয়। বাবাকেও সরস্বতী কম ভালবাসে না। যে বাবা এখন ওর মুখ্য ধ্যান-জ্ঞান, সেই বাবাই এখন—কি জানি, বাকিটা ভাবতে গেলেই চোখে জল ভরে আসে, গলা রুদ্ধ হয়ে যায় উদগত অশ্রুতে।

বাবার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে, বাবা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আস্তে আস্তে উঠে এলো সে। রূপবতী আর মেহের পাশের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। থাক। ওদের আর আপাততঃ ব্যস্ত করে লাভ নেই। ঘরের দরজা ভেজিয়ে সরস্বতী বাইরে এল।

দরজা ভেজানোর সামান্য শব্দেই তানসেন চোখ মেলে তাকালেন। শূন্য ঘর। এক কোনে লম্বা পিলসূজের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু সল্‌তে কমানো। ঘরের মধ্যে আলো আঁধারি। এতক্ষণ—কতক্ষণ কে জানে, তিনি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলেন। কেবলই চলছিলেন, চলছিলেন। এক অন্তহীন পথের মাঝে কতো—কতোদিন আগে হারিয়ে যাওয়া সেই সদাচঞ্চল সদা অস্থির বালক যে কেবলই মাঠে, জঙ্গলে, নদীর পাড়ে নয়তো বা গঙ্গাতীরে দুরন্ত হরিণ শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নয়তো ক্ষেতে ক্ষেতে গরু চরিয়ে বেড়াচ্ছে। আর নয়তো বাঘ-সিংহ বা পাখ-পাখালির ডাক নকল করে লোকজনদের ভ্রম খাইয়ে দিচ্ছে। কখনও বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে একাকী কোথাও বসে, বা নদীর পাড়ে নির্জন টিলার ওপর একলা বসে আপন মনে আ—আ করে যাচ্ছে। সাপ, বিছে, জন্তু-জানোয়ার কোন কিছুকেই যার ভয় নেই, এমন কি ভূত-পেত্নীর ভয় দেখিয়েও যাকে নিরস্ত করা যায় নি, যে একেবারে প্রকৃতিরই আদুরে শিশু, প্রকৃতিরই ক্রোড়ে লালিত প্রাণময় সন্তান, সেই বালক তন্নুর সঙ্গে কতকাল পর দেখা হলো! কতকাল আগে হারিয়ে যাওয়া মানুষজন সবাই চারপাশে ভীড় করে এসে দাঁড়ালো। সেই বালক তন্নুর চোখের ভেতর দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন তানসেন! আর ক্ষণে ক্ষণে বুকের মধ্যে কি যে হাহাকার! কি এক অজানা, অনির্দেশ্য বিষাদ! সেই প্রাণময় দুরন্ত

বালককে গম্ভীর করে তোলে, করে তোলে আশপাশ সম্পর্কে সচেতন !' কোথায় যেন অকস্মাৎ কি একটা ঘটে যায় ! ঠিক বুঝতে পারে না বালক তনু। এ কোথায় চলেছে সে ? সামনে যে চোখ ধাঁধানো আলোক-বৃত্ত তাকে আকর্ষণ করছে সেখানে কি সে পৌঁছুতে পারবে ?

***রামতনু ! এগিয়ে যাও ! আরও এগিয়ে যাও ! অনেক অনেক দূরের পথে পাড়ি দিতে হবে তোমাকে। না, না, ঐ ক্ষণিক, চিত্তচমৎকারী চোখ ধাঁধানো আলোক বৃত্তের কাছে যেও না, অত সহজে মুগ্ধ হয়ো না। ওই পথ তোমার নয়। অত সহজে বিভ্রান্ত হয়ো না। এই দিকে এসো ! এই সিদ্ধাসনে এসে দাঁড়াও ! এইখানে দাঁড়িয়ে কঠোর যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে সেই পরমকাম্য নাদব্রহ্মের ধ্যান করতে হবে। তবেই তো বুঝবে পূর্ণ সাধনার অবসানে কেমন করে সপ্তসুর প্রকাশিত হয়। সেই যৌগিক সপ্তচক্র ভেদ কেবলমাত্র যোগবলেই সম্ভব হয়। সেই যোগবল তোমাকে আয়ত্ব করতে হবে। এই সব অর্থহীন ঝকমকে আলো কিছু নয়। এর পরেই অসীম আঁধার বৃত্ত ! সে বড় ভয়াবহ রামতনু ! সে আঁধার-বৃত্ত অতিক্রম করা, অতিক্রম করে সাধনার স্নিগ্ধ আলোর জগতে প্রবেশ করা, সে বড় দুরূহ ! রামতনু ! মনে রেখো, সেখানেই তোমাকে পৌঁছুতে হবে। কেন না, ওইখানেই তোমার আসল কর্মক্ষেত্র ! এগিয়ে যাও ! দৃঢ়চিত্তে, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও সেই আসল কামনার তীর্থে !...

......এ কোথায় এলাম আমি ?...দশবছরের রামতনু ভয় কাকে বলে জানে না। ওদের বিহট গ্রামে, কতদিন জঙ্গলের পথে, সন্ধ্যের আঁধার ঘেরা মিশকালো পথ পার হয়ে একা একা বাড়ী ফিরে এসেছে ও। জঙ্গলের গাছেদের মাথায়, ঝোপে ঝাড়ে শত শত জোনাকির জ্বলা নেভা, কিংবা আকাশের বুকে হালকা, টুকরো সাদা মেঘেদের ভেসে চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ওর বুকের ভেতর থেকে আপনা আপনি গান জেগে উঠেছে। ও আপন মনেই সেই সব ভাসমান মেঘের দিকে বা গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকিদের বিরতিহীন জ্বলানেভা দেখতে দেখতে একেবারে একান্তই নিজস্ব সুরে নিজের কথায় গিয়ে উঠেছে ! সেই সব গানের কি

সুর, কোন্ তাল ; সেই সব কথার অর্থই বা কী তায়তো বালক রামতনু কিছুই জানে না, তারা এসেছে, আবার কখন চলেও গেছে। ওই সব ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেদের মতো কোথায় সুদূরে ভেসে চলে গেছে। হয়তো দিনের আলোয় জোনাকিদের মতো হারিয়েই গেছে। একেকদিন নদীর ধারে গাছের নিচে বসে বা কোন টিলার মাথায় বসে বসে একা একা কত কি ভেবেছে। কত কত মনোহর অনুভব! ও একেবারে বুঁদ হয়ে, যেন বিশ্ব চরাচর পার হ'য়ে অন্য এক অজানা, বিভাসিত স্থানে চলে যেতো। তখন তো ওর ভয় ডর ছিল না। কিন্তু আজ! আজ কি জানি, কি এক অচেনা ভয়ে হঠাৎ ও ভীষণ অসহায় বোধ করতে লাগল! সত্যিই! সেই আলোকবৃত্ত ক্ষণেকের জন্য ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল! এখন! এখন যে সামনে ঘোর অন্ধকার! অফুরান অন্ধকার? আহ্!

...না, না, রামতনু! কোন কিছুই অফুরান নয়। সব কিছুরই অন্ত আছে। অযথা শঙ্কিত হয়ে সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না! —তোমার অক্লান্ত কৃচ্ছ্র সাধনার শেষে দেখবে সত্যের সেই ভাস্বর দীপ্তি, সেই কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং কোটিচন্দ্রসুশীতলং তোমার নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে! এই অন্ধকার দেখে ভয় পেওনা! চলো। এগিয়ে চলো! আরও, আরও, আরও!......

"মনগজ ভয়ো অরসমান—ওয়ত্অ পর্‌বল চোবড় হে—

উরব তুরব ধুন্ধকার—মদন তুহাই....সন্‌মুখ হোত্ জা কোঁ-শুনড্‌বারো—

ইমন্দ ইমন্দ কীমন্দ কুকারো—পর্‌বল ফুণী ফুন্‌কারো...',

স্তিমিত প্রদীপের সামান্য আলোয় আলোকিত শূন্য ঘরে, একাকী শুয়ে আছেন তিনি। কিন্তু দৃষ্টি, মন তাঁর পাখা মেলে দিয়েছে সুদূর অতীতের সেই মধুর জীবনে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেই তনুকে। তনু এখন আর সেই ছোটটি নেই। তনুর নাকের নীচে এখন গুম্ফের রেখা। থেকে থেকে বুকের মধ্যে কি এক শূন্যতা! মনে হয় সব কিছু

ছেড়ে দিয়ে কেবল চুপটি করে একাকী বসে থাকি! আর ওই বসে থাকতে থাকতেই মনের মধ্যে গান গুন্‌গুনিয়ে ওঠে—মনগজভয়ো……

এ পর্য্যন্ত গানটা লিখে বার কয়েক পড়লো রামতনু। কিন্তু, এখানে তো শেষ হয় না। মেলে না। আরও কয়েকটা লাইন লিখতে হবে। অথচ, এখন, এই মুহূর্তে আর ভাল লাগছে না। উঠে পড়ল ও। হাঁটতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ কি জানি কেন বাবা মায়ের কথা মনে পড়ল। অনেক দিন, দিন নয় বৎসর, হ্যাঁ, ছয় বৎসর পার হয়ে গেল। মনে হয়, এই তো যেন গতকালই ওদের গ্রাম ছেড়ে মা-বাবার সঙ্গে কাশীর পথে রওয়ানা হয়েছিল। বাবা মুকুন্দরাম সেবার সব ব্যবস্থা করেই কাশী থেকে গ্রামে এসেছিলেন। সেই বছরও ৺কালী পূজার সময় প্রতিবারের মত ওদের বাড়ীতে সঙ্গীতের আসর বসেছিল। দূর দূর শহর থেকে বাবার গায়ক বন্ধুরা সব এসেছিল। তারা খুব মনমরা হ'য়ে গেছলো যখন শুনলো মুকুন্দরাম পাঁড়েজী এবার বেশ কিছুদিনের জন্য সপরিবার কাশীতেই চলে যাবেন। আগামী কয়েক বৎসর, কত বৎসর তা বলা কঠিন, এই গ্রামের বাড়ীতে আর তাদের বাৎসরিক মিলনোৎসব হবে না। বাবার বন্ধুরা সবাই বিষণ্ণ হলেন। কিন্তু সেই কারণেই বোধ হয় সেবার সঙ্গীতের আসরও খুব জমে উঠেছিল। বাবার বন্ধু ওস্তাদেরা তো মন প্রাণ ঢেলে গেয়েছিলেন বটেই, কিন্তু ওর বাবা স্বয়ং সেদিন সঙ্গীতের যে ঝর্ণা ধারা বহিয়ে দিয়েছিলেন, তা রামতনু সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না। কেবল ও নয়। ও তো ছেলে মানুষ। সমবেত ওস্তাদেরাও সেই কথাই বার বার তারিফের সঙ্গে জানালো। শ্রদ্ধার সঙ্গে বন্ধুদের প্রশংসা মাথায় তুলে নিয়েছিলো বাবা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো ওস্তাদ গুণী বন্ধুদের। সেদিনকার প্রাণস্পর্শী বিদায়ক্ষণের কথা আজও মনে আছে তন্নুর।

বোধহয় সেইদিনের সেইক্ষণ থেকেই ন'বছরের তন্নুর বড় হয়ে মস্ত গায়ক হবার আকাঙ্খা দৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে বসে। তারপর তো ওরা চলে আসে কাশীতে।—

কাশীতে এসে বালক তন্নু আনন্দে একেবারে নেচে ওঠে! কোথায় ওদের ছোট্টগ্রাম বিহট, আর এই বিরাট শহর কাশী! কত মন্দির, কত বাড়ীঘর। আর কত কত লোকজন! ওরে বাবা! পথ দিয়ে চলাই যায় না। অথচ, পথগুলিও কত বড়। গ্রামে এত বড় পথের কথা কেউ ভাবতেই পারবে না। অবশ্য পরে যখন ওদের গনেশ মহল্লার বাড়ীতে পৌঁছলো, তখন বুঝতে পারলো তন্নু, সুরুড়—গলিপথও এখানে অনেক আছে। বাবা বলছিলো যে এখান থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট খুবই কাছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাটও বেশী দূরে নয়। সবচেয়ে কাছে অবশ্য চৌষট্টি ঘাট—চৌষট্টিটা সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে উঠতে হয়। 'চল! চল! সবই আস্তে আস্তে দেখবে।'

কাশী নগরীতে পা দিয়েই যেমন বালক তন্নুর মন আনন্দে নেচে উঠেছিলো, ঠিক তেমনই আনন্দে, বিস্ময়ে আর কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপ্লাবিত চোখে বারবার মুকুন্দরামের হাত দুটো নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত কৃতার্থতা জ্ঞাপন করতে লাগলেন আচার্য প্রভঞ্জন চতুর্বেদী। হ্যাঁ, এইবার আর মুকুন্দরাম আচার্যজীর সানুনয় অনুরোধ এড়াতে পারে নি। সত্য কথা, আচার্যজী যথেষ্টই প্রবীণ হ'য়েছেন। আর, মুকুন্দরাম মনে মনে ভাবলো, সে তো এবার ছেলে,—বউকেও কাশীতে নিয়ে যাচ্ছে। তন্নু সত্যিই বড্ড দুরন্ত হয়ে উঠেছে। লেখাপড়ায় একেবারেই মন নেই। ব্রাহ্মণ সন্তান। একেবারে লেখাপড়া শিখবে না তা তো হয় না। কাশী বিদ্বান পণ্ডিতদের স্থান। এখানে পড়ালেখার পরিবেশও আছে। আর টোল, বিদ্যাপীঠও রয়েছে অনেক। আচার্যজী যদি তারই সংসারের একজন হয়ে কাশীতেই থেকে যেতে চান, তাতে তার কোনও আপত্তি নেই—একথা আচার্যজীকে জানিয়েছে মুকুন্দরাম।

মুকুন্দরামের প্রস্তাব শুনে ক্ষণেকের জন্য আলোকিত হয়ে উঠেছিল আচার্যজীর মুখ! কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বললেন, "গ্রামে আমার পাঠশালার জন্য যদি আর একজন আচার্য পাওয়া যেতো, তাহলে অবশ্যই আমি আপনার কৃপা গ্রহণ করে ধন্য হতাম, পাঁড়েজী। ওখানে

যে অনেকগুলি ছেলেমেয়ের বিদ্যাশিক্ষার সামান্য গোড়াপত্তনটুকুও হবে না। আমি এতবড় স্বার্থপর তো হ'তে পারবো না, পাঁড়েজী! আপনি আমার শেষ আকাঙ্খা পূরণ ক'রে দিন, বাবা বিশ্বনাথের দর্শন করিয়ে দিন একবার। তাহলেই আমি আপনার আভারি থাকবো—কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে। গ্রামে তো আমাকে ফিরে আসতেই হবে ঐসব ছেলেমেয়েদের জন্য। আর তনু বাবার জন্য চিন্তা কি! সে তো কাশীতে আপনার কাছেই থাকবে। উত্তম কোন টোলে দিয়ে দেবেন। তার বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। ঈশ্বর তার মঙ্গল করবেন, আপনাদের সবার মঙ্গল করবেন! না হ্লে, কাশীতেই যদি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম. এখানেই, বাবা বিশ্বনাথের ভূমিতে, পূণ্য সলিলা গঙ্গাজীর তীরে, মণিকর্ণিকার কোলে, শেষ শয্যা যদি নিতে পা—'বলতে বলতে বৃদ্ধ আচার্যের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, "পাঁড়েজী! সমস্ত জীবনটাই তো আমার আপনাদের কৃপায়, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করেই কেটে গেল। এখন এই শেষ ইচ্ছাটুকু পুরোলেই জীবনকে সার্থক বলে মানবো।"

"আচ্ছা, থাক, থাক! আপনাকে অতকরে আর বলতে হবে না। চলুন আপনি আমাদের সঙ্গে! বিশ্বনাথ দর্শন করে, যে কদিন ইচ্ছা থেকে যদি চান, গ্রামে ফিরে আসবেন। আমি লোকের বন্দোবস্ত করে দেবো। সে আপনাকে গ্রামে পৌছে দিয়ে যাবে।' প্রায় একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গিয়েছিলো মুকুন্দরাম। এ ছাড়া আচার্যজীকে থামানো যেতো না।........

...আচার্যজীর কথা মনে পড়তে রামতনু কেমন বিষণ্ন বোধ করলো। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে ও। যমুনাজীর পাড়ে এই দিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। যমুনাজী এখানে অনেকখানি বাঁক নিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে! মাঝে মাঝে জেলেদের পানসি দেখা যায়। জাল ফেলে মাছ ধরছে। আবার বড় বড় বহিত্র (নৌকা) দেখা যায় পাল তুলে দিয়ে যাত্রী বা মালপত্র নিয়ে চলেছে। হয়তো অন্য কোনও নগরে বা গ্রামে; কিংবা বড় কোনো গঞ্জে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে।

এইখানে, এক জায়গায় এসে মাঝে মধ্যে বসে, বসে থাকে রামতনু। যমুনাজীর অতল নীল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে ও কত কি ভাবে। কত সুখ, আনন্দ ভরা শৈশব-বাল্যের দিনগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কাশীর কথাই আবার মনে পড়ে যায়। এ মন্দির থেকে সে মন্দির, এই ঘাট থেকে সেই ঘাট! আচার্য-জীতো হাঁফিয়ে উঠতেন: "তন্নু বেটা! থোড়া সা রুক্ যা বেটা! বুড়ো হ'য়ে গেছি তো, বাবা! আমি কি তোর সঙ্গে ছুটে ছুটে পারি! একটু থাম্, বাবা! এইখানে বসে একটু জিড়িয়ে নিই। হ্যাঁ রে, তন্নু বেটা! তোর কি ভুখ্ লাগে নি? ক্ষিধে পায় নি তোর?"

তন্নু জোরসে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ তো! খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সেই দুপুরে খেয়ে তারপর থেকে তো কেবল হাঁটছি। কোথায় তিল-ভাণ্ডেশ্বর মহাদেব, কোথায় দুর্গাবাড়ী, তারপরে তো এই হরিশ্চন্দ্র ঘাট। হাঁটাহাঁটি কম হলো! দুপুরের খাওয়া কখন হজম হ'য়ে গেছে।"

"হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছিস্ তন্নু বাবা! আমি বুড়ো মানুষ। আমার তো একটু দেরী লাগে খাবার হজম করতে। তারপর তোর মা আমাকে যেমন চর্বচুষ্য লেহ্যপেয় খাওয়াচ্ছে! দেখ্! সেই দম্‌ভর খাওয়ার পর আমারই এখন ভুখ্‌ভুখ্ লাগছে। তা তোর তো লাগবেই। কোন চিন্তা নাই তোর। দেখ্ তো ধারে কাছে কোন খাবার ভাজির দোকান আছে কিনা? আমার কাছে আধা সিক্কা-তঙ্কা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আচার্যজীর হাত ধরে টানতে লাগল তন্নু। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে আসার পথে, কাছেই, বাঁ দিকে একটা ভাজি মণ্ডার দোকান দেখেছে ও।—"তাউজী! এখানে আর বসতে হবে না। আগে চলুন! কাছেই আমি মণ্ডা-ভাজির দোকান দেখেছি। খেয়ে আসি। তারপরে রাজার ঘাটে বসে বিশ্রাম নেবেন!"

দুজনে মিলে পেট ভরে পুরি আর পানীফলের ছাতু দিয়ে তৈরী মিষ্টি জলেবী খেলো। এক ভাণ্ড করে কাশীর বিখ্যাত বাল্‌াই (মালাই) খেয়ে পেট ভরে জল খেলো। তারপর দুজনে ফের হরিশ্চন্দ্র ঘাটে, একেবারে জলের কিনারায় সিঁড়ির ওপরে এসে বসলো। বসতে পেরে

বেশ আরাম বোধ করলেন আচার্য্য প্রভঞ্জন চতুর্বেদী। এইখানে এসে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা অল্প একটু ঘুরে আবার সোজা দূর-দিগন্তে মিলিয়ে গেছে! দিন শেষের সূর্যালোক জলের ওপর পড়ে অসংখ্য হীরকখণ্ডের মত চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না বেশীক্ষণ। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুঁজে পেছনের সিঁড়ির ধাপে হেলান দিলেন আচার্যজী। একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন! তার আজীবনের আকাঙ্খা পূরণ হয়েছে। প্রাণ ভরে বাবা ৺বিশ্বনাথের চরণ সেবা করেছেন! তারপর তন্নুবাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কাশীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানও দেখা হলো। মুকুন্দরাম ব্যস্তলোক। তবু সে সর্বক্ষণ আচার্যজীর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখেছে। বহুরাণী, তন্নুর মায়ের সেবা-যত্নেও কোন ক্রটি নেই। দেখতে দেখতে শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে আবার শুক্লপক্ষ সুরু হয়ে গেলো। এবার গ্রামে ফিরতে হবে। ভাবতেই মনের ভেতরটা কেমন আঁধার হ'য়ে গেল! আবার সেই গ্রাম! আবার সেই একঘেয়ে কাজ!—ছিঃ! সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তীব্র ভাবে তিরস্কার করে উঠলেন আচার্য প্রভঞ্জন! মানুষের মন থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা, বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে পরিশীলিত মার্জিত মানুষ তৈরী করাই আবহমান কাল থেকে ভারতবর্ষীয় আচার্যদের পবিত্র ব্রত হিসাবে গণ্য হ'য়ে আসছে। তিনি আজ তার অন্যথা করতে পারেন না! সেই অধিকারই নেই তার। নিজের গুরুদেবের আদর্শে তিনি দীক্ষিত। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, সক্ষম থাকলে, তাকে এই ব্রত পালন করে যেতেই হবে। আজ ঘরে ফিরেই তিনি মুকুন্দরামকে বলবেন। যত শীঘ্রসম্ভব তার গ্রামে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে। নিজের চিন্তায় মগ্ন আচার্য-জীর হঠাৎ খেয়াল হলো! আরে! তন্নুবাবা কোথায় গেল? ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। দেখতে পেলেন না। থাক! ছেলেমানুষ! ঘুরে ফিরে দেখুক। ঘরে ফেরার সময় হলে দেখে খুঁজে নেবেন। নিজেই তন্নুবাবা চলে আসবে। তার চক্ষুর পাতাদুটি ভারী হ'য়ে এলো। নিদ্রার আবেশে আপনিই চোখ বুঁজে এলো।

তন্নু আপন মনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। দেখছিলো। এক জায়গায়

দেখলো একজন জটাজুটধারী সাধু বসে আছে। তার সামনে, মাটিতেই খানিক গর্ত করে আগুন জ্বালালো। একটা বেশ মোটা কাঠের টুকরোতে আগুন জ্বলছে। সাধুর ডান দিকে একজন সাধুনীও বসে আছে। তাদের সামনে হাতজোড় করে বসে আছে ধুতি-পিরান পরা একজন লোক এবং লালপাড় শাড়ি পরা একজন মেয়েলোক। তন্নু খানিক দাঁড়িয়ে দেখলো দূর থেকে। মনে মনে ভাবলো—ওই ভদ্রলোক আর তার জেনানালোক বোধ হয় সাধুর কাছে বর চাইতে এসেছে!

সাধ একবার মুখ তুলে তাকাতেই তন্নুর চোখে চোখ পড়ল। সাধু ডান হাত তুলে তন্নুকে ডাকল! ভয় পেয়ে গেল তন্নু! ও শুনেছে যে এইসব সাধুরা ভীষণ খারাপ হয়। ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। নানা রকম কষ্ট দেয়। তন্নু পেছন ফিরেই দৌড়ে পালালো। সাধুর কাছে যাবার একটুও ইচ্ছে হলো না ওর।

এক ছুটে একেবারে ঘাটের সিড়ির ওপরের ধাপের কাছে চলে এলো। সেখানেই ছোট্ট মন্দিরটা। রঙকরা পাথরের মূর্তি রয়েছে ভেতরে। চণ্ডাল বেশে রাজা হরিশচন্দ্র, রাণী শৈব্যা বিস্রস্ত বসন, উস্কোখুস্কো কেশ, চোখ দুটি থেকে অবিরল অশ্রু পড়ছে। বসে আছেন একমাত্র সন্তান রোহিতাশ্বের মৃতদেহ কোলে নিয়ে। এখানে আসতে আসতে আচার্য-তাউজীর কাছ থেকে দানবীর, ত্যাগী, রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী শুনেছে তন্নু! শুনতে শুনতে ওর নিজেরই কান্না পেয়ে গেছলো। অবশ্য দেবতার আশীর্বাদে রাজা আবার সব ফিরে পেয়েছিলেন জেনে শান্ত হয়েছিল।

"ওই দেখো! তাউজী কি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? নীচের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেই তর্‌তর্ করে নেমে গেল তন্নু! তাই তো! তাউজী তো ঘুমিয়েই পড়েছে। তাউজীর হাতে ঝাঁকুনি দিয়েই চম্‌কে উঠলো তন্নু! বাস্‌রে! তাউজীর হাতটা কি গরম!—"তাউজী! উঠো! উঠো! আভি ডেরাহ্ যানা হ্যায়! সূরজ ঢল্ গয়া! আন্ধেরা উতর্ রহী হ্যায়!" প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো তন্নু!

অকস্মাৎ, কি একটা অজানা অনুভূতি ছোট্ট তন্নুর বুকের ভেতর থেকে খা খা করে তেড়ে এলো! এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলো ও! আবার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো তন্নু!

ওর ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন আচার্যজী! —"আঁ-আঁ-কি-কি হয়েছে?" তন্নুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি!

তন্নু দেখলো আচার্য-তাউজীর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। ও কোন মতে বলল, "ঘরে ফিরতে হবে। সূরজ ডুবে গেছে সন্ঝা হয়ে যাচ্ছে। এর পরে ফিরতে অসুবিধা হবে।"

"ও! হাঁ, হাঁ! চল্ বেটা!" বলতে বলতে বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়ালেন আচার্যজী।"—আমার হাতটা একটু ধর্, বেটা! আমার হাত ধরে নিয়ে চল্! তবিয়ত খারাপ লাগছে রে বেটা তন্নু! মনে হ'চ্ছে কি বুখার (জ্বর) চড়ে গেছে!"

ছোট্ট তন্নু প্রায় ঘাড়ে পিঠে চাপিয়েই যেন আচার্য-তাউজীকে ঘরে নিয়ে এলো। দেরী দেখে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে দেখে ওর মা পথের পাশেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল। পথ তো কম নয়। সেই হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে গণেশ মহল্লা! বাড়ীর কাছাকাছি এসে তন্নুর ন'দশ বছরের শরীরটা যেন নুয়ে পড়তে চাইছিলো। মা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো।

এতক্ষণ যেন কোন মতে হুঁশটুকু ধরে রাখতে পেরেছিলেন আচার্য-চতুর্বেদী। বিছানায় ধরাধরি করে শুইয়ে দিতেই একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে গেলেন। তার অবস্থা দেখে তন্নুর মা ভীষণ ঘাবড়ে গেল! প্রতিবেশী মহিলা বয়স্কা। আশ্বস্ত করে তন্নুর মাকে বলল, "ভয় পেও না, মা! জ্বরটা একটু বেশী বেড়ে গেছে। তুমি কপালে জল পট্টি দাও! জ্বর নেমে যাবে। যদি না নামে তাহলে কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনতে হবে। খোকার বাবা তো এখনও ফেরেন নি। যদি দরকার পড়ে আমাকে খবর দিও।' বলে মহিলা চলে গেলো। পাশেই তার বাড়ী।

তন্নুরা মাত্র কয়েকদিন আগে কাশীতে এসেছে। এখনও আশ-

পাশের লোকেদের—প্রতিবেশীদের সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় হয়নি। পথঘাট তো চেনেই না। একেবারে পাশের বাড়ীর এই মহিলার সঙ্গেই প্রথম আলাপ পরিচয়। এ'কদিন একসঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে তুজনে গঙ্গাস্নানও করেছে। কথাবার্তাও বলেছে। তন্নুর মা তার ভাষায় আর মহিলা তার। এটা বুঝেছে তন্নুর মা যে মহিলা বাংলা মুলুকের। মানে বাঙ্গালিন্। কিন্তু অনেকদিন কাশীতে আছেন। তাই তন্নুর মায়ের ভাষা সহজেই বুঝে যান মহিলা। কিন্তু তন্নুর মা সব কথা বুঝতে পারে না মহিলার। তবে খুব একটা অসুবিধা অবশ্য হয় না। হাবে ভাবে ঠিকই বুঝে নেয়। তাড়াতাড়ি কাপড়ের টুকরো কেটে, বাটিতে জল নিয়ে জলপট্টি দিতে আরম্ভ করলো। তন্নুর বাবা এখনও ফেরেনি। ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করলো তন্নুর মা। তন্নু বেচারাও কাহিল হ'য়ে পড়েছে। হবেই তো। মাত্র ন' বছরের ছেলে। অতবড় দেহটাকে প্রায় ঘাড়ে বয়ে এনেছে কতটা পথ! একা একা আচার্যজীর শিয়রে বসে জলপট্টি দিতে দিতে নানা তুশ্চিন্তা মাথায় ভীড় করে আসতে লাগল তন্নুর মায়ের। এখনও রাতের খাবার তৈরী হয় নি। তা ছাড়া আচার্যজীকেই বা 'ক খেতে দেবে!' জ্বর হলেই বা। রাতে একেবারে না খেলে আচার্যজী তুর্বল হ'য়ে পড়বেন। আবার ভাবলো, বুড়ো মানুষ। তার উপর জ্বর। এক রাত্রি না খেলে কিছু হবে না। কিন্তু তন্নু আর তার বাবা তো তা বলে না খেয়ে থাকতে পারেন না! কিন্তু, এখন এই রুগীকে ছেড়ে খানা-পাকাতে যাওয়াও তো যায় না। তন্নু তো পাশের ঘরে ক্লান্তিতে ঘুমিয়েই পড়েছে। তন্নুর বাবা যে কখন ফিরবে!

ঠিক তখনই প্রতিবেশী মহিলা হাতে একটা বাটিতে সাগু জ্বাল দিয়ে তৈরী করে নিয়ে ঢুকলো।—ও তন্নুর মা! তন্নুর বাবা কি ফিরেছে?

"আইয়ে দিদি! না। এখনও তো ফেরেন নি।' তন্নুর মা জবাব দিল।

"আমি ভাবলাম তুমি তো চুলা ধরাতে পার নি। খোকা কি

খাবে, খোকার বাবাকেই বা কি খেতে দেবে! তা ছাড়া, রুগী আদ্‌মিকেও সাগুটাগু করে দিতে হবে! তা সাগু আমি এক বাটি করেই এনেছি। রুগীকে খাইয়ে দিও।'

'কাকে খাওয়াবো, দিদি! আচার্যজী তো বেহুঁশ হ'য়ে আছেন জ্বরে।' অসহায় স্বরে বলে উঠলো তন্নুর মা।

সাগুর বাটিটা জলচৌকির ওপর রেখে রুগীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন মহিলা। তারপর তন্নুর মাকে বললে, "ঠিক আছে। আমি রুগীর কাছে বসছি। জলপট্টি দিচ্ছি। তুমি যাও! তাড়াতাড়ি চুলা জ্বালিয়ে নিজেদের জন্য যা হোক খানা তৈরী করে নাও! যাও!'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মহিলার দিকে একবার তাকিয়ে তন্নুর মা তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঠিক তখনই মুকুন্দরাম ঘরে ফিরলো। বাঁ বগলে পুঁথিপত্তর আর ডান হাতে মিষ্টির হাঁড়ি। ঘরে ঢুকেই পাশের বাড়ার মহিলাকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেল সে। আগে থেকেই চেনা মহিলা। একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই সে প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছে, বহিন্‌জী!'

বাঁ হাতে ঘোমটা ঈষৎ টেনে দিয়ে মহিলা বললেন, "আসুন, ভাইসাব। আপনার অতিথি, তন্নুবাবার আচার্যজী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেখুন!"

তাড়াতাড়ি পুঁথি-পত্তর আর মিষ্টির হাঁড়ি একপাশে নামিয়ে রেখে

বিছানার কাছে এগিয়ে এলো মুকুন্দরাম। আচার্যজীর দিকে তাকিয়েই বুঝলো বেহুঁশ হ'য়ে আছেন। তার ডান হাতটা নিজের ডান হাতে ধরেই চম্‌কে উঠল মুকুন্দরাম! যেন আগুনে ছ্যাঁকা খেলো! একটু আধটু নাড়ী দেখার অভ্যাস ছিল তার। কিন্তু নাড়ী দেখার আগে হাত ধরেই বুঝলো জ্বর ভীষণ চড়ে গেছে। এক্ষুনি কবিরাজ মশাইয়ের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। তাঁকে নিয়ে এসে দেখানো প্রয়োজন। কাশী—শুধু কাশী কেন, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ, ভিষগাচার্য শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তর্ক সিদ্ধান্ত, এখন সৌভাগ্যবশতঃ কাশীতেই আছেন। যদিও কাশীই তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। তবুও

সারা দেশেই তাঁকে যেতে হয়। চিকিৎসা করতে বা শিক্ষাদান করতে। তিনি সর্বদাই খুব ব্যস্ত থাকেন। তবু তাঁর কাছেই মুকুন্দরাম যাবে ঠিক করলো। মুকুন্দরাম পাণ্ডেও কাশী-নগরীতে অতিশয় সুপরিচিত। যেমন পণ্ডিত সমাজে, তেমনই রসিক গায়ক সমাজে। সেই বাবদে কবিরাজ মহাশয়েরও সে স্নেহের পাত্র। তার অনুরোধ উনি ঠেলতে পারবেন না। তা তিনি যতই কেন না ব্যস্ত থাকুন।

ইতিমধ্যে স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তন্নুর মা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। মুকুন্দরাম আচার্যজীর হাতটা সাবধানে নামিয়ে রেখে মহিলাকে লক্ষ্য করে বলল, বহিন্‌জী! আপনি কষ্ট করে আর একটু থাকুন। তারপর স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ঘাবড়ানে কি কোই বাত নহী। তেজ বুখার হ্যায়! আমি কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে আনছি। এদিকে একটু লক্ষ্য রেখো।" বলেই ত্বরিতপদে চলে গেল মুকুন্দরাম। মুকুন্দরাম বুঝতে পেরেছিলো যে আচার্যজীর শরীরের লক্ষণগুলো মোটেও ভাল নয়।

একে তো সারাদিন এখানে সেখানে ঘোরা। তার ওপর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়া আচার্যজীকে প্রায় ঘাড়ে করেই নিয়ে আসা,—তন্নু বেচারা সতিই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে যে আচার্যজীকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে সমস্ত রাত ধরে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বেচারা তন্নু তা জানতেও পারে নি। ও যে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা জানা সত্ত্বেও তন্নুর মায়ের বা বাবার অবসর ছিল না, হয়নি, এক মুহূর্তও আচার্যজীর বিছানার পাশ থেকে সরে আসার উপায় ছিল না।

কবিরাজ মশাই এসেছিলেন। অনেকক্ষণ থেকে, চিকিৎসা করেছেন, বলা যায় সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। তারপর প্রতি প্রহরের জন্য ওষুধ দিয়ে, বিদায় নিয়েছেন। না। কোন আশা দিতে পারেন নি আচার্যজীর জীবনের। বলে গেছেন—রাতটুকু যদি কেটে যায় তাহলেই অনেক।—

এখন রাত্রির শেষ প্রহরের শেষক্ষণ। ভোর হ'তে আর খুব বেশী

দেরী নেই। ওষুধের শেষ মাত্রা খানিকক্ষণ আগেই খাইয়ে দিয়েছে মুকুন্দরাম। খুবই ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে আচার্যজীর। তাঁর শিয়রের কাছে মুকুন্দরাম আর পায়ের দিকে তন্নুর মা বসে আছে। গরম জলের সেঁক দিয়ে যাচ্ছে সে আচার্যজীর পায়ের নীচে। কবিরাজের নির্দেশ মতই। যদি হয়, অলৌকিক নয়, ঔষধ আর শুশ্রূষার গুনেই যদি আচার্যজী এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেন! স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এই মুহূর্তে একমাত্র কামনা। মুকুন্দরাম আচার্যজীর মুখের দিকে তাকিয়েই বসে আছে।

আচার্যজীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশঃ যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। একটু ঝুঁকে পড়লো মুকুন্দরাম!

তখনই চোখ মেলে তাকালেন আচার্যজী! মুকুন্দরামের চোখ-মুখ আলোকিত হয়ে উঠলো! তন্নুর মা তো উত্তেজনায় উঠেই শিয়রের দিকে এসে বসলো! দুজনেরই মুখে আশার আলোক! এযাত্রা আচার্যজী বোধ হয় সামলে উঠলেন!

আচার্যজী পর্য্যায়ক্রমে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে একটা বিব্রত হাসি যেন খেলা করে গেল! যেন নিজের এই অসুস্থতার জন্য নিজেই লজ্জা পাচ্ছেন! মুকুন্দরাম তখনই জিজ্ঞেস করল ঃ—"কেমন বোধ করছেন, আচার্যজী?"

আচার্যজীর চোখ দুটো ক্ষণেকের জন্য কেঁপে উঠলো! তারপর অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, "তন্নুবাবা?"

তন্নুর মা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ডেকে আনছি ওকে!"

তন্নুর ঘুমও তখন পাত্‌লা হ'য়ে এসেছিলো। ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরী নেই। তন্নুকে কোলে তুলে নিতে যেতেই জেগে উঠলো। "আয় বাবা! তোকে আচার্যজী ডাকছেন!" বলেই তন্নুকে কোলে করে এনেই আচার্যজীর শিয়রের পাশে বসিয়ে দিল। তন্নু ঝুঁকে পড়লো। দেখলো!

আচার্যজীও তাকালেন তন্নুর দিকে। তাঁর রোগ-পাণ্ডুর মুখে অম্লান

হাসি জেগে উঠলো! ডান হাতটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে তন্নুর মাথার ওপর রাখলেন।

তন্নু আচার্যজীর চোখে চোখ রেখেই ওর কোমল স্বরে বলল: "তাউজী! আপ অভী সুস্ত্ হো না?"

হাসিমুখেই মাথাটা একটু ওপর নীচে দোলালেন আচার্যজী। হঁা বেটা!' বলেই চোখ দুটোকে যেন একটু বিশ্রাম দিতেই বন্ধ করলেন।

"তাউজী! আপ নিদ্ যাওগে ফীর্?" তন্নু শান্তস্বরে বলল।

কোনমতে যেন চোখদুটো খুলে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আচার্যজী বলে উঠলেন, "জয় বাবা বিশ্বনাথ!"

পরক্ষণেই তন্নুর মাথার ওপর থেকে তাঁর হাতটা ধপ্ করে বিছানার ওপর পড়ে গেল!

তন্নুর মার কণ্ঠ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এলো: "হায় রাম!"

মুকুন্দরামের দুচোখ থেকে স্বতই অশ্রুধারা বহে যেতে লাগল।

কেবল তন্নু স্তব্ধ বিস্ময়ে, ওর এই নয় বৎসরের জীবনে প্রথমবার, নিষ্ঠুর, অমোঘ মৃত্যুকে অবলোকন করে, বাক্যহারা পুতুলের মতো বসে রইলো! না। ওর কান্না পাচ্ছিলো না। বরং বিহ্বল, যেন বা পরাভূত!

আজও প্রবাহিনী যমুনার নীল জলের দিকে তাকিয়ে স্বতঃই দু-চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা বহে যেতে লাগল রামতন্নুর। যে গীত রচনা সমাপন করতে এখানে, এই যমুনার ধারে এসে ও বসেছিল, যে জায়গাটা ওরই আবিষ্কার এবং প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছে এই কয়েক বৎসরে, যেখানে এসে বসলে ওর মনের মধ্যে কতরকম ভাবতরঙ্গ বহে যায়, সেই স্থানেই মাঝে মধ্যে এইরকম, আজকের মতন, কাশীর স্মৃতি, বিশেষ করে প্রথম কিছুদিনের, যে কটা দিন আচার্য-তাউজী বেঁচেছিলেন, সেই কটা দিনের স্মৃতি ওকে বড় পীড়ন করে! মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সেই বেদনাময় অনুভূতি আজও সমানভাবে কিশোর

রামতনুকে হা-হা-করে যেন তাড়া করে আসে! তাউজীর নিষ্প্রাণ দেহের সামনে বসে ওর মা-বাবাকে অশ্রুবিসর্জন করতে দেখেও বালক তন্নুর চোখে তখন জল ছিল না। কেমন একটা ধরে রাখার আকুলতা একটা অসম্ভাব্যতার সম্মুখীন হয়ে অকস্মাৎ কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেছলো বালক তন্নু!

এমন কি মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটে বসে তাউজীর দেহ আগুনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হ'য়ে যেতে দেখেও ওর চোখে একফোঁটা জল আসেনি। কেমন একটা স্তম্ভিত, নির্বাক অসহায়তা! বুকের ভেতর চাপা একটা কষ্ট! বালক তন্নুর পক্ষে সে কষ্টের অনুভূতি কাউকেই বোঝানো সম্ভব ছিল না। ওর মা-বাবাকেও না। হয়তো ওর মা-বাবাও ওর কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলো। না হলে ঐ টুকু ছেলেকে কখনই শ্মশানঘাটে আসতে দিত না। বারণই করেছিল তন্নুর বাবা। মা-ও। এমন কি প্রতিবেশী যারা আচার্যজীকে কাঁধ দিতে এসেছিলো, তারাও মানা করেছিলো। এতটুকু ছেলের ঐ রকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য না দেখাই ভাল। সবাই মিলে বুঝিয়েছিল তন্নুকে। বলেছিল যে ওর মা তো একা বাড়ীতে থাকবে। মার কাছেই ও থাকুক। শ্মশানঘাটে না যাওয়াই ভাল। সবাই তো ব্যস্ত থাকবে তখন। কিন্তু ন'বছরের তন্নু কারও মানা শোনেনি। জেদ ধরেছিলো। ও যাবেই। তখন আর কেউ ওকে কিছু বলেনি।

তারপর যতক্ষণ চিতাগ্নি তার লকলকে জিভ দিয়ে চেটেপুটে খেলো তাউজীর দেহটাকে, দূরে, এক ধারে বসে, বালক তন্নু অপলক চোখ মেলে তাকিয়েছিল। উত্তরবাহিনী গঙ্গাও বহে যাচ্ছিল আপন মনে!

এরপর থেকেই বালক তন্নুর কাশীতে যেন আর ভাল লাগছিল না। অবশ্য একথা ও মা-বাবাকে বা কাউকেই কখনও বলে নি। তাউজীর অভাবে যে শূণ্যতা বোধ হচ্ছিলো, সময়ের প্রলেপে ক্রমশঃ তা স্বাভাবিক হয়ে এলো। তখন একেকদিন তন্নু আবার একা একাই গঙ্গার ধার ধরে ধরে অনেকদূর চলে যেতো। এমনি যেতে যেতেই একদিন ও আবার সেই হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসলো।

একটা ধাড়ি বাঁদর তার বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু দূরেই বসেছে। বাচ্চাটা পেটের সঙ্গে লেপ্টে দুধ খাচ্ছে। দেখতে লাগল তন্নু। তারপর একসময় মুখ ফিরিয়ে তাকালো প্রবাহিনী গঙ্গার দিকে। আর হঠাৎই ওর দুচোখ উপ্‌চে অশ্রুধারা কপোল ব'য়ে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগল!

সময়ের বোধ থাকার কথা নয় তন্নুর। তবু ওর ঝাপ্‌সা চোখের সামনে প্রতিভাত হলো সন্ধ্যা নেমে আসছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছ্‌লো ও। মুছ্‌তে মুছ্‌তে সেই বাঞ্জারা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। কাশীতে আসার কিছুদিন আগে ওদের গ্রামে, বন্ধুর বাড়ীতে, যার সঙ্গে নেচে নেচে ও গান করেছিলো! গানের সব কথা ওর মনে নেই। কিন্তু সুর এখনও ওর কানে লেগে আছে। তারপর কোথায় যে চলে গেল লোকটা! বাঞ্জারা তো। তাদের থাকার তো কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এ দেশ থেকে ও দেশ ঘুরে বেড়ানোই তাদের কাজ। বাঞ্জারা লোকেরা কত সুখী! যখন খুশী যেখানে খুশী চলে যেতে পারে! বারণ করার কেউ নেই। মা-বাবাও কি নেই? বাঞ্জারাদের কি মা-বাবা কেউই থাকে না? কি জানি! তন্নু নিজের মনে এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না। কেবল এই মুহূর্তে, ওর খুব ইচ্ছে হয়—যদি ও, ওই বাঞ্জারাদের মতো, কাউকে কিছু না বলে, যেদিকে খুশী চলে যেতে পারতো! ভাবতেই মনটা ওর হঠাৎ কি এক অজানা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়! তারপর একসময় নিজের অজ্ঞাতসারেই বাঞ্জারার সেই গানের সুর ওর বুকের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে আপন মনেই ঠিক তেমনি করে নেচে নেচে গেয়ে ওঠে তন্নু! আসন্ন সন্ধ্যার প্রায় জনহীন গঙ্গার ঘাটে তন্নুর কচি গলার গান সামনের ওই অনন্ত প্রবাহিনী গঙ্গার মতই বাতাসের তরঙ্গে ভেসে ভেসে কি জানি কোন্‌ দেবতার পায়ে অর্ঘ্য হয়ে ঝরে পড়তে থাকে!

আপাত নির্জন হরিশ্চন্দ্রঘাটে সেই সময় কয়েকজন ব্যক্তির আগমন ঘটলো। তাদের দেখলেই মনে হয় দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে আসছেন তারা। হয়তো দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিংবা অনেক দেশ পার হয়ে কাশী বিশ্বনাথের দর্শন মানসেই এসেছেন তারা। সে যাই হোক।

তাদের মধ্যে একজনেরই কেবল সন্ন্যাসীদের মতো পোষাক। কেবল পোষাকই নয়। চেহারার মধ্য দিয়েও তার যেন এক দৈবী গাম্ভীর্য অথচ শিশুর মত এক সরল মাধুর্য্য প্রকাশিত হ'চ্ছে। তার দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত ললাট, মুণ্ডিত মস্তক, আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ থেকে যেন কি এক সুদূর প্রজ্ঞার আলোক করুণাধারার মত বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে!

তার কানেই প্রথম সুরের ঢেউ এসে কোমল আঘাতে রনন্ তুললো। তিনি ঈষৎ সচকিত হয়ে তাকালেন! কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। অথচ এমন সুর, এমন উদাস করা যাযাবরদের গানের সুর, মনে হচ্ছে যেন খুবই একটা কচি গলা থেকেই আসছে। দক্ষিণায়নে অস্তাচলের সূর্য যেন চন্দ্রকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন আপাতত কিছুদিন সে আর জোৎস্না বিকীরণ করবে না, পৃথিবীতে বিরাজ করবে কেবলই আঁধার—এমনই বিষাদমাখা সেই গানের সুর! অথচ গাইছে ন'দশ বছরের নেহাৎই কোন কচি বালক, তাতে কোন সন্দেহ নেই!

"নারায়ণ!" একজন সঙ্গীর নাম ধরে ডাকলেন তিনি।

"গুরুদেব!" একটু দূরে ছিল নারায়ণ নামে ব্যক্তি। কিন্তু ডাক শুনতে পেয়েই সারা দিয়ে কাছে এল। "আদেশ করুন, গুরুদেব!"

"গান শুনতে পাচ্ছো, কচি গলার?"

এতক্ষণ খেয়াল করে নি নারায়ণ। এবার গুরুদেবের কথায় কান পাতলো—"হ্যাঁ, গুরুদেব! শুনতে পাচ্ছি!"

"যাও তো! ছেলেটাকে খুঁজে নিয়ে এসো!"

"এখনই আনছি, প্রভু!" নারায়ণ চলে গেল শব্দ অনুসরণ করে। একটু পরেই হাত ধরে নিয়ে এল তন্নুকে। একেবারে গুরুদেবের কাছে! "এই সেই ছেলে, গুরুদেব! আপন মনে নেচে নেচে গান গাইছিল।"

সন্ন্যাসী গুরুদেব বালক তন্নুর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন! অত্যন্ত রূপবান বালক! কেবল রূপই নয়। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন— কি এক আশ্চর্য্য ঐশী দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে! খুবই প্রতিভাবান বালক এক পলক দেখেই বুঝে নিতে কোনও অসুবিধা হলো না সন্ন্যাসীর!

তিনি এগিয়ে গিয়ে বালক তন্নুর থুতনীর নীচে হাত দিয়ে পরম আদরে প্রশ্ন করলেন ঃ "তোমার নাম কি, বাবা ?"

তন্নু মুখ তুলে তাকালো। দেখলো সন্ন্যাসীকে। তারপর মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, "শ্রী রামতনু পাণ্ডে।"

'রামতনু! বাহ্! যথার্থ নামকরণ!' সন্ন্যাসী নিজের মনেই বলে উঠলেন। তারপর প্রশ্ন করে করে তন্নুর বাবার নাম, তার জীবিকা, আগে কোথায় ছিল, এখন কোথায় আছে, এখানে, এই কাশী নগরীতেই বা কবে এসেছে, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য সবই একে একে জেনে নিলেন। বালক তন্নুর সঙ্গে যতই কথা বলছিলেন, ততই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছিলেন সন্ন্যাসী! অবশেষে তিনি বালক তন্নুকে বললেন, "সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। চল! তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি! নিয়ে যাবে তোমার বাবার কাছে আমাকে ?'

তন্নু অত্যন্তই খুশী হয়ে বলল ঃ তবে এখনই চলুন! অন্ধকার হয়ে গেলে, মা হয়তো আবার খুঁজতে বেরোবেন। বাবা অবশ্য এখনও কথকতায় ব্যস্ত আছেন। বাড়ীর কাছেই। দশাশ্বমেধ ঘাটে!"

তন্নু পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সন্ন্যাসী ও তার কয়েকজন সঙ্গীকে।........

....মন বড়ই অস্থির। হঠাৎ সব কিছুই যেন কেমন বাহুল্য মনে হচ্ছে। কোন ভাবেই, কোন কিছুতেই নিজেকে আর যেন নিবদ্ধ রাখতে পারছে না রামতনু। চঞ্চল মনে কোনও চিন্তাই সঠিক, স্ব-রূপে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। অথচ বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা, মোচড়ানো যন্ত্রণা, ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে! উপশমের কোনও উপায় যেন খুঁজে পাচ্ছে না! কেমন দিশাহারা হয়ে পড়ছে রামতনু!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রামতনু। নাহ্! এখন, এই মুহূর্তে গানের শেষ কথাগুলো আর কিছুতেই মাথার মধ্যে আসবে না। যমুনাজীর পাড়ে, ওর প্রিয় বসার জায়গাটি ছেড়ে বাঁ দিকের পার্ ধরে হাঁটতে

লাগল। মাথার মধ্যে কত রকমের চিন্তা যে জাগছে। আবার নির্দিষ্ট রূপ ধরার আগেই মিলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওর কেবলই অনুভব হচ্ছে কেমন যেন অজানা আনন্দের এক ধারা প্রস্রবণ ওর আশ পাশ দিয়েই বহে যাচ্ছে! ওকে যেন আহ্বানও জানাচ্ছে তাতে ডুব দিয়ে সেই আনন্দের স্বাদ নিতে! কিন্তু কিছুতেই ও যেন পথ—সেই পথটুকু চিনে নিতে পারছে না! কি এক অজানা, অনাস্বাদিত অনুভূতি ওকে থেকে থেকে বিমনা, কেমন উতলা করে তুলছে যে ও একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে! কোন কার্য কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যাবে কি করবে কিছুই যেন স্থির করে উঠতে পারছে না। আবার ভাবে, গুরুদেবকে ছেড়ে, এই বৃন্দাবন-ভূমি, এই যমুনাজীর শীতল ক্রোড় উপেক্ষা করে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আর যে কাজ ও করছে, এই সঙ্গীতের মহাসাধনা—এর চেয়ে বড় কাজ কি আর কিছু হয়? তবে?

তবুও থেকে থেকে এত উন্মনা হয়ে পড়ে! মনে হয় কোথাও—অনেক অ-নে-ক দূরে কোথাও চলে গেলে হয় তো মনের এই অস্থিরতা কমবে। শান্ত হ'য়ে আসবে বুকের ভেতরকার উত্তাল ঝড়! কিন্তু গুরুদেবকে ছেড়ে যাবে এ ভাবনাটাও মনের ত্রি-সীমানায় আসতে দেয় না রামতনু! কাশীর সেই সন্ধ্যেবেলার কথা এখনও ওর স্পষ্ট মনে আছে।

....ওর মা তো একসঙ্গে এতজন সাধু আর তনুকে আসতে দেখে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল! পরক্ষণেই পণ্ডিত হরিদাস স্বামীজির সৌম্য শান্ত, সাধক ও সিদ্ধজনোচিত গৌরকান্তির দিকে দৃষ্টি পড়তেই তনুর মায়ের মনের মধ্যে এক প্রশান্ত ভাব নেমে এলো! কেমন মনে হলো তার যেন সে দেখতে পেলো স্বয়ং দেবর্ষি একতারায় সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলে তার বুকের ধন তনুকে কোলে নিয়ে চিরশান্ত স্বর্গীয়ভূমি থেকে নেমে এলেন! সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো রামতনুর মায়ের!........

এর পরের সামান্য কিছু সময় তো একান্তভাবে স্বামী-স্ত্রী- অর্থ্যাৎ, তনুর মা আর বাবার মধ্যে নিভৃতে আলোচনা। পণ্ডিত হরিদাস

স্বামীজির হাতে তাদের বুকের ধন তন্নুকে ছেড়ে দেওয়া কতখানি সমীচিন হবে? যদিও স্বামীজি অতিশয় সুপরিচিত, খ্যাতিমান এবং সজ্জন ব্যাক্তি। তবুও তাঁর একান্ত জীবনচর্যা সম্পর্কে মুকুন্দরাম তো কিছুই জানে না। বুঝি তার মনের এই প্রশ্নটারই ছায়া মুখভাবে ফুটে উঠেছিল! স্বামীজি তা বুঝতে পেরেই আশ্বস্ত করেছিলেন মুকুন্দরামকে।

স্বামীজিকে এগিয়ে এসে প্রণাম করে তন্নুর মা। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের সকলকে যথাযথ সেবা করে বসবার আসন দেবার সম.ও মুকুন্দরাম কাজ সেরে ঘরে ফেরে নি। তাই তন্নুর মা স্বামীজিকে একটুক্ষণ জিরিয়ে নিতে বলে ভেতর বাড়ীতে চলে গেছলো কিঞ্চিৎ ফল মূল আহারের বন্দোবস্ত করতে। সেই সময়ই মুকুন্দরাম ঘরে এলেন। স্বামীজির সঙ্গে মুকুন্দরামের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কিন্তু বারদুয়েক স্বামীজির দেবদত্ত কণ্ঠস্বরের স্বর্গীয় সঙ্গীত শোনবার মহাসুযোগ ঘটেছিল মুকুন্দরামের। এমন সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কাশীতে থেকেও বৃন্দাবন দর্শনের অবকাশ প্রথম কয়েক বৎসর করে উঠতে পারে নি মুকুন্দরাম। সঙ্গীতের সূত্রেই কাশীর বিখ্যাত মালব্য পরিবারে তার যাতায়াত ছিল সেখানেই বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামীজি এসেছিলেন। গানও গেয়েছিলেন। সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত সুধার আস্বাদ মুকুন্দরামের জীবনে এক পরম অভিজ্ঞতা! তারও কয়েক বৎসর পর বৃন্দাবন ভ্রমণের সময় স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত 'বাঁকে-বিহারী' মন্দির চত্বরে ভক্তজন সমাবেশের এক ধারে বসে মুকুন্দরাম শুনেছিল স্বামীজির কণ্ঠের ভজন-কীর্তন! সে কথা মনে পড়ে এখনও তার প্রাণে আনন্দের জোয়ার বহে গেল!

সহর্ষে এগিয়ে এসে মুকুন্দরাম স্বামীজিকে প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করলো। অনুরুদ্ধ হবার পূর্বেই নিজের বিনীত পরিচয় দিল। তারপর এখানে তাঁর অগমন কি ভাবে ঘটলো, কারণই বা কি মুকুন্দরামের মতো দীন, অভাজনের গৃহে আগমনের—জানতে চাইল সে স্বামীজির কাছে!

স্বামীজি সহাস্যে বললেন ঃ পাঁড়েজি ! তন্নু বাবা তো আপনারই সন্তান ! যার ঘরে এমন সিদ্ধজনোচিত লক্ষণযুক্ত সন্তানের জন্ম হয়েছে তাকে আমি কখনই দীন, অভাজন বলে স্বীকার করি না !"

মুকুন্দরাম অবাক হয়ে স্বামীজির মুখের দিকে তাকালো !

হ্যাঁ।" স্বামীজি বলতে লাগলেন, বিস্মিত হবেন না, পাঁড়েজী। তন্নু আপনার সাধারণ ছেলে নয় ! এই পুণ্য ভারতভূমিতে বিশাল কর্মকাণ্ডের ধারক হয়ে আপনার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছে এক মহান মানব সন্তান। পিতা হিসাবে আপনার এবং গর্ভধারিনী রূপে আপনার স্ত্রীর মত ভাগ্যবন্ত নরনারী খুব কমই আছে এই পৃথিবীতে। এই মুহূর্তে অবশ্য আমি নিজেকেও পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি ! তন্নু-বাবার সঙ্গে হরিশচন্দ্র ঘাটে এই আশ্চর্য যোগাযোগ—বিধাতা পুরুষের পরম করুণা বলে মনে করছি !" এ পর্যান্ত বলে তখনও বিস্ময় বিমুগ্ধ-ভাবে তাকিয়ে থাকা মুকুন্দরামের চোখে চোখ রাখলেন। বললেন ঃ' মুকুন্দরামজী ! আপনার এই বালক পুত্রের মধ্যে এক আশ্চর্য সঙ্গীত সম্ভাবনা বর্তমান দেখছি ! আমার দৃঢ় প্রত্যয়, ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারলে আপনার এই পুত্র একদিন ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতের অন্যতম পুরোধা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষার সেই ভিত্তিটুকু আমি নিশ্চিতরূপেই গড়ে দিতে পারবো। এবং সে জন্যই আপনার পুত্রটিকে আমি বৃন্দাবনে, আমার আশ্রমে নিয়ে যেতে চাই ! আমি ধনী ব্যক্তি তো অবশ্যই নই ; অনাড়ম্বর জীবন যাপন করি। তবে, আমার কোন অভাব নেই। আপনার পুত্রেরও কোনও অভাব থাকবে না আমার আশ্রমে। এবং কেবল সঙ্গীত শিক্ষাই তো নয়; সেই সঙ্গে সংযুক্ত শাস্ত্রাদিপাঠ এবং সাংসারিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধেও যাতে নিশ্চিত বোধ এবং বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সেজন্যে যতটুকু বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন; আপনাদের পাঠশালার শিক্ষাক্রম অনুসারী অবশ্যই নয়, সেই প্রয়োজনের সবটুকুই অতি সহজেই আমি পুরণ করতে পারব বলে মনে করি। আশা করি, আমার কথা আমি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছি ! এখন আপনারা, পুত্রের জনক-জননী, আপনারা

স্থির করুন। আপনাদের সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করুন। স্বামীজি হরিদাস পরম বৈষ্ণবোচিত, অবিকৃত মুখে তন্নুর বাবা-মায়ের দিকে তাকালেন।

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার কিছুই বিশেষ ছিল না। তবু নিভৃত আলোচনার সময় তন্নুর মা—একমাত্র পুত্রকে কাছ ছাড়া করতে হবে বলে অশ্রুসজল চোখ দুটি তুলে স্বামীর দিকে তাকালো!

একমাত্র স্নেহের ধনকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে পিতা হিসাবে মুকুন্দরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিলো। কিন্তু সঙ্গীতের সামান্য একজন সমঝদার হিসাবে এটাও বেশ স্পষ্ট করেই সে বুঝতে পারছিলো যে স্বয়ং সঙ্গীত স্রষ্টা দেবাদিদেবই আজ পণ্ডিত হরিদাস স্বামীজির কায়া ধরে তার দীন কুটিরে প্রার্থীর বেশে আগমন করেছেন! তাঁকে রিক্তহাতে ফিরিয়ে দিলে, তন্নুকে এই পরম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে, পিতামাতার দিক থেকে তারা ধর্মচ্যুত হবে, এবং তাদের সমস্ত স্নেহ-ই ব্যর্থ হয়ে যাবে! আপন সন্তানের এতবড় সর্বনাশ করা কোন মতেই উচিত নয়। সে কথাই স্ত্রীকে বোঝালো মুকুন্দরাম। তন্নুর মা-ও অবশেষে স্বামীর যুক্তি মেনে নিলো। তবুও প্রশ্ন ছিল মনে মুকুন্দরামের। কেমন কাটবে আশ্রমের জীবনে! তন্নুর মত বালকের? তা সে প্রশ্নেরও উত্তর ভালভাবেই দিলেন আচার্য হরিদাস স্বামীজি। তখন মুকুন্দরাম সে কথারই পুনরুক্তি করলো আচার্যের সামনে, যে কথা সে স্ত্রীকে—তন্নুর মা-কেও বলেছিলো। জোড়হাতে বিনীত স্বরে মুকুন্দরাম বলল: স্বামীজি! আমাদের স্নেহের ধনকে কেবল স্নেহের বশেই বেঁধে রেখে তার চরমতম ক্ষতি করতে চাই না। আজ থেকে আপনিই তন্নুর মাতা এবং পিতা। আমাদের বহুসাধ্য-সাধনা করে পাওয়া একমাত্র পুত্রধনকে তুলে দিলাম আপনারই হাতে! আপনি যেভাবে ভাল বুঝবেন, সে ভাবেই ওকে গড়ে তুলবেন! আমরা কেবল পথ চেয়ে থাকবো। উপযুক্ত হয়ে ও যেন এই সংসারের উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করে। আর নিজের মা-বাবার কোলে বার বার ফিরে ফিরে আসে! বলতে বলতে গলা ধরে এলো মুকুন্দরামের। দু'চোখের কোল

বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। তন্নুর মায়ের চোখ থেকেও অশ্রুবন্যা বহে যেতে লাগল। কেবল অবগুণ্ঠনের আড়াল বলেই তত প্রকট হলো না। কিন্তু শরীরের কম্পন সহজেই দুঃখের প্রকাশ ঘটালো!

সবই লক্ষ্য করলেন আচার্য হরিদাস স্বামীজি। তাঁর সংবেদনশীল মন সহজেই পিতা-মাতার মনোকষ্ট অনুধাবণ করতে পারলো। এবং মুকুন্দরামের কথার নিহিতার্থও সহজেই হৃদয়ঙ্গম হলো স্বামীজির। তিনি নিশ্চিত স্বরে বললেন, "অবশ্যই আপনাদের তন্নু বাবা উপযুক্ত হয়ে সংসারে ফিরে যাবে। কারণ, সংসারই তো হবে ওর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র। আশ্রম জীবন তো সকলের জন্য নয়। আপনাদের তন্নুর জন্যও নয়। তবে পথের—উপযুক্ত পথের দিশা পাবার জন্য সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বার বার ওকে আশ্রমে ফিরে আসতে হবে। হবেই। কারণ, তন্নু বাবা মূলতঃ ধার্মিক। সংসারে থেকেই, সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই, ধর্মসাধনের পথে ওকে যেতে হবে।"

বাগানের পথে ফিরে আসতে আসতেই রামতন্নু ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলো। 'বাঁকে বিহারী' মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির সময় হয়েছে। গুরুদেব প্রতি সন্ধ্যায় নিজে আরতি করেন "বাঁকেবিহারী শ্রীকৃষ্ণের। গুরুদেবের নিজের প্রতিষ্ঠিত এই অপূর্ব মণিময় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি! আদর-করে বাঁকে বিহারী' নামে ডাকেন গুরুদেব। বাঁকে বিহারীর গুণকীর্তনে গুরুদেবের গলায় সঙ্গীত মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এই একটি সময়, যখন কিছুতেই অন্য কোথাও থাকার কথা চিন্তাও করে না রামতন্নু। যেদিন, সেই দশ বছর বয়সে গুরুদেবের সঙ্গে এই আশ্রমের পূণ্য ভূমিতে এসে পৌঁছেছিল, সে দিন থেকেই আরও দশ বছর পার হ'য়ে এলো প্রায়, এখানে, ঠিক এই সময় উপস্থিতিতে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি রামতন্নুর। আজ সামান্যক্ষণ দেরী হ'য়ে গেল। অন্যান্যদিন এই সময় পূজার সরঞ্জাম ইত্যাদি সাজাতে নারায়ণ ভাইকে টুকটাক্ সাহায্য করে ও।

আজ কি জানি কেন নানান চিন্তায় এত মগ্ন হয়ে পড়েছিলো যে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে নি। অথচ, গুরুদেব প্রতিটি কাজ ঠিক ঠিক সময়ে, সনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করার ওপর সমধিক গুরুত্ব দেন। মানুষ অনন্ত আয়ু নিয়ে এই ধরাধামে আসে নি। যতটুকু বা আয়ু নিয়ে এসেছে, তার মধ্যেও কর্মক্ষম থাকার সময়সীমা অতিশয় সীমিত। ওই সীমিত কর্মক্ষমতার মধ্যেই মানুষের কর্মোদ্যোগ সফল করে তুলতে হয়। কোন মানুষ, যদি সে সত্য সত্যই কর্মদ্যোগী হয়, অথচ সময়ের প্রতি সনিষ্ঠ না থাকে, তবে এই সংসারের শতদিক থেকে শত রকমের বাধা-বিঘ্ন এসে তার কর্মোদ্যোগকে অসফল করে তোলে। মানুষ তখন দিশাহারা তরণীর মতো অকূলে ভেসে যায়। দশ বছরের বালক তনু এই আশ্রমে এসেই গুরুদেবের নির্দেশের তাৎপর্য সম্যগভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলো। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করে যোগ-ব্যায়াম। তারপর কণ্ঠস্বর চর্চা। বিদ্যাভ্যাস। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ। তারপর বিভিন্ন শাস্ত্রাদির আলোচনা। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর সামান্য সময়ের বিশ্রাম। অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গন পরিষ্কার করা, বাগানের পরিচর্যা করা। তারপর সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নিখাদ অবসর। সন্ধ্যায় বাঁকে-বিহারীর পূজার অন্তেই ভক্ত সমাবেশের সামনে গুরুদেবের সঙ্গীত আরাধনা তারপর ভক্তজন বিদায় নিলে স্বয়ং গুরুদেবের কাছ থেকে সঙ্গীতের পাঠগ্রহণ! রাত্রে আহারাদির পর পুস্তক পাঠ! এবং নিদ্রা। এই নিয়মেই গত দশ বৎসর অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তনু—রামতনু। এখন ও বিংশতি বর্ষীয় যুবক। এই অভ্যস্ততার মধ্য দিয়ে এসেও কিছুদিন যাবৎ, থেকে থেকে কেন যে রামতনু বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতা—নামগোত্রহীন একটা নীরব যন্ত্রণা অনুভব করে—সে রহস্য ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেও কুল কিনারা পায় না রামতনু। একেকবার মনে হয়, মা বাবাকে অনেকদিন দেখে নি। তারা অবশ্য ভালই আছেন। নিয়মিত পত্রাদি আসে। ও নিজেও লেখে। তবুও কাশীধামের স্মৃতি ওকে মাঝে মাঝেই বড় উন্মনা করে তোলে আজকাল। মনে মনে

ভাবে অবকাশ পেলে আজই একবার গুরুদেবের কাছে প্রস্তাব রাখবে। তিনি নিশ্চয় বুঝবেন!

দ্রুত পা চালালো রামতনু মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

পূজার্চনা অন্তে গুরুদেবের স্বকণ্ঠের ভক্তিসঙ্গীত শ্রবণকরে তৃপ্ত ভক্তবৃন্দ একে একে বিদায় নিলে গুরুদেব ডাকলেনঃ 'রামতনু! একবার এদিকে এসো!'

রামতনু এগিয়ে গিয়ে গুরুদেবের সামনে বসলো। তাকালো গুরুদেবের মুখের দিকে!

কোন রকম ভূমিকা না করেই স্নেহের রামতনুকে গুরুদেব বললেন, "শোন, রামতনু! কাশীধাম থেকে পত্র এসেছে। তোমার পিতাঠাকুর সামান্য অসুস্থ হয়েছেন। না, না, অযথা উতলা হয়ো না। তিনি তোমাকে কদিনের জন্য একবার ঘুরে আসতে বলেছেন। তোমার মাতা ঠাকুরাণীও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তা তুমি তো এখানে দশ-বৎসরের বালক রূপে এসেছিলো। এখন তুমি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছো। এতগুলি বৎসর তোমাকে কেন যে আমি কোথাও যেতে দিই নাই, তার প্রকৃষ্ট কারণ অবশ্যই তুমি জ্ঞাত আছো?

সবিনয়ে এবং সশ্রদ্ধস্বরে রামতনু উত্তর দিল, "হ্যাঁ, গুরুদেব!"

"তা আমি জানি বৎস! গতানুগতিক জীবনধারা যে তোমার জন্য নয়, তা আমি তোমাকে দেখা মাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি আমার শ্রেষ্ঠতম স্নেহাস্পদ, আমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তোমার মধ্য দিয়েই আমিও চিরদিন স্মরিত হবো। সে জন্যই এত কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে তোমাকে গড়ে তুলেছি। প্রতিভা অনেক সময়েই নিয়মানু-বর্তিতার অভাবে বিপথগামী হয়। অন্তিমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, নষ্ট হয়ে যায়! বুদ্ধিহীনতার ফলে বিপথে চলে গিয়ে জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় করে। তারপর যখন, কোন কোন ক্ষেত্রে, বোধ জাগ্রত হয়, তখন আর সময় থাকে না নিজেকে ফিরে প্রস্তুত করবার। তখন হতাশায়, অনাদরে, অবহেলায় সেই সব প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে। আশা করি, আমার এই কথার যথাযথ তাৎপর্য তুমি অনুধাবন করতে

পারছো ? উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কোনও অবস্থাতেই লক্ষ্যচ্যুত হয়ো না ! এখন যাও ! প্রস্তুত হও। আমি শকটের বন্দোবস্ত করেছি। কাল প্রাতঃকালেই তুমি কাশী ধামের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও ! পৌঁছ সংবাদ এবং অন্যান্য সংবাদাদি অবশ্যই আমাকে জ্ঞাত করতে ভুলো না ! যাও ! বাঁকে বিহারী তোমার মঙ্গল করবেন।"

* * *

পৌঁছবার পর থেকেই ওর মনটা ছটফট করছিলো। একটু গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াবে। গত দশ বছরে কেমন কতটা পরিবর্তন হয়েছে, না আগের মতই রয়ে গেছে সব। অবশ্য হুবহু একই রকম থাকতেই পারে না সব। এটা সহজেই বুঝতে পারে ও। তারপর আশ মিটিয়ে স্নান করবে। দশবছর আগে যখন ও ছোট ছিল, স্নান করতে নামলেই শুশুকগুলো বড্ড ভয় দেখাতো। একেবারে ওর মুখের সামনে ভুস্ করে উঠেই জল ছিটিয়ে, ধাক্কা মেরে চলে যেতো। আর দশ বছরের তনু আই-মাই করে তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে পড়তো। তখন মস্তবড় পাতা দিয়ে তৈরী ছাতাটার নীচে বসে থাকে যে বুড়ো মিশিরজী, স্নানার্থীদের তেল জোগায়, কাপড়-চোপড় জমা রাখে, বিনিময়ে এক আধটা পয়সা পায়, সেই মিশিরজী, ঠা ঠা করে হেসে উঠতো আর বলতো, 'আরে, আরে, তুই ভয় পেয়ে গেলি কেন ? তুইও ওদের দিকে জল ছুঁড়ে দে ! দেখবি ওরাও পালাবে। তুই বড্ড ডরপোক আছিস্ !' বলেই আবার ঠা ঠা হাসি !

"দুধটুকু খেয়ে নে। কি অত ভাবছিস্ ?" মায়ের কথায় চমকে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসে তনু। মা কাছে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, "তোর অত চিন্তা করার কিছু নেই ! তোর বাবার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছিলো। কবিরাজ মশাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে আসল কারণ—তোর বাবা তোকে দেখতে চাইছিলো। অনেকদিন তোকে দেখে নি !"

তনু হেসে ফেলল। 'ও, বাবা আমাকে দেখতে চাইছিলো ! তুমি তাহলে আমাকে দেখতে চাও নি মা ?"

"হায়রে মেয়া! আমি কি তাই বললাম না কি?' তন্নুর মা বিস্ময় মেশানো হালকা স্বরে বলে ওঠে," নিজের লাড্‌লা-বেটাকে কোন্ মা না দেখতে চায়? তবে তোর বাবার ইচ্ছেটাই বেশী-হয়েছিল। হঠাৎ বিমার (অসুখ) পড়ে গিয়ে খুব দুর্বল হ'য়ে গেছে। শরীরটাও হঠাৎ কেমন ভেঙ্গে গেছে দেখ্‌ছিস্ না?"

তা ঠিক। তন্নু মনে মনে মায়ের কথায় সায় দিল। গতকাল সমস্ত দিনরাত অশ্ব-শকটে এতটা পাড়ি দিয়ে আজ সকালেই এসে কাশীতে পৌঁছেচে। এবং পৌছেই প্রথমে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সত্যিই। বাবার অমন সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্য, একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বাবার শরীর যে এতটাই খারাপ হয়ে গেছে, ও তা কল্পনাও করে নি। অবশ্য মা-ও আগের মা নেই। সেইরকম, দেবী দুর্গামাতার মত সেইরকম শ্রী, মহিমা, আর নেই। তন্নু তাই মা-কে একটু রাগিয়ে দেবার জন্য বলল: মা! তুমিও কিন্তু আমার দুর্গামায়ীর মত সেই মা আর নেই! তোমার শরীর এত খারাপ লাগছে কেন?

'না, না, আমার শরীর কিছু খারাপ হয় নি। তুই অনেক বছর পরে তো দেখছিস্! তাই!—নে, এখন দুধটুকু খেয়ে নে। খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর! আমি রসুই ঘরে যাচ্ছি! তোর জন্যে একটু ভালমন্দ রাঁধতে হবে না?

"তা রাঁধো!" তন্নু বলল, আমিও একটু ঘুরে আসি। এতদিন পর এলাম। একটু দশাশ্বমেধ, চৌষট্টিঘাট হয়ে আসি। একেবারে গঙ্গায় স্নান করেই আসবো।"

'তবে তাই যা! তাড়াতাড়ি আসিস্!' মা চলে গেল। তন্নুও বেরুলো।

না। ও যেমন ভেবেছিল কত পরিবর্তনই না দেখবে। না। তেমন কিছু পাল্টেছে বলে ওর মনে হলো না। কাশীর গঙ্গার ঘাট সেই তেমনই আছে। দশ বছর আগে, সেই বালক বয়সে যেমন দেখেছিল, তেমনই। মনে মনে কিছুটা যেন স্বস্তি পেলো কুড়ি বছরের যুবক রামতনু। তাহলে ও নিজেও পাল্টে যায় নি। কেবল বয়সটাই যা

বেড়ে গেছে। আসলে আছে ও সেই ছোট্ট, দশ বছরের তন্নুটি হয়েই! তাই কি! ও নিজের মনেই হেসে ফেলল। তারপর গঙ্গার পার ধরে বাঁ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে কি একটা পাখী ডেকে উঠলো! চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালো তন্নু! আরে! সেই পিটুলী গাছটা এখনও আছে! চৌষট্টি ঘাটের বড় বাড়ীটার নীচে, পাঁচিলের গা ঘেঁষে গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে! সেই গাছটাই তো? না কি বীজ থেকে নতুন গাছ হয়েছে? কি জানি! গাছটা আছে এখনও। ডালপাতা নিয়ে বেশ তাজা! তারই একটা ডালে পাখীটা বসে আছে। অদ্ভুত মিষ্টি স্বরে শিষ দিচ্ছে পাখীটা কি পাখী ওটা? আরও ভাল করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল তন্নু। একটা নয়তো। দুটো পাখী! শিষ দিচ্ছে অবশ্য একটাই। অন্যটা ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে। একেকবার মুখ তুলে সঙ্গীর দিকে তাকাচ্ছে।

পাখী দুটোর আকার এক রকম হলেও গায়ের রঙে, ডানা দুটোর রঙে সামান্য তফাৎ আছে। অথচ, ঠোঁট দুটো, চোখ দুটো একই রকম। যেটা শিষ দিচ্ছে—শিটিট্…শিটিট্…শিটিট্…সাটিট্…সাটিট্—টিট্…, থেমে থেমে ছোট ছোট করে শিষ দিচ্ছে—সেটার ঠোঁট, মাথা, গলা, পিঠের ওপর দিককার অর্ধেকটা ঝক্‌ঝকে কালো রঙের; শরীরের নীচের অংশ তেমনি ঝক্‌ঝকে লাল রঙের। ডানা দুটোর কালো রঙের ওপর দিয়ে লাল রঙের একটা পট্টি যেন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যটার আবার ধানের মত ঈষৎ হল্‌দেটে-সোনালীর নীচে ধোঁয়া রঙ মিশেছে! আচার্য-তাউজী চিনিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, লাল কালোটা পুরুষ আর হল্‌দে-সোনালী-ধোঁয়া রঙেরটা মেয়ে পাখী সহজেই চিনতে পারলো তন্নু। কিন্তু নাম কি যেন পাখীটার? নামটাও তো আচার্য-তাউজী বলেছিলেন! ঠিক। মনে পড়েছে! সহেলী! না? ছোটি সহেলী! হ্যাঁ, ছোটি সহেলী, ছোট্ট সখী! কিন্তু ছোটি সহেলী পাখীরা তো ঝুণ্ড্ (দল) বেঁধে থাকে! তবে এই দুটো হঠাৎ দলছুট হয়ে কোত্থেকে এলো? পরক্ষণেই কি মনে পড়তে লজ্জিত হয়ে পড়লো কুড়ি বছরের যুবক রামতন্নু! ওদের বোধ হয় বাসা বাঁধার সময় এখন! তাই জোড়ে এসেছে! হঠাৎ বুকের

ভেতরটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গেল রামতনুর! দ্রুত পায়ে ঘাটের আরও নীচে, জলের দিকে এগিয়ে গেল ও। কেন যে মাঝে মাঝে আজকাল এমন শূন্য হ'য়ে যায় বুকের ভেতরটা কে জানে!

ধুতী পিরান ছেড়ে পারে রেখে গাত্রমার্জনী পরে তাড়াতাড়ি জলে নেমে গেল রামতনু। সাঁতার কাটলো কিছুক্ষণ। স্নান করল প্রাণ-ভরে। শরীর, মনের সব ক্লান্তি, গ্লানি কেটে গেল। তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে উঠে পড়ল ও। বাবার কাছে গিয়ে বসতে হবে। কি কথা যেন উনি বলতে চাইছেন। উনিই বললেন স্নান খাওয়া সেরে তারপর দেখা করতে। কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। বাবার শরীরের অবস্থা কেমন জানতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই বাড়ী পৌঁছে গেল ও। ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল দিন। আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটাও নেই। বেলা দ্বিপ্রহর। ওকে খাইয়ে দাইয়ে মা স্নান খাওয়া সেরে নিতে গেল। ইতিমধ্যে বাবার গা-হাত-পা উষ্ণ জলে মুছিয়ে সামান্য তরল আহার করিয়ে দিয়েছে মা। বাবা ঘুমোচ্ছে।

রামতনু সঙ্গে করে আনা ঝুলি থেকে আচার্য নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ' পুঁথিখানি বার করে নিল। তারপর নিঃশব্দে এসে বাবার শিয়রের কাছে বসলো। মাঝে মা এসে একবার দেখে গেল। একেবারে তন্ময় হ'য়ে পুঁথি পাঠে নিমগ্ন দেখে পুত্র তনুকে আর ডাকল না। উনিও ঘুমোচ্ছেন। কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েই পাশের ঘরে মা বিশ্রাম নিতে গেল। পুত্র তনু এসে পড়াতে মায়ের মন আশ্বস্ত হয়েছে। একটু প্রফুল্লভাবও এসেছে!

একমনে পড়ে যাচ্ছে রামতনু। এখন ও নৃত্য-অধ্যায়ে এসে পড়েছে। যেখানে নন্দিকেশ্বর আদর্শ নর্তকীর রূপ বর্ণনা করছেন: অতিশয় সুন্দরী, যুবতী, উরজ যুগল সুডৌল, আত্মপ্রত্যয়ী, মোহময়ী, প্রেমময়ী, নৃত্যের জটিল ছন্দ-প্রকরণে অনায়াস দক্ষতা, রঙ্গমঞ্চে অবাধে সঞ্চারিণী, হস্ত-পদ সঞ্চালনে নিপুনা, অঙ্গ ভঙ্গীতে মুগ্ধকারিনী আকর্ণবিস্তৃত অক্ষিযুগল, গীত, বাদ্য, তাল অনুসরণে পারঙ্গম, মণিমুক্তার

অলঙ্কারে বিভূষিতা, পদ্মাননা, খুব একটা হৃষ্ট পুষ্ট নয় আবার খুব একটা রোগাকৃতিও নয়, অধিক দীর্ঘ উচ্চতা যেমন নয়, তেমনি খাটোও নয়, মোটকথা, রঞ্জিনী, প্রীতিদায়িনী !........

হঠাৎ পিতার কাতরোক্তিতে মনোযোগ ছিন্ন হয়ে গেল রামতনুর। চম্‌কে উঠে তাকালো। পুঁথি একপাশে রেখে ঝুঁকে পড়লো পিতার মুখের ওপর। "কি কষ্ট হচ্ছে, বাবা ?" ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল রামতনু।

পিতার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ঃ "কোন কষ্ট নেই বাবা তন্নু! তুমি এসে পড়েছো, তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি, আমার সব কষ্ট দূর হ'য়ে গেছে, বাবা তন্নু!" একসঙ্গে কথাগুলো বলে যেন একটু হাঁফ ধরে গেল তাঁর।

তন্নু অবাক হলো! বাবা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে! বেশী কথা বলো না, বাবা! তোমার কষ্ট হচ্ছে!" মনে মনে বলল-কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এত দুর্বল হয়ে গেলো কেন বাবা! এমন কি বৃদ্ধ বয়স বাবার!

মুকুন্দরাম কিন্তু পুত্রের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। সেই ছোট্ট তন্নু! এখন পূর্ণ যুবক! ঈশ্বরের অশেষ কৃপা আর কৃপা সেই ফকিরের যাঁর আশীর্বাদে এই পুত্র! এমন রূপবান এবং আচার্য হরিদাস স্বামীজির বচন যদি সত্য হয়, তবে এমন গুণবাণ পুত্র তার ঘরে এসেছে! মুকুন্দরাম থেমে থেমে গত দশ বৎসরে বৃন্দাবনের আশ্রমে পুত্র তন্নু কেমন ভাবে থেকেছে, কি কি শিখেছে—সব জিজ্ঞেস করে জেনে নিল। অসীম তৃপ্তির হাসির রেখা জেগে উঠলো তার মুখে। পরক্ষনেই একটা কাশির দমক্ উঠলো মুকুন্দরামের। কাশ্‌তে কাশ্‌তে শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল তার। ভয় পেয়ে তন্নু "মা" বলে ডেকে উঠলো। 'মা' ডাক শুনেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো তন্নুর মা। শিয়রের কাছেই রাখা ওষুধের পাত্র থেকে শঙ্খ-ঝিনুকে একমাত্রা ওষুধ নিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কাশির বেগ না কমলে খাওয়ানো সম্ভব নয়। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ক্রমশঃ শান্ত

হয়ে এলো মুকুন্দরাম।—একটু হাঁ করো! দাওয়াই পী লো—খেয়ে নাও ওষুধটুকু। তন্নুর মা বলল।

ঘেমে উঠেছে সমস্ত শরীর মুকুন্দরামের। শাড়ীর আঁচল দিয়ে কপাল, মুখ আর গলার ঘাম মুছে দিল তন্নুর মা! তারপর মুখ হাঁ করিয়ে ঝিনুকের ওষুধটা ঢেলে দিল স্বামীর মুখে। একটু পরেই খানিক সুস্থ হয়ে উঠলো সে।

বিস্ময়ের সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা শেলের মত বিঁধলো তন্নুর বুকে। বাবার এমন হলো কি করে? কবে থেকে? কাতর স্বরে ও বলে উঠলো ঃ"মানি! পিতাজীকি এ হালত্—ইত্নি বুড়ি হালত্ কিউঁ হুয়া? কব্সে হুয়া?"

স্বামীর গা মুছে দিতে দিতে মা জবাব দিল, "কিউঁ হুয়া, এ তো মুঝে পতা নহী বেটা তন্নু! আমি জানিনা কেন এমন হলো! লেকিন হুয়া হ্যায় মাহ্ভর্ পহ্লেসে—একমাস আগে থেকে। কবিরাজজী তো দাওয়াই দে রহে হ্যাঁয়! ভালই তো হয়ে উঠছিলেন। আজ আবার কাশিটা সুরু হলো!"

"ম্যায় ঠিক হুউঁ!" মুকুন্দরাম সামলে নিয়েছে, "ভয় পেওনা তোমরা।"

স্বামীকে কথা বলতে দেখে তন্নুর মা উঠে দাঁড়ালো। "আমি একটু দুধ গরম করে নিয়ে আসছি।" দ্রুতপায়ে চলে গেল।

তন্নু বাবার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ঃ আপকো এ ক্যায়সা বিমার লগ্ গয়া, বাবা?"

"ফিক্র্ মত্ কর্, বেটা—চিন্তা করো না! ঠিক হয়ে যাবো—জল্দ্ হি আরাম হো যায়েঙ্গে।" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দম নিল মুকুন্দরাম। তারপর পুত্র তন্নুর দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগল ঃ "তন্নু বাবা! অব্ তুম্ বড়ে হো গয়ে, যবান্ হো গয়ে, যুবক হয়ে গেছো তুমি, বড় হয়ে গেছো এখন। সে জন্যেই কয়েকটা বিশেষ দরকারী কথা, তোমাকে বলা প্রয়োজন। মানুষের অবস্থা কখন কেমন হয়, কেউই তা বলতে পারে না। পরে হয়তো আর সময় পাবো না।

তা ছাড়া, তোমাকেও তো আবার স্বামীজির ওখানে ফিরে যেতে হবে ?”

“আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো ! তারপর সব কথা বলা যাবে।” তনু ধীরস্বরে বলল। “তোমাকে সুস্থ না দেখে আমি ফিরে যাবো না ! ”

মুকুন্দরাম পুত্রের অনিন্দ্য মুখের দিকেই তাকিয়েছিলো। ওর কথা শুনে মলিন হাসি জেগে উঠলো তার মুখে।—“আমার এই বিমারি, —আমি যে কবে সুস্থ হয়ে উঠবো তা জানি না। তুমি এতদিন, এত-বছর পর এসেছো। নিশ্চয়ই তোমার যদ্দিন খুশী থাকবে! তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। খুব কষ্ট করে, সাধনা করে তোমাকে পেয়েছি আমরা। কিন্তু তোমার জেনে রাখা ভাল যে কেবল আমিই তোমার বাবা নই! তোমার আর একজন পিতা আছেন। যাঁর আশীর্বাদ, শুভকামনা ছাড়া তোমার মত সন্তান পাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘটতো না !”

তনু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে শুনছিলো ! বাবা ক্লান্ত। কথা বলতে যে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে' থেমে থেমে, দম নিয়ে তবে বলছে, বাবার ক্লেশ হচ্ছে বলতে' তা বুঝেও তনু তাকে থামতে বলল না। একটা কৌতূহল বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে ! জাগিয়ে দিয়েছে বাবাই। বাবার কথা। আমার আর একজন পিতা আছেন ? তিনি কে ? কি ভাবে তিনি আমার পিতা হলেন ?

মুকুন্দরাম আবার বলতে সুরু করল: সব কথা বলার সময় নেই। আর প্রয়োজনও নেই। কত দুঃখের, কত যন্ত্রনার, কত সাধনার মধ্য দিয়ে যে তোমাকে পুত্ররূপে পেয়েছি, একদিন সবই হয়তো তুমি জানতে পারবে। সমীচীন বোধ করলে, আমি যাঁর কথা তোমাকে বলবো, বলছি, যাঁর অসীম দয়ায় তুমি আমাদের ঘরে এসেছো, সেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তুমি সব জানতে পারবে। তিনি আমাদের যেমন, তেমনি তোমারও পরম শ্রদ্ধেয়। আমার অবর্তমানে তুমি তোমার জীবনভর কখনও, কোনভাবেই তাঁর পরামর্শ অবহেলা করো না।

জেনে রাখো, তিনিই তোমার সবচেয়ে কাছের, তোমার শুভাকাঙ্খী, মঙ্গলাকাঙ্খী! তুমি গোয়ালিয়রে গিয়ে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তাঁর পুণ্যনাম—হজরত মহম্মদ গওস্!" ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো মুকুন্দরাম। তন্নু সভয়ে বাবার বুকের ওপর হাত রাখল।

মা দুধ নিয়ে এলো।—"থোরা সা দুধ পী লো, দুধ খেয়ে নাও একটু।" তন্নুর মা বলল। —তোমাকে বেশী কথা বলতে কবিরাজ মশাই নিষেধ করেছেন। ছেলে তো এখন থাকছে এখানে। ওর সঙ্গে পরেও কথা বলতে পারবে।"

মুকুন্দরামের রোগ পাণ্ডুর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা জেগে উঠলো। স্ত্রীর কথার উত্তর সরাসরি না দিয়ে বলল, "আর কোনও কথা বলবো না আমি। আমি এখন গান শুনবো! তন্নু বেটা আমাকে এখন গান শোনাবে। ও কেমন গাইতে শিখলো, স্বামীজির কাছে কেমন তালিম পেলো, তা তো এখনও আমরা জানি না"

"গান শোনবার অনেক সময় পাবে। কবিরাজ মশায়ের আসবার সময় হয়ে গেছে।" তন্নুর মা বলল।—"না, না, সবটুকু দুধ খেয়ে নাও।"

"কবিরাজ মশাই আসবেন! তিনি তো রোজই আসছেন। আজ নতুন তো নয়! ততক্ষণ গান শোনাবে আমাদের তন্নু বেটা। তুমিও বসো না। বাটিটা এখানেই রাখো। পরে সাফ করো।" তন্নুর দিকে ফিরে মুকুন্দরাম বললো, "গা বেটা! একটা ভজন গান শোনা। স্বামীজির 'বাঁকে-বিহারী নাকি খুবই সুন্দর মূরত্? তাঁর সামনে বসে রোজই সন্ধ্যায় তো তিনি ভজন গান করেন? তো একটা ভজনই শোনাও বেটা!" সাগ্রহে তাকালো মুকুন্দরাম পুত্রের মুখের দিকে।

বাবার আগ্রহ দেখে তন্নু মনে মনে প্রস্তুত হলো। ওর বুকের মধ্যে, কেন কে জানে, অকস্মাৎ একটা ধাক্কা লাগলো! একটা অবর্ণনীয় দুঃখানুভূতি প্রহত-মুরজের (মৃদঙ্গ) মত বেজে উঠলো বেদনার্ত করুণ তালে! চোখের সামনে ওর ভেসে উঠল সেই মহিয়সী, ভক্ত নারীর

আলেখ্য। গুরুদেবের মুখে কতবার শোনা চিতোর গড়ের মহারাণী, সর্বসুখ, স্বাচ্ছন্দ, ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে যিনি প্রেমময়ী রাধিকার মত, শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণ, সেই অতুলনীয়া রমণীর বাস্তব চিত্র যেন ও দেখতে পেলো। বৃন্দাবনাধিপতি বাঁকে-বিহারী তাঁর মধুর বংশী ধ্বনিতে প্রেমের আকুল বাণী আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন! চরাচর আছন্নকারী সেই প্রেমময় বংশী ধ্বনির আহবান শুনে মহারাণী বেরিয়ে পড়েছেন পথে। প্রসাধনহীন, নিরালঙ্কার, নগ্নপদ—একেবারে ভিখারিনীর সাজে বেরিয়ে পড়েছেন মহারাণী। হাতে কেবল এক-তারাটি সম্বল। কিন্তু বুকের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমে-মাতোয়ারা! অঙ্গে অঙ্গেও কৃষ্ণ-প্রেমের হিন্দোল! আহার-নিদ্রা, ভয়, সব কিছু তুচ্ছ করে, কেবল কৃষ্ণনাম মুখে নিয়ে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছেন সর্বত্যা-গিনী। তাঁর সুললিত নগ্নপদ কণ্টকে, কঙ্করে ক্ষত বিক্ষত। তবুও ভ্রূক্ষেপহীন, অনন্যমনা এক লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর কাছে সমস্ত জগত মিথ্যা। কেবল এক সত্য—এক কৃষ্ণ! কৃষ্ণই তাঁর আনন্দ! কৃষ্ণানন্দে বিহ্বল হয়ে তিনি গেয়ে চলেছেন: "ম্যঁয় ভরোসে আপ্‌নে গির্‌ধর্‌ কে·······....

···হে গিরিধারী! তুমিই আমার জীবনের সব কিছু, আমার একান্ত ভরসা, হে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ! তোমার প্রতি বিশ্বাসই আমার জীবন ধারণ!........

পুত্র তন্নুর ভরাট, উদার কণ্ঠে ভিখারীনি-মহারানী মীরাবাঈ-এর প্রিয় ভজন এমন মূর্তরূপে বিকশিত দেখে মুকুন্দরামের রুগ্ন, পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! অকস্মাৎ যেন অজানাকে জানার এক বিস্ময় এবং তারই সঙ্গে গভীর ভালবাসার আবেগে তার রোগজীর্ণ শরীরে কম্পন উঠলো। তার একটা হাত পুত্র তন্নুর একটা হাতে দৃঢ় ভাবে চাপ দিল। গাইতে গাইতেই তন্নু অনুভব করলো বাবার প্রবল স্নেহ, গভীর ভালবাসার উত্তাপ! মুকুন্দরামের দুচোখের কোল বেয়ে অকৃত্রিম, স্নিগ্ধ আনন্দধারা বহে যেতে লাগল! এই আনন্দের মাঝে, তবুও, পুত্র তন্নুর ঐশীতেজ সম্পন্ন সুরধারায় আস্নাত হ'তে হ'তে, কি

জানি কি এক অজানা বিষাদে মুকুন্দরামের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল! এই পৃথিবীতে তার জীবনের শেষ কয়েকটা জ্ঞাত-মুহূর্ত মাত্র! বুঝি বা পিতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্খা, কৃতি পুত্রের সান্নিধ্য সুখ এই পার্থিব-জীবনে আর পূর্ণ হবে না—বিদ্যুৎ-চমকের মত ক্ষণিক এই বোধ! মুকুন্দরামের স্নেহ-সিক্ত চক্ষুদুটি পুত্র তন্নুর অনুপম মুখশ্রীর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে গেল। পুত্রের হাতে তার হাতের চাপ শিথিল হয়ে গেল!

ত্রাস্ত আতঙ্কে তন্নুর গলায় গান রুদ্ধ হয়ে গেল! চম্‌কে বাবার মুখের দিকে তাকালো ও! ভয়ঙ্কর এক আঘাতে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল ওর বুক!

তন্নুর মা-ও মুগ্ধ- বিস্ময়ে পুত্রের দেবদুর্লভ কণ্ঠের সঙ্গীতে তল্লীন হয়ে বসেছিল। সহসা নৈঃশব্দে সচকিত হয়ে পুত্রের দৃষ্টি অনুসরনে স্বামীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই আর্ত গোঙানীতে ভেঙ্গে পড়লো তাঁর বুকের ওপর।

ঠিক তখনই দরজার গোড়ায় কবিরাজ মহাশয় এসে দাঁড়ালেন!

* * *

তিনি সন্ন্যাসী মানুষ। তবুও পুত্রসম প্রিয়শিষ্যের অনুপম মুখখানি স্মরণ করে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হলো! পত্রখানি গুছিয়ে তিনি পাশে রাখলেন। সংসার অনভিজ্ঞ রামতনু অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে নিতান্তই অধীর হয়ে পড়েছে! এবং আরও ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা,-রামতনুর মা-ও স্বামীর শোকে শয্যা গ্রহণ করেছে! রামতনুর পত্রের ভাষাতেই তাঁর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি যে মায়ের অবস্থাও মোটেই আশাপ্রদ নয়! আচার্য নিজেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। ওর মায়েরও যদি এই সময় কিছু ঘটে যায়—!

আচার্য উঠে পড়লেন। ঘরের বাইরে এসে বাঁকে-বিহারীর মন্দিরের দিকে একবার তাকালেন। তারপর গম্ভীর স্বরে ডাকলেন, "নারায়ণ!"

তাঁর একান্ত সহচর নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো!

"নারায়ণ! তুমি এখনই প্রস্তুত হ'য়ে কাশীর পথে রওয়ানা হয়ে

যাও! আজ পক্ষকাল পার হয়ে গেল রামতনুর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। ওর মায়ের অবস্থাও ভাল নয়! আমি একখানি পত্র লিখে দিচ্ছি। কাশীতে তো ওর আপনজন কেউই নেই। এখন তুমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালে ও মনে বল পাবে। তেমন বুঝলে বিষয়-আশয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে ওর মাকে নিয়ে এই আশ্রমে চলে আসবে! বুঝেছো?"

নারায়ণ আচার্যকে প্রণাম করে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াবে, তখনই প্রবেশদ্বারের কাছে একটি শকট এসে থামলো। নারায়ণ তাকালো। আচার্যও ঘরে যেতে গিয়ে ফিরে তাকালেন! তাঁর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "রামতনু!"

শকট থেকে নামতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলো রামতনু। উল্কার মত ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেললো নারায়ণ। রামতনুর অচেতন দেহ ঢলে পড়লো নারায়ণের বুকে।···

....সেদিন, এবং তারও পর দুদিন, রামতনু কথা বলবার মত অবস্থায় ছিল না। চতুর্থ দিন থেকে, নারায়ণের একান্ত শুশ্রূষায় এবং স্বামী-জীর পবিত্র সান্নিধ্যে, ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগল রামতনু। রামতনুর পত্র পড়ে তিনি যে আশঙ্কা করেছিলেন তাই সত্য ঘটেছিল। যে মুহূর্তে রামতনুর পিতার শেষ নিঃশ্বাসবায়ু নির্গত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওর মা সেই যে স্বামীর বুকের ওপর পড়ে গিয়েই সংগাহীন হলো, সেই সজ্ঞা আর ফিরে এলো না তাঁর। গভীর রাত্রে মৃত-স্বামীরই বুকে মাথা রেখে চলে গেল রামতনুর— তনুর মা। কাশী নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ তো স্বয়ং উপস্থিত ছিলেনই, উপরন্তু, তার আহ্বানে আরও কজন বিশিষ্ট কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তবুও শেষ রক্ষা আর হয় নি। পাড়া প্রতিবেশীদের সহায়তায় এবং পিতৃবন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ যত্নে পিতা মুকুন্দরামের বিষয়-আশয় নিয়ে কোন সমস্যাও ঘটে নি।

"না, গুরুদেব! বিষয়-আশয়ে আমার কোনও স্পৃহা নেই!— আমি সবই এই আশ্রমের উন্নতি এবং 'বাঁকে-বিহারী'-জীর সেবায়

নিবেদন করেছি। আপনার পবিত্র সান্নিধ্য ছেড়ে আমি আর কোথায় যাবো ?"

চতুর্থদিন একটু সুস্থ হয়ে, স্বামীজীর পদপ্রান্তে বসে কথাগুলি ধীর, নিশ্চিত প্রত্যয়ে নিবেদন করলো রামতনু !

স্বামীজী রামতনুর কথা শুনে গেলেন। কোন উত্তর দিলেন না। কারণ, রামতনুর কথা যে শেষ হয়নি, আরও কিছু যে ওর বলার আছে, তা তিনি বুঝেছিলেন। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ প্রাণাধিক এই শিষ্যটির প্রতি তার অসীম ভালবাসা। তাই তিনি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন। ভাবছিলেন রামতনুরই ভবিতব্যের কথা। সন্তানসম রামতনু অতিশয় ভক্তিমান। যদিও ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন ; সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, শার্দূলসম ওর ইন্দ্রিয়শক্তি। কিন্তু, এই সমস্ত গুনই বৃথা হয়ে যাবে যদি রামতনু কর্মশক্তিতে মহান না হ'য়ে ওঠে !

পিতা-মাতার, একই সঙ্গে প্রায় একই রকমভাবে অকস্মাৎ চলে যাওয়ায় ওর মনের মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যে অসহায়ত্ব ওর মনের মধ্যে বসত্ করতে চাইছে, তাকে অপসারিত করতে হবে। অবশ্য এই কাজ টুকু রামতনু ওর স্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতা দ্বারাই করে ফেলতে সক্ষম হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ! কারণ, এতগুলি বৎসর ধরে রামতনুকে কেবল সঙ্গীত শিক্ষাই তো তিনি দেন নি, সেই সঙ্গে কাব্য, সাহিত্য, রস-শাস্ত্র, এমন কি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাকেও রামতনুর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তা ছাড়াও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই ভারতবর্ষের দান, শিল্পবিদ্যা কলাবিদ্যা যাই বলা যাক, তার সমষ্টিগত-ধারাগত তত্ত্ব সম্পর্কে যাতে একটি সুমার্জিত ধারণা গড়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে এগুলির ব্যবহার পদ্ধতি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও গড়ে ওঠে, এই বিষয়ে অতি কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি রামতনুকে পারঙ্গম করে তুলেছেন। কাজেই, ওর মানসিক দৃঢ়তা এবং ওর প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আচার্যজীর কোনও ভুল ধারনাই নেই। তবুও বয়োধর্ম ! রামতনু এখন যে বয়সে, এ সময় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে

এই আশ্রমের আপাত শুষ্ক পরিবেশ, এখন, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, ওর মনের দিক থেকে গ্রহণীয় নাও হ'তে পারে! সেক্ষেত্রে, সাময়িক স্থান পরিবর্তনে অবশ্যই সুফল ফলতে পারে। এবং প্রয়োজনের দিক থেকেও রামতনুর স্থান পরিবর্তন কাম্য। কারণ, এ তত্ত্ব আচার্য হরিদাসের অজানা নয় যে সংসার এক মহান কর্মক্ষেত্র। মানুষের যাবতীয় সাধআহ্লাদ, আশা-আকাঙ্খা সবই এই বৃহৎ মানব-সংসারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষ বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যেই। যদিও মানুষের সঙ্গেই মানুষের শত বৈরীতা, শত যুদ্ধ, সে জন্যই তো সংসার এক বৃহৎ রণাঙ্গনও বটে! আর এই রণাঙ্গনে প্রতি মুহূর্তেই যুদ্ধও করে যেতে হয়। যুদ্ধ করেই মানুষকে নিজের বিশিষ্ট স্থানও অধিকার করে নিতে হয়, বেঁচে থাকতেও হয়। কাঁদতে হয়, অশ্রুঝরে, ঝরে যায় স্বেদ-রক্ত, যার পারাপার নেই! তবু, তারপরই আসে সুখের সময়, আনন্দের সময়। সেই সুখ, সেই আনন্দেরও তখন তুলনা থাকে না, হয় না! জীবন তখন সার্থকতার ফলে ফুলে ভরে ওঠে! সেই সার্থক জীবনের দিকে এগিয়ে দিতে হবে রামতনুকেও। সঠিক পথ ওকে চিনিয়ে দিতে হবে। যেন দিগভ্রান্ত হয়ে বিপথে না চলে যায়। তিনি জানেন যে রামতনু মূলতঃ ভক্তি-মার্গের পথিক। ও সঠিক সময়ে অবশ্যই ফিরে আসবে তাঁর কাছে। ইতি মধ্যে সংসার ক্ষেত্রে চাই ওর কর্মের স্বীকৃতি! এবং এই কর্মের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই হবে কীর্তি স্থাপনা। ভাগ্যও কিছু নয় যশও কিছু নয়। ওইগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তাৎক্ষনিক মোহের সৃষ্টি করে মাত্র। আসলে মানুষের নাম অক্ষয় অমরত্ব লাভ করে তার কর্ম ও কীর্তির মাধ্যমে। এই গূঢ়তত্ব আচার্য হরিদাস স্বামীজী জানেন। তিনি জানেন যে তিনিও মহা পূণ্যবান যে রামতনুর মত আধার পেয়েছেন। যার মাধ্যমে তিনিও অক্ষয় অমরত্ব লাভ করবেন।

"গুরুদেব!" রামতনুর ডাকে স্বামীজী মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

বল বৎস! আমি শুনছি! অসঙ্কোচে বল!"

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো রামতনু। আসলে এই আশ্রম

ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই ও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলো। অথচ, পিতৃ আজ্ঞা পালন করবে না, এ চিন্তাও আদৌ ওর কাছে সুখকর নয়। এদিকে স্বামীজীও ওর কাছে পিতার চেয়ে কম নন। তাই ওর মনে কিছুটা বা দ্বিধা, সঙ্কোচ। গুরুদেব সঠিকভাবেই তা বুঝেছেন তাই অসঙ্কোচ হ'তে বললেন।

"আমার একবার গোয়ালিয়রে যাওয়া প্রয়োজন!" রামতনু মৃদু স্বরে প্রার্থনা জানালো।—"পিতৃদেব মৃত্যুর কিছু আগে আমাকে বলেন যে আমি যেন গোয়ালিয়রে গিয়ে ফকির হজরত্ মহম্মদ গওসের সঙ্গে অবশ্যই একবার সাক্ষাৎ করি। তিনিও নাকি আমার আর একজন পিতা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার পালনীয় কর্তব্য!"

"তোমার পিতা ঠিকই বলে গেছেন রামতনু!" আচার্য হরিদাস স্নেহভরা স্বরে বললেন, "হজরত গওস্ তোমার পিতৃতুল্যই বটেন! তাঁর সঙ্গে তুমি অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। আমি সানন্দে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

........সেই একই স্থানে, যমুনাজীর তীরে, যেখানে এসে ও বসতো আজ সেখানেই বসে আছে রামতনু। যমুনাজীর অথৈ নীলধারার দিকে তাকিয়েই ও বসে আছে। হঠাৎ করে ওর বুকের ভেতরটা, মনের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। অথচ, কটা দিনই বা? মাত্র তো পক্ষকাল! এরই মধ্যে, এটুকু সময়ের মধ্যেই, এই জগতের অস্তিত্ব কেমন যেন প্রাতিভাসিক বলে প্রতীয়মান হ'চ্ছে! অথচ, ঘটনা তো ঠিক এর বিপরীত! ওর এই চিন্তা বরং অবাস্তব। কেন না, এই জগত, তার আপন নিয়মেই অনাদি অনন্তকাল ধরে চলেছে। চলবেও। যতদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের থাকবে অবস্থিতি, অন্ততঃ মহাজনেরা এরকম কথাই বলেন। বলেন গুরুদেবও। তাছাড়া, ওর নিজেরও তো এখন এসব তত্ত্ব বোঝার মত বয়স এবং বোধ হয়েছে। এ সংসারে জন্ম-গ্রহণ করে, বিশেষতঃ, আকাঙ্ক্ষিত সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলে, তার পিতৃ-মাতৃরূপ মহাগুরু নিপাত হলে, সন্তানের পক্ষে যন্ত্রনার কাল বড়ই

অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন নিজেকে পিতা-মাতার দুর্ভাগ্যকারী সন্তান বলে মনে হয়।

নাঃ! এসব ধ্বংসকারী চিন্তা ক্রমশঃই ওকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ও উঠে পড়লো। তীর ধরে হাঁটতে লাগল। যেমন ও হাঁটতো। কত রকমের বুনো ফুল ফুটে রয়েছে অসংখ্য ঝোপ ঝাড়ে। বড় বড় গাছও আছে। একটা কি যেন গাছের গা বেয়ে উঠেছে অপরাজিতা লতা। নীল তারার মত কত ফুল! দেখতে দেখতে আর হাঁটতে হাঁটতেই মনের মধ্যে গানের কথা গুনগুনিয়ে উঠলো! কথার অবয়ব তখনও অবশ্য স্পষ্ট নয়।—একটু বা ওর মনোযোগ ছিন্ন হলো। কারণ, উত্তর-পূর্ব কোণের আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে। তবে কি ঝড়, বৃষ্টিপাত হবে? ঈশান কোণে মেঘ জড়ো হলে সে সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না! তবু গ্রাহ্য করলো না রামতনু। না হয় ভিজবে! অবশ্য, কদিন বাদেই গোয়ালিয়র রওয়ানা হবার কথা। গুরুদেবের আদেশে, এবং দুর্বল শরীরের কারণেও বটে, সপ্তাহকাল এখানেই থেকে যেতে হবে। তাতে রামতনুর ভালই হয়েছে! তবুও যে কেন মাঝে মাঝে ক্ষয়কারি চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে!

কদিন ধরে মাঝে মধ্যে অদেখা, যিনি নাকি ওর পিতৃসমান, সেই হজরত মহম্মদ গওসের কথা ওর মনে হচ্ছে। কি জানি কেমন দেখতে তাঁকে! কেমন মানুষ তিনি! তিনি ওর পরম শ্রদ্ধেয়, একথা তো ওর প্রয়াত পিতৃদেব বার বার বলেই গেছেন। কিন্তু, জ্ঞান বয়সে কখনও তো ও গোয়ালিয়র যায় নি। তবে শুনেছে মোটামুটি বড় শহর গোয়ালিয়র। তবে তাঁর বাড়ী খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হবে না। ঐ শহরের প্রতিটি মানুষের কাছে হজরত গওস্ পরম শ্রদ্ধেয়। সবাই তাঁর বাড়ী চেনে। কিন্তু ব্যক্তিটি তিনি কেমন? তাঁর মেজাজ মর্জি কিছুই তো রামতনুর জানা নেই! কেমন আচরণ করবেন তিনি ওর সঙ্গে? কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন ওকে? তাঁর বাড়ীর পরিবেশই বা কেমন? সর্বোপরি, ও নিজে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে তো? যদি বা হজরত্‌জীর সঙ্গে ওর মিল হ'য়ে যায়, বাড়ীর অন্যান্যরা কি

ভাবে ওকে গ্রহণ করবে ? তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ? বা অন্যান্য আত্মজনেরা, যদি তাঁর থাকে কেউ ? এখানে, এই বৃন্দাবনে, আচার্যজীর আশ্রমে যে বয়সে ও এসেছিল, এসব ভাবার কোন অবকাশ ছিল না। বরং স্থান পরিবর্তনে ওর মন আনন্দে নেচে উঠেছিল ! তার ওপর গুরুদেবের স্নেহধারায় ও এমনই আপ্লুত ছিল যে মা-বাবাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট ও কোন দিন অনুভব করে নি। কিন্তু এখন, এই বয়সে, হজরতজীর সঙ্গে ও কি এমনিভাবেই মিশে যেতে পারবে ?

হঠাৎ একটা প্রবল হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে আঘাত করল রামতনুর চোখে মুখে ! চম্‌কে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো ও। আশ্চর্য্য ! ঈশান কোণের জমা মেঘ ভেসে ভেসে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ! ক্রমশঃ মেঘহীন হয়ে আসছে আকাশ ! এতক্ষণ ও কি সব ভাবছিলো অধম প্রকৃতির মানুষদের মতো ? দুর্বল মনের মানুষদের মতো ? প্রবল হাওয়ার ঝাপ্‌টা ওকে যেন তিরস্কার করে গেল ! চেতনা দিয়ে গেল ওকে। গানের কথাগুলি স্পষ্ট অবয়বে ধরা দিল এবার ! তন্ময় হয়ে ও নিজের মনেই গেয়ে উঠলো ঃ

শ্যাম সো ঘনশ্যাম উমড়্‌ আয়ো—
মন্‌দ মন্‌দ মূরলীতান গগণ ঘোর ঘহ্‌রায়ো........"

আশ্রমে নিজের ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে লিখল রামতনু। এ পর্য্যন্ত অনেকগুলো গানই ও লিখেছে। কিন্তু তার সবই যে রেখে দিয়েছে তা নয়। যেগুলো ভাল হয়েছে, ভাল বলে মনে হয়েছে নিজের, সেগুলোই যত্ন করে রেখেছে। রেখেছে অবশ্যই যত্ন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর মনে হয় কে-ই বা শুনবে এসব গান ! আর শোনবার পরই বা ক'জন মেনে নেবে ? তারা হয়তো বলেই দেবে যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যেখানে সুরই প্রধান সেখানে ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাবার অত প্রয়োজন কি ?

এখনই রামতনুর কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। কিন্তু ও অনুভব করে যে ধ্রুপদাঙ্গের গানে বাণীর বিচিত্র প্রকাশ ঘটানো সম্ভব।

কেবল সম্ভব নয়, প্রয়োজনও। কেন না ভাষা কখনই সঙ্গীতের প্রতিবন্ধক নয়। বরং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ভাষা অনেকখানিই সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে, বিশেষতঃ ধ্রুপদাঙ্গের গানে। ধ্রুপদের—হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের যিনি প্রথম স্রষ্টা, যিনি সংস্কৃতে ধ্রুব, প্রবন্ধ, ছন্দ থেকে এই ধ্রুপদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই আবার চারতুক্ বিশিষ্ট ধ্রুপদ গানের প্রথম প্রবর্তক। চারতুক্ অর্থে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ, এই কলি বিশিষ্ট ধ্রুপদ গান। সিদ্ধপুরুষ বৈজু বাওরা যা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। ভালই করেছিলেন। রামতনু ভাবে। এই কলি ভাগ করেছিলেন বলেই বাণীর সার্থক প্রয়োগ করতে রামতনু কোন অসুবিধা বোধ করছে না। বরং বাণীর মাধ্যমে বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটাতে পেরে অসীম তৃপ্তি বোধ করছে রামতনু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করছে যে এখানেই থেমে গেলে চলবে না। এমন একটা কিছু, যা নতুন, ওর পূর্বে আর কেউ করেনি, তেমনি একটা নবধারার প্রবর্তনা করতে হবে ওকেও! যেমন, গুরুদেবের মুখেই শুনেছে ও। সঙ্গীত শিক্ষার সময়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন। বলেছেন যে বৈজু বাওরার সময় থেকেই ছন্দ, প্রবন্ধের পরিবর্তে ধ্রুপদই হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতে প্রধান স্থান অধিকার করে। অথচ, আশ্চর্য্যের কথা। জঙ্গলবাসী সঙ্গীত সাধক বৈজুর প্রতিভার কথা শুনে বাদশা আলাউদ্দিন যখন তাঁকে যথাযথ সমাদর করে নিজে দরবারে নিয়ে আসেন তখন বাদ্‌শার দরবার আলোকিত করে পাণ্ডিত্যে উজ্জ্বল নায়ক গোপাল এবং স্বয়ং আমীর খুস্‌রৌ উপস্থিত! তাঁরা তো বটেই, দরবারে উপস্থিত অন্যান্য গুণীজনের সামনে যখন বৈজুবাওরা তাঁর সঙ্গীত অর্ঘ্য নিবেদন করলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বৈজুর মাধুর্য্যময় কণ্ঠস্বরের শত তারিফ করলেন। একথা সত্য, বৈজুর কণ্ঠস্বর ও গান নায়ক গোপাল বা আমীর খুসরৌ-এর চেয়ে অনেক, অনেক বেশী শ্রুতিমধুর ছিল। কেবল কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য দিয়েই নয়, গুনেও বশীভূত করেছিলেন তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য নায়ক গোপালকে। বৈজু তো দরবারে থাকতেনই না।

বেশীক্ষণ। কিন্তু বৈজুর প্রবর্তিত ধ্রুপদ পদ্ধতি অনুসরণ করেই নায়ক গোপাল কত যে ধ্রুপদ রচনা করেছেন। বস্তুতঃ, তাঁদের রচিত ধ্রুপদের অতি সুললিত মধুর পদ আজও সমান ভাবে মুগ্ধ করে!

রামতনুর মনেও মাঝে মধ্যে তাই এমন এক একটি গোপন-মধুর ইচ্ছা জাগে! মনে হয়, আমি যদি বৈজুর থেকে আর একটু এগিয়ে যেতে পারি! পারবো না কি? নিশ্চয়ই পারবো। বৈজুর পরে আর তেমন করে তো কেউই সঙ্গীতের জগতে ভাস্বর হ'য়ে উঠতে পারে নি! অন্ততঃ গত দুই শত বছরের মধ্যেও! অবশ্য এ কথাও ঠিক যে নানান বিপর্য্যয়কারী রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুন সংস্কৃতি চর্চার—সঙ্গীতের মত উচ্চ সংস্কৃতি চর্চার-অবকাশই অনেক কমে গিয়েছিল। তবে কেউ না কেউ তো নিভৃতেও ধরে রাখতে পারতো! কিন্তু তেমনটাও তো ঘটেনি। গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনায় এবং ইতিহাস পাঠ করে এই সব ধারনাই হয়েছে রামতনুর। গুরুদেবের মুখেই অবশ্য সাম্প্রতিক একজন মহা-রাজার কথা শুনেছে রামতনু। তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজা মান সিং। তিনিই হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের পুণরুত্থান ঘটিয়েছেন। মাত্রই গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তাঁর সুযোগ্যা রাণী, মহারাণী মৃগনয়ণীও নাকি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি সম্পন্না! এই সংবাদটি অবশ্যই রামতনুর পক্ষে খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়েছিলো! ও তখনই ঠিক করে রেখেছিল যে যদি কোন দিন গোয়ালিয়র যাওয়া হয়, তবে মহারাণী মৃগনয়ণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও করবেই। তার গান ও শুনবেই।

"আরে! তুমি ঘরেই বসে আছো চুপটি করে?"

কথাগুলো কানে যেতেই নিজের ভাবনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এল রামতনু!—"কে? গোবিন্দা? এস! এস! ভেতরে এসো!

"না। এখন আর সময় নেই! সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। মন্দিরে যাবে না?"

"তাই তো! আমি খেয়ালই করিনি। তুমি এগোও গোবিন্দা! আমি হাত-মুখ ধুয়েই চলে যাচ্ছি! আর হ্যাঁ, গোবিন্দা! তোমার ওই দাঁতের ব্যথা কমেছে? না এখনও ভুগছো!'

"একটা তো নয়! দু-দুটো দাঁত!" গোবিন্দা বলল," লবঙ্গ-তেল দিতে কমেছে। তবে মনে হচ্ছে তুলেই ফেলতে হবে। বৈদ্যজীর কাছে যাব আজ-কাল। তুমি চলে এসো তাড়াতাড়ি! সকলে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।" গোবিন্দা চলে গেল।

"এসো বৎস!" আচার্যজী রামতনুকে কাছে ডেকে বসালেন।—"তুমি তো আগামীকাল গোয়ালিয়রের পথে রওনা হবে! ফকির গওসকে সংবাদ দিয়েছো তো? পত্র পাঠিয়েছো?"

রামতনু আচার্যজীকে প্রণাম করে বলল, "হ্যাঁ. গুরুদেব। পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। সংবাদও তিনি অবশ্যই পেয়ে গেছেন এতদিনে।"

"বেশ! তবে আজ বাঁকে-বিহারীর পূজা তুমিই কর! একটি ভজন গেয়ে শুভারম্ভ কর!"

কি মনে হলো রামতনুর, এমন সুযোগ আর হয়তো পাওয়া যাবে না। গেলেও কবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া, ওর নিজের মনেও তো অফুরান জিজ্ঞাসা! বেশ কিছু গীত এরই মধ্যে রচনা করেছে ও। এবং সমস্ত গীতই ওর অতল অন্তর হতে আপনিই উৎসারিত হয়েছে। কিছু কিছু গীতে ও সুরারোপও করেছে। একান্তে বসে বারে বারে গেয়ে নিজেকেই নিজে শুনিয়েছে। ওর আপন বোধ, বিবেচনা, ওকে বলে দিয়েছিল যে স্থায়ী বা আস্থায়ী পর্যায়ের মধ্যেই যখন মিলতুক এবং অন্তরা রয়ে গেছে, তখন স্থায়ীকে ভাগ বা পর্যায় বলে মেনে নিলেই তো যথাযথ হয়! আর ভোগ ও আভোগ—এই দুটিকে যদি প্রথা মাফিক সঞ্চারী মনে করা যায়, তাতে কোনই দোষ ঘটে না, অসঙ্গতও হয় না মোটেই। অযথা বাহুল্য, গতানুগতিক ধারায় যা চলেই আসছে, তাকেই অনুসরণ করে যেতে হবে এমন তো কোনও দিব্য দেওয়া নেই! তবে আমি এটাকে সংক্ষেপ করে নেবো না কেন? তাহলে এতগুলি বৎসর গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে এত শাস্ত্র পাঠ ক'রেও লাভ কি হলো? বড় হ'তে হবে আমাকে। তাতেই

গুরুদেবের নাম উজ্জ্বল হবে। তা না হলে কেবল গুরুর অনুকরণ করে গেলে তো কোন লাভ হবে না!

অবশ্য, এ সত্য রামতনুর অজ্ঞাত নয় যে অনুকরণই সঙ্গীত-শিল্পের মূল কথা। তবুও অনুকরণ শক্তিই সব নয়। কেবলমাত্র অনুকরণ করে গেলে এক ধরনের নৈপুণ্য অবশ্যই গড়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিদ্যার চর্চা করারও প্রয়োজন আছে। আছে বলেই তো আচার্যজী ওকে বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ, ইতিহাস পাঠে সব সময় অনুপ্রাণিত করেছেন। শিল্পের পরিভাষা, পদ্ধতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছেন। ভারতীয় রস-শাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাবের বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে পদ্ধতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রামতনুর মনে একটা পরিষ্কার ধারনা গড়ে তুলতে তিনি সহায়ক হয়েছেন!

রামতনু তাই ভাবল' যে আজকের এই মহাক্ষণটিকে ও কিছুতেই অবহেলা করবে না। ও নিজের রচিত এবং নিজেরই সুরারোপিত ভজন গাইবে। ও নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। এই বৃন্দাবনেই একদিন যমুনাজীর পারে বসে যে গীত রচনা করেছিল, সুরারোপ করে-ছিল, ওর ঐশ্বরিক কণ্ঠে সেই গীতটিই পুষ্পধারার মত ঝ'রে পড়লো:

"বন্‌শি ধুন্‌ সো বজায়ে বাজত
শ্রীবৃন্দাবন রঙ্গ—
ঘুমড় রহো সঘন গরজত
বাদর বিমান···"

বাঁকে বিহারীর মন্দিরে বাহিরের যারা আসে, ভক্তজন যারা, তারা তো ছিলোই, আর ছিল শিষ্যগণ, কর্মীগণ। সর্বোপরি স্বয়ং আচার্যজী। সুর লাগতেই সমবেত জন তরুণ রামতনুর গান বিস্মিত হ'য়ে শুনতে লাগল! এমন নয় যে রামতনুর গান তারা আগে শোনেন নি। কিন্তু আজ গীতের বিষয় এবং গায়কির প্রসাদগুনে ধীর গতিতে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'তে লাগল; ভাষার মাল্যে উপমার ফুল গেঁথে গেঁথে শ্রীমতী রাধিকার দিব্যোন্মাদ দশার ছবি যে ভাবে রামতনু ফুটিয়ে তুলতে লাগল,

সমবেত ভক্তজন তো বটেই স্বয়ং আচার্য হরিদাস স্বামীজিও সেই সুরে আর মেজাজে একেবারে মজে গেলেন। সেই ভাষার মাধুর্য্যের সঙ্গে সুরের যাদুর পরশ থেকে কারোই নিস্তার নেই।—নভোমণ্ডল নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হয়ে উঠলো, বনভুভাগও শ্যামলতমালতরুনিকরে হয়ে উঠলো অন্ধকারময়, সেই বাঁশির ধুন এমনই ভাবে ছেয়ে গেল শ্রীবৃন্দাবনে। উন্মাদিনী রাধিকা তাই ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, মোহান্ধ চিত্ত তাঁর বিহ্বল হয়ে পড়েছে; শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে অসহনীয় যন্ত্রনায় অবশেষে বিলাপ করছে শ্রীমতী। মনে হচ্ছিলো যেন স্বয়ং বাঁকে-বিহারী দেহধারণ করে আপ্লুত হৃদয়ে শুনছেন রামতনুর গান। সুরের আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়েছে আজ এই বৃন্দাবনের বাঁকে-বিহারীর মন্দির চত্বরে!

যথাযথ স্থানে ক্ষণিক বিরতির কলা-কৌশলে অতিশয় পারঙ্গম রামতনু। সুরের চমকও নয়, গমকের গম্ভীর গর্জনও নয়, এবার যেন বাতাসের পালে ভর দিয়ে রাধিকার বিলাপ ধ্বনি রুন্ রুনুন্ বোল্ তুলছে। সেই সঙ্গে রামতনুর হাতের তম্বুরাও যেন রুমম্ ঝ্মম্ সুরে সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি করছে! যেমন আরম্ভ, তেমনিই সুরের—বাহার দিয়ে শেষ। শ্রোতার দল স্তব্ধ বিস্ময়ে কতক্ষণ নির্বাক বসে রইলো। সকলেই যেন রামতনুর গানের মন্ত্রে বশীভূত, সমাবৃত, সমাহিত!

আর রামতনু! বড় বড় চোখ দুটি তার ঝক্‌ঝক্ করছে তখন গীত ও সুরের উন্মাদনায়! সমবেত ভক্তজন যখন সত্য সত্যই বুঝতে পারল' যে রামতনুর গান শেষ হয়েছে, সেই মুহূর্তেই গুঞ্জন সুরু হলো প্রশংসার! এমন গান আর কখনই শোনে নি তারা। ভাষা আর সুরের এমন মাতন্—যেন ঢেউয়ের মাথায় চেপে একেকবার চলে যাচ্ছে সুরের মাঝ-দরিয়ায়, আবার সেই ঢেউয়েরই চতুর্দ্দোলায় চেপে আপন আপন মনের রাজমহলে আসছে ফিরে!

রামতনু উঠে দাঁড়ালো আসন ছেড়ে। কোন কথা বলল না। কোন দিকে তাকালো না। সামনের দিকে ধীর পায়ে পায়ে এগিয়ে

গেল। একেবারে বাঁকে-বিহারীর সস্মিত মূর্তির সামনে। আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। তারপর ঘুরে পাশেই বসা আচার্যজীর পায়ে প্রণত হলো।

আচার্যজী আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে রামতনুকেও দাঁড় করলেন। বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। আর কত যে মধুর প্রেয় বচনে ওর প্রশংসা করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, "তোমাকে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। তবু বলি যখনই গাইবে, এমনি ভাবে নিজেকে উজার করে দিয়েই গাইবে। তুমি সঙ্গীতকলায় সিদ্ধ হবে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সিদ্ধ-পুরুষ হবে তুমি। এই আমার আশীর্বাদ।"

* * *

সুষুপ্তির গাঢ় আঁধারের বুকে চেতনার আলোকোন্মেষ হ'তে লাগল ধীরে ধীরে। জাগরণের সীমায় পৌঁছেও তিনি দেখলেন কিশোর রামতনু করজোড়ে জানু পেতে তাকিয়ে আছে গুরুদেবের দিব্য মুখগুলের দিকে। গুরুদেবের সস্মিত মুখ ক্ষণে ক্ষণে বাঁকে বিহারীর মুখের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অজস্র করুণাধারায় ঝরে পড়ছে তাদের আশীর্বাদ রামতনুর ওপর !......

......'আহ্!' তৃপ্তির সুনিঃশাস ফেলেই চৈতন্যে ফিরে এলেন তানসেন। প্রথমে ঠিক স্মরণ হলো না কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন। কেবল অনুভব করলেন তাঁর বুকের সঙ্গে লেগে বাম হাতের ওপর মাথা রেখে কেউ শুয়ে আছে। হাতের ওপর একটা ভিজে ভিজে অনুভূতিও হলো! কে?

মনের ভেতর প্রশ্ন জাগতেই চোখ মেলে তাকালেন তানসেন। দেখলেন। মুখে মৃদু হাসি ফুটল ওর। রূপবতী! অপর হাত দিয়ে ধীরে তার মাথায়, পিঠে বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। রূপবতী সুকেশী। খাটের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে কেশরাশি। মুখের যতটুকু দেখতে পেলেন তাতেই বুঝতে পারলেন যে রূপবতী কেঁদেছে। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে। তারই অশ্রুরাশিতে হাত ভিজেছে—

ভিজেছে শয্যাবরণ। অনেকদিন পর এমন একান্তে পেলেন রূপবতীকে।

হ্যাঁ। অনেক দিন নয়। অনেক বছর পর। রেওয়া থেকে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, লাহোর তারপর এই দিল্লী। মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছরই তো চলে গেছে। মনে পড়তে লাগল ওর অতীতের সেই দিন গুলির কথা।...

....গুরুদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সেই বিশবৎসরের কিশোর-যুবক চলে এসেছিলো গোয়ালিয়রে। তারপর! জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলি তো সেখানেই অতিবাহিত হয়েছে। কিশোর-যুবক থেকে সহসা পূর্ণ যুবকত্বে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তো সেখানেই রামতনু! সেখানেই তো ওর আকাঙ্খিত সাধনারও পূর্ণতালাভ। রেওয়া পর্ব তো তার পরে। সেখানেই রূপবতীর সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু তার আগে গোয়ালিয়রের কথা।

গোয়ালিয়র থেকে ওদের গ্রামের বাড়ী মোটেও বেশী দূরে নয়। মাত্রই চোদ্দ বা পনের ক্রোশ। শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে একবার বা দুবার ও এসেওছে গোয়ালিয়রে। এই পীর গওস সা' এর বাড়ীতেই। তবে সে সব কিছু ওর স্মৃতিতে নেই। তবু এত বছর পরে গোয়ালিয়রে এসেও পীর সা'-এর মোকাম খুঁজে নিতে ওর কোন অসুবিধা হয় নি। হয়নি তার কারণ পীর সা' এখানে অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রথম-জনই ওকে সঠিক পথ বলে দিয়েছিল। ওর মনে মনে অবশ্য একটা আশঙ্কা ছিলই। এতদিন একরকম পরিবেশে কেটেছে। এখানে এসে আবার কোন রকম পরিবেশে পড়বে, তা তো জানা নেই। মানিয়ে নিতে কত সময় যাবে কে জানে! অবশ্য পিতৃদেবের মুখে ও শুনেছে যে পীর সা' নিজেই একজন সঙ্গীত সাধক। সাধক হিসাবেও উচ্চকোটির তিনি। সুতরাং, ওর সাধনায়, দৈনিক রেওয়াজে বাধা না পড়ারই কথা। সেই বন্দোবস্তটুকু অবশ্যই পীর সা' করে দেবেন ওকে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে প্রাতঃ কৃত্যাদি সেরে নিয়ে বাঁকে-বিহারী এবং গুরুদেবকে স্মরণ করে রেওয়াজে বসা ওর নিত্যকার পূজার মত। তার কোনও ব্যত্যয়

তো মেনে নেবে না ও। এই সব ভাবতে ভাবতেই ও চলে এল
মোকামের সামনে। বলতে গেলে একা গাড়ীর চালকই ওকে নিয়ে এল।
সকলেই পীর সা-এর বাড়ী চেনে। ফকিরজী অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয়
শহরবাসী সকলেরই। দীন থেকে দীনতম নাগরিক এবং মহারাজা-
মহারাণী—সকলের সঙ্গেই তাঁর সমান পরিচয়। সর্বত্রই তাঁর অবাধ
গতিবিধি। কিছুদিন আগেই মহারাজা মান স্বর্গগত হয়েছেন। এখন
আছেন মহারাণী। তিনিও মহারাজাই মতই। অতিশয় দানশীলা।
প্রজাদের সুখ-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ান। কেউ কোন আর্জি নিয়ে
গেলে, কখনও বিফল হয় না। যেমন হোক, যতটুকু হোক, মহারাণী
তার পূরণ করেই দেন।

একাচালক নিজের মনেই এতসব কথা গড়্গড়্ করে বলে যাচ্ছিল।

রামতনু নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিল সত্য। তবে কিছু কিছু কথা
ওরও কানে ঢুকছিল বইকি। বৃন্দাবনে গুরুদেবের মুখেই তো শুনেছে।
তারপর সেই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাসও তো পড়েছে। সত্যিই,
সে এক অন্ধকারময় যুগই গেছে বটে। অন্ততঃ ভারত-সঙ্গীত বা
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সে এক চরম বদ্ধ দশার কাল। বস্তুতঃ মোগল ও
পাঠান রাজত্বের সন্ধিক্ষণই-হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সব চেয়ে অন্ধকারময়
যুগ। ১৩০০ থেকে ১৫০০খৃষ্টাব্দ। পাঠান সাম্রাজ্যের অবসান।
বৈজুবাওড়া, নায়ক গোপাল এবং আমীর খুসরৌ-এর তিরোধান।
তারপর দুশ' বছর, হ্যাঁ, দুশ' বছর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা বা
অনুশীলন একেবারে বন্ধ হয়েই গেছল। কেবল চর্চা নয়, প্রাণস্পন্দনই
প্রায় বন্ধ হয়ে গেছলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের।

গুরুদেব বলতেন যে একটা যুগ সম্বন্ধে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সেই
যুগের পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস জানারও প্রয়োজন হয়। তা না হলে
যুগ পরম্পরার ধারণা অস্পষ্ট রয়ে যায়। শিল্প ও সভ্যতার সব ক্ষেত্রেই
এ কথা সমান সত্য। সে সঙ্গীত, সাহিত্য বা ধর্ম যে ক্ষেত্রেই হোক না
কেন। সব ক্ষেত্রেই কোন না কোনও সময় একটা অচলাবস্থা আসেই।
তখন আর কারোরই কিছু করার থাকে না। অবস্থার ঘটে অত্যন্ত

অবনতি। পরিবেশ এত মলিন ও তমোগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে সাধারণ মানুষ আর কোনও দিশা খুঁজে পায় না। নেতৃত্ব দেবার মত মানুষেরও ঘটে চরম অভাব। সকলেই তখন অগত্যা গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী এই রকম টাল্‌মাটাল অবস্থায় নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। নেতা হয়ে বসতে চায়। কিন্তু যারা নিজেরা কোন বিদ্যা সুষ্ঠু ভাবে আয়ত্ব করেনি, তারা অপরকে কি শেখাবে ? ফলে দুর্দৈব যা ঘটার তা ঘটে। একটা অনুকরণ বৃত্তি হয়তো জাগিয়ে তোলে তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে। কিন্তু অনুকরণ দিয়ে তো শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। কোন আদর্শ নির্মাণ করাও অসম্ভব। সহস্র চেষ্টার পর এক আধ ক্ষেত্রে কেউ হয় তো বা নিজের বুদ্ধিবলে অভিনব একটা কিছু নির্মাণ করতে চেষ্টা করে ; কিন্তু আখেরে পণ্ডশ্রমই সার হয়। কদাচিৎ ভাগ্যের বশে একটা ক্ষেত্রে হয়তো কেউ সফল হয়। জানবে যে এই রকম অজ্ঞানকৃত সফলতাকেই বলা হয় অশিক্ষিত পটুত্ব। ভবিষ্যত প্রজন্মের পক্ষে এই অশিক্ষিত-পটুত্বের পথ অত্যন্ত বিপদজনক এবং দিগ্‌ভ্রান্তিকর, বিপদজনক —কেন না, নতুন একটা কিছু করতে হবেই, এই রকম মনোভাবের বশবর্তী হয়ে কেউ একজন পায়েস রান্না করতে গিয়ে পেঁয়াজ রসুনের ফোড়ণ দিয়ে বসে ! পেঁয়াজ রসুনের ফোড়ন দিয়েও পায়েস রান্না করা যায়—যদি বিদ্যাটা জানা থাকে !

যাই হোক। শিল্পের ক্ষেত্রেও যখন এইরকম ঘটে, একটা চরম গ্লানির অবস্থা আসে তখনই আবির্ভাব হয় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কোন শিল্পীর !” বলতে বলতেই গুরুদেবের দু'চোখের মর্মসন্ধানী দৃষ্টি রামতনুর দুচোখের তারায় এসে বিদ্ধ হলো ! ভাবতে গিয়েই—এখন, এই মুহূর্তেও, রোমাঞ্চ হলো রামতনুর ! সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে চকিতে তড়িৎ প্রবাহ ওর মস্তিষ্কের কোষেকোষে বহে গেল ! ঠিক এমনি অবস্থাই, এমনি একটা অনুভূতিই সেদিনও হয়েছিল ওর যে মুহূর্তে গুরুদেবের চোখের দৃষ্টি তার দুচোখের ভেতরে এসে মিলেছিল। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠেছিল ! বুকের ভেতরটা কি এক আকুল তৃষ্ণায় ছট্‌ফটিয়ে

উঠেছিল ! মুহূর্ত মাত্র। গুরুদেবের দৃষ্টি সরে গেল ওর চোখ থেকে।
তিনি আবার বলতে লাগলেন। রামতনুও স্বাভাবিক হলো।

গুরুদেব বলছিলেন, "শ্রী কৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' ।—জগদীশ্বরের এই করুণা! এই মহিমা! যখনই কোনও অভাব দারুণ আকার ধারণ করে, যখন চারিদিকে কেবলই সব অন্ধকার মনে হয়, কোথাও কোনও চিহ্নই দেখা যায় না সামান্যতম উজ্জ্বল রশ্মির—ঠিক তখনই—তেমন সময়ই বুঝতে হবে, আশার আলো জ্বলবার আর দেরী নেই। এই রকম চরম অবস্থাই অভ্যুত্থান এবং পতনের পূর্ব নিদর্শন। এই জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য সৃষ্টিরই এই রহস্য।" ঈশ্বরের কৃপা তো কাল সাপেক্ষ। কাল আসন্ন না হলে তো সেই কৃপা বর্ষিত হয় না। আর যখন সে কৃপা বর্ষিত হয়, তা সেই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যাক্তির মাধ্যমেই হয়। আসলে, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সূক্ষ্ম জগত শক্তিরই লীলাযন্ত্র ; তাঁরা দেবতাদের বাহন মাত্র। কিন্তু—

কিন্তু, গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহ সেই রকম যুগন্ধর পুরুষ নন্। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর হাতেই সম্প্রতি ঘটেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরুত্থান। তিনি রাজা হলেও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। কয়েকটি রাগেরও সৃষ্টি করেছেন তিনি—এমন কথাও শুনেছি। তিনি আরও বলেছিলেন রামতনুকে। তুমি তো গোয়ালিয়রে যাচ্ছই। ওঁর সম্বন্ধে আরও কিছু হয় তো জানতে পারবে।···

গুরুদেবের বাক্য অভ্রান্ত। গোয়ালিয়রে এসে রামতনু কেবল যে রাজা মানসিংহ সম্পর্কেই জেনেছে, তা নয়, একেবারে রাজার খাস মহলেই তো ওর—

ওর চিন্তা ধারাকে ছিন্নকরে একটি মধুর স্বর ভেসে এল। —"বেটা-তান্নু! এখানে একা বসে কি ভাবছো? এখানে তোমার কোনওরকম তক্‌লিফ্ হচ্ছে না তো? তোমার কোন রকম অসুবিধা হলে, আমাকে বলতে যেন শরম করো না। তোমার মা-বাবা নেই। কিন্তু আমি থাকতে তোমার কোন চিন্তাও নেই।" হজরত গওস স্বভাবতঃই মধুর স্বরে কথাগুলি বললেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে প্রণাম করল রামতনু। বলল, "না, না, পিতাজী! আমার এখানে কোন অসুবিধাই নেই। আমি এখানে খুবই ভাল আছি। অন্য একটা কথা ভাবছিলাম, পিতাজী!"

—কি কথা, বেটা? আমাকে বল? বে-ফিক্‌র (অকপটে) বল?"

"পিতাজী, আমি বৃন্দাবনে থাকতেই গুরুদেবের মুখে গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহজীর কথা শুনেছি। তিনি সঙ্গীত প্রিয় তো ছিলেনই, নিজেও ছিলেন একজন মান্য গায়ক, ওস্তাদ গায়ক। শুনেছি যে দুশো বছরের ওপর যখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা একদম বন্ধ হয়ে গেছলো বা যাবার মুখে, সেই সময় তিনিই আবার নতুন করে, নতুনভাবে সেই মরা গঙ্গায় জোয়ার বহিয়ে দেন। অনেক গুলো রাগেরও সৃষ্টি হয়েছে তাঁর প্রসাদে! কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি আসার আগেই কাল তাঁকে গ্রাস করে নিল। সে যা হোক। তিনি নেই। কিন্তু তাঁর সুযোগ্যা পত্নী, মহারাণীজী মৃগনয়ণী তো এখনও আছেন। শুনেছি, মহারাণীজী নিজেও অতি উৎকৃষ্ট গায়িকা। সঙ্গীত বিদ্যায়, সঙ্গীত-শাস্ত্রে অসামান্যা বুৎপত্তিশালিনী! তাঁর সঙ্গীত সভায় বহু গুণীজনের সমাবেশ ঘটে এখনও। বিশেষ চর্চা, অনুশীলন এখনও তিনি সমানভাবে করে যাচ্ছেন। আমার তাই বড় সাধ একবার তাঁর গান শুনি। পিতাজী! আপনি কি তার কোনও উপায় করে দিতে পারেন?" বলে সাগ্রহে হজরতজীর মুখের দিকে তাকালো রামতনু।

হজরত গওস্‌জীর সুন্দর মুখে অম্লান হাসি ফুটে উঠল। তাঁর দুধের মত আস্কন্ধ লম্বিত কেশরাশিতেও যেন দোলা লাগল। ছেলে মানুষ রামতনু আর কেমন করে জানবে! মহারাণী সা'-এর দরবারে তাঁর যে কি অতুল প্রতিপত্তি, তা জানে গোয়ালিয়রবাসী প্রতিটি নাগরিক। ধনী, দরিদ্র সবাই। তাঁর কথা টাল্‌বেন না মহারাণী কখনই, কোনভাবেই না। বরং তাঁর অনুরোধ নয়, আদেশ পালন করতে পারলে মহারাণী নিজেই কৃতার্থ বোধ করবেন। মানসিংহের বিধবা পত্নী, মৃগনয়ণী কেবল রূপসীই নন্‌, গুণেও একেবারে সাক্ষাৎ সরস্বতী! রাগ-রাগিনী তাঁর যুথ নিসৃত হয়ে যেন খেলা করে। এমনই

দক্ষতা, নৈপুন্য তিনি অর্জন করেছেন। তবুও তো নারী মৃগনয়নী। মাঝে মধ্যে স্বামীর কথা ভেবে কেমন উদাস হয়ে যান। সেইসব সময়গুলোতে হজরতজী স্বয়ং মহারাণীকে বিভিন্নশাস্ত্র থেকে নানা উপদেশাত্মক কথা, দুঃখকে জয় করার বিভিন্ন উপায়, মনের শান্তি বজায় রাখতে কেবল কর্ম, সাধনা করে যাওয়া ইত্যাদি নানাভাবে বুঝিয়ে তাকে শান্ত করেন। কিংবা, কোন গভীর দার্শনিক বিষয়ের জটিল দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তাতে ফলটা ভালই হয়। মহারাণীও হজরতজীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। হজরতজীও তো তাই চান! কারণ, এ ভাবেই মহারাণীর মনের ভার লাঘব হয়। তিনি আবার স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেন। নিত্যকার কাজ কর্মে মনোযোগী হন। রাজদরবার, লোকজন, গুণী-মানুষের আনাগোনায় আবার সরব হয়ে ওঠে! যা হোক, সে সব গোপন কথা। রামতনুর সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। আচার্য হরিদাস স্বামীজী ঠিক কথাই বলেছেন রামতনুকে। মহারাজ মানসিংহ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুণরুদ্ধার করেছেন, বদ্ধ জলাশয় থেকে বাইরে নিয়ে এসেছেন মুক্ত হাওয়াতে, প্রাণ সঞ্চার করেছেন প্রায় মৃত সঙ্গীতের শরীরে এ সবই সত্য; কিন্তু পুরোটা সত্য নয়। সে কথাই তিনি রামতনুকে বুঝিয়ে বলতে চাইলেন।

হজরতজী সস্নেহে রামতনুর দিকে চেয়ে বললেন, "বেটা! রাণী-মৃগনয়ণীর গান শুনবে, সে তো ভাল কথা। সে বন্দোবস্ত আমি করে দেবো। এ ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না আমার। তবে তোমাকে আগেই বলে রাখি তিনি সামান্যা মহিলা নন। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের পুনরুত্থানে কেবল মহারাজা মানসিংহই নয়, মহারাণী মৃগনয়ণীও একজন অগ্রদূত, এ তথ্যটা তোমার জেনে রাখা ভাল। তিনি নিজেই একজন রাজকন্যা-গুর্জর-রাজকন্যা, অর্থাৎ গুজরাটের রাজকন্যা। সঙ্গীত কলায় দক্ষতা তাঁর অসামান্য। সিদ্ধকাম তিনি। যেমন ছিলেন মহারাজা মানসিংহ। মহারাজা বেশ কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করে গেছেন, তা তো জানই। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো— মালব-গুর্জরী, মঙ্গল-গুর্জরী এবং বাল-গুর্জরী ইত্যাদি। তা ছাড়া,

তাঁর দরবারে যারা আসেন, তারাও সকলেই সঙ্গীত-গুণী। সর্বোপরি, রাণীজীর সাক্ষাৎ কয়েকজন শিষ্য এবং শিষ্যা আছে। তারা রাজপ্রাসাদেই থাকে। মহারাণী তাদের আপন পুত্র-কন্যাবৎ পালন করেন। তাদের তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন, পঠন-পাঠন এবং অবশ্যই সঙ্গীত শাস্ত্রেও দক্ষ করে তুলেছেন। তারাও কেউ সামান্য নয়। মোটামুটি এটুকুই তুমি জেনে রাখো এখন। তবে, তুমিও প্রস্তুত থেকো। মহারাণীজীর গান তুমি অবশ্যই শুনতে পাবে। তোমাকেও কিন্তু গাইতে হ'তে পারে। মহারাণী তোমার গান না শুনে ছাড়বেন না। পারবে তো মান রাখতে? কেবল তোমার নিজের নয়; আচার্যজীর মান রাখার দায়ীত্বও তো তোমারই! কেমন! ভয় পাচ্ছো না তো?" হজরত গওস্ রামতনুর দিকে তাকালেন।

রামতনু মাথা নুইয়ে সসম্মানে বলল, "পিতাজী! আপনার এবং—বুজুর্গদের (জ্যেষ্ঠ) আশীর্বাদে আমি যতটুকু আয়ত্ব করতে পেরেছি, তা সঠিক ভাবে পেশ করতে আমার কোন ভয় নেই। আমি তো কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছি না। আমি নিজেকে এখনও শিক্ষানবিশ বলে মনে করি। মহারাণী তো বটেই, আরও যাঁরা সঙ্গীতবিদ্ দরবারে আসেন, তাঁদের সকলকেই আমি আমার বুজুর্গ বলে মনে করি। আমাকে যদি গাইতে বলাই হয় তো আমি অবশ্যই গাইবো। যদি ত্রুটি ঘটে তো আমি সকলের পায়ের কাছে বসে তাদের নির্দেশ ভিক্ষা করবো। তাঁরা যা উপদেশ দেবেন, মাথা পেতে মেনে নেবো; সংশোধন করে নেবো।"

রামতনুর কথা শুনতে শুনতে বৃদ্ধ গওস্জী আবেগে উঠে দাঁড়ালেন। আর একবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রবৎ রামতনুকে: "বেটা! তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। এই বিনয়, শিষ্টতা, এই নিরহঙ্কার, এই গুলিই মহৎ, বড় প্রাণের লক্ষণ! তুমি অনেক উচ্চে উঠবে, বৎস! অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাও! তোমার মনস্কাম পূর্ণ হোক!

সেই প্রথম দিনের কথা—রাণী মৃগনয়ণীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের

দিনটির কথা মনে পড়ে আজও, এই ক্ষতিগ্রস্ত জীর্ণ শরীরেও, রোমাঞ্চ হলো ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীত কেশরী তানসেনের! আজ কত যুগ পরে, বুকের সঙ্গে সংলগ্না, নিদ্রায় আচ্ছন্ন রূপবতীর কেশরাজি এবং পৃষ্ঠদেশে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি আবার ফিরে গেলেন প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে, গোয়ালিয়রের সেই দিনগুলিতে, ঘরের আলো-আঁধারি পার হয়ে তার মনের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠলো।

.... সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে হজরত গওসের সঙ্গে বিশ বৎসরের রামতনু উপস্থিত হলো মহারাণীর সঙ্গীত দরবারে। হজরতজীর জন্য নির্দিষ্ট আসনের পাশেই ওর স্থান হলো। একে একে উপস্থিত হলেন সেদিনকার নির্দিষ্ট কয়েকজন ওস্তাদ গাইয়ে এবং বাজিয়েরা। একটু পরে এলেন স্বয়ং মহারাণী।

মহারাণীর দিকে তাকাতেই বিংশতি বর্ষীয় রামতনুর মস্তিষ্কের মধ্যে ভয়ঙ্কর শব্দে এক বিস্ফোরণ হলো! আর তার তরঙ্গমালা শরীরের প্রতিটি কোণে, কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়লো। অতিকষ্টে নিজের বেপমান শরীর সংযত করে বসে রইল। তাকিয়ে থাকতে পারল না বেশীক্ষণ মহারাণীর দিকে। চক্ষু আপনিই নত হয়ে ফিরে এল। মহারাণীও ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখেছিলেন। কেন যেন অপরিসীম একটা লজ্জার ভাব রামতনুর মনে জেগে উঠল। ঠিক বুঝতে পারল' না ও। ওর ওই সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় মহারাণী এগিয়ে এলেন। ওর কাছে নয়। হজরত গওসজীর কাছে। তবু রামতনু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মহারাণী তস্‌লিম আদাব করলেন গওসজীকে।

গওস সা' হেসে মহারাণীকে আশীর্বাদ করে বললেন, "রাণীমাতা! এই সে ছেলে রামতনু। আচার্য হরিদাস স্বামীজীর কাজে বৃন্দাবনেই ছিল এতদিন। সম্প্রতি মা-বাবা দুজনই কাশীধামে দেহ রেখেছেন। আসলে, এই গোয়ালিয়রেরই ছেলে রামতনু। এখান থেকে ক্রোশ চোদ্দ দূরে বিহট গ্রামে ওদের আদি বাড়ী। ওর বাবা-মা দুজনেই আমার শিষ্য ছিল। এখন তারা কেউ নেই। ওর বাবা, মুকুন্দরাম

পাঁড়ে, মরবার আগে এই ছেলেকে বলে গেছে আমার কাছে আসতে। তাই ও এসেছে। এই ছেলে এখন আমারই বলতে পারো রাণীমাতা। তা ও এখানে আসার আগে তোমার গানের খুব সুখ্যাতি শুনেছে। এখানে আসবার পর থেকেই আমাকে বলছিল যাতে তোমার গান শোনার সুযোগ হয়।"

এমন দেবী মূর্তির মত রূপ আর কখনও দেখেছে বলে, এত কাছ থেকে দেখেছে বলে মনে করতে পারলো না রামতনু। ওর দেখার জগতে ওর নিজের মা ছিল সাক্ষাৎ দূর্গামায়ী! ওর মায়ের কাছেও কেউ সেদিক থেকে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু, যাঁকে ও, এই মুহূর্তে দেখছে, ওরই সামনে দাঁড়ানো! হুজরতজীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখের তারা দুটি ফিরিয়ে দেখছেন মাঝে মাঝে ওর দিকে। এমন দুটি চোখই তো রামতনু জীবনে এই প্রথম দেখছে। মহারাণী মৃগনয়নী, হ্যাঁ, মৃগনয়নী মহারাণী! ভাবতেই ও অনুভব করলো যে ওর কান দুটি লাল হয়ে উঠছে। তখনই মহারাণী ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে সোজা তাকালেন। মুখে তাঁর মৃদু মধুর হাসি। রামতনু ঝুঁকে পড়ে মহারাণীর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

মহারাণী পা সরিয়ে নিতে গিয়েও কি ভেবে প্রণাম গ্রহণ করলেন। এই অনিন্দ্যসুন্দর, সদ্য যুবকের থেকে দ্বিগুন বয়স তো তার বটেই। তিনি রামতনুর দুই বাহু ধরে তুলে মুখো মুখি দাঁড় করালেন। ওর চিবুকের নীচে হাত দিয়ে ছুঁয়ে নিজের দুই রাঙা ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। মধুর স্বরে হেসে বললেন, "আমি তো গান গাইবো। কিন্তু তোমাকেও আমাদের গেয়ে শোনাতে হবে। কেমন?"

সলজ্জ হেসে মাথা নাড়লো রামতনু।

"বসো!" বলে নিজের আসনে ফিরে গেলেন মহারাণী। বসবার পর মহারাণী সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর বাঁ দিকের ধনুক-ভ্রূ-তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিল। একজন যুবতীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "নির্মলা, হোসেনী আসে নি?"

নির্মলা নামে যুবতী সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, "না, রাণীমা। সংবাদ পাঠিয়েছে যে সে অসুস্থ। সামান্য জ্বর হয়েছে।"

"আচ্ছা। তবে আমরা আজ আরম্ভ করি। নির্মলার বীণ্‌বাদন দিয়ে সুরু হোক আজ। লালা জোত্‌সিংহজী! আপনি পাখোয়াজ ধরুন! এর পর আমি গাইব। তারপর আমাদের আজকের আসরে নবীন অতিথি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।"

উপস্থিত পাঁচজন ওস্তাদই সহর্ষে সায় দিল মহারাণীর কথায়।

নির্মলা নামে যুবতী বীণ্‌ বেঁধে প্রস্তুত হলো। লালা জোতসিংহও পাখোয়াজ কোলে নিয়ে বসলেন। মুহূর্তে পরিবেশ বদলে গেল আসরের।

নির্মলা নামে যুবতী আলাপ সুরু করল। বীণ্‌বাদন বেশ কঠিন ক্রিয়া। বেশ শক্তির প্রয়োজন। এর আগেও রামতনু বীণ্‌বাদন শুনেছে। বীণ্‌বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ও গানও গেয়েছে। বৃন্দাবনে, বাঁকে বিহারীর—মন্দির সেদিক থেকে ছিল গায়ক-বাদকদের মিলন স্থল। গুরুদেব নানাস্থান থেকে ওস্তাদদের এনে বৎসরে একদিন আসর বসাতেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই শিষ্যদের আরও পরিণত' অভিজ্ঞ করে তোলা। সেদিক থেকে একমাত্র রামতনুই লাভবান হয়েছিল বেশী। আচার্যজী নিজেও তা জানতেন। একটি আসরের কথা এখনও মনে পড়ে রামতনুর। কাশী থেকে এসেছিলেন ওস্তাদ বীণ্‌কার ঘনশ্যাম দাসজী। আচার্যজীর আদেশে রামতনু ধ্রুপদ গেয়েছিল। পাখোয়াজ নিয়ে বসেছিলেন স্বয়ং গুরুদেব। যে পদই ও গায়, তৎক্ষণাৎ তাই বাজিয়ে শুনিয়ে দেন ঘনশ্যামজী। বীণ্‌বাদনের অমন সুন্দর ঠোক্‌, অমন চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছলো কিশোর রামতনু। অবশ্য গানের শেষে ঘনশ্যামদাসজী নিজে ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে এক মধুর অভিজ্ঞতা কিশোর রামতনুর জীবনে।

নির্মলাও খুব খারাপ বাজাচ্ছে না। শ্রী রাগ ধরেছে নির্মলা। কিন্তু ওর ঠোক্‌গুলিতে তেমন বলিষ্ঠতার পরিচয় নেই। সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই। এখনও তার শিক্ষা পর্ব চলেছে। অবশেষে তার বাজানো

শেষ হলো। বীণ্ ঢেকে রেখে এক পাশে গিয়ে বসল নির্মলা। মহারাণী স্বয়ং এবার আসন গ্রহণ করলেন। নির্মলাই তম্বুরা নিয়ে পাশে বসল।

সারেঙ্গী ধরলেন ইব্রাহিম খাঁ। এবং তবলায় বখ্সু আলী।

মহারাণী গায়ন আরম্ভ করলেন। অতি উচ্চকোটির সাধিকা মহারাণী। আলাপ সুরু করতেই রামতনু তাঁর মধুর স্বরালাপে ক্রমশঃ মুগ্ধতার আবেশে তল্লীন হয়ে গেল। একেকটি স্বর এক একটি মুক্তার মত ঝরে ঝরে পড়তে লাগল মৃগনয়নীর কণ্ঠ হতে। সেই সঙ্গে তম্বুরার গুঞ্জন এবং তবলার ধ্বনি মিশে এক নূতনতর আত্মীয়তার বন্ধন! সা, গা, মা, পা, নি স্বরগুলি বাণী, ছন্দ ও সুরের সঙ্গে নানা বিচিত্র তালে বহে চলেছে। মৃগনয়নীর স্বর্গীয় সে তান যেন দিব্যধাম থেকে উৎসারিত অলকনন্দার মত প্রবাহিত হয়ে, কেবল এই রাজদরবার নয়, বুঝি বা সমগ্র মর্ত্যলোককেই প্লাবিত করে দিচ্ছে। রাগ হিন্দোল আর তার পঞ্চ রাগিনী মিলে মিশে যেন সৃষ্টি করেছে এক সঙ্গীতের কল্পলোক! রাগ-রাগিণীর সেই অমরাবতী ধারায় অবগাহণ করে ধন্য হয়ে গেল রামতনু। মহারাণীজীর কণ্ঠে স্বরশ্রুতির খেলা বিদ্যুত চমকের মত ক্ষণে ক্ষণে গানের সুক্ষ্ম দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে তুলছিলো। মধুর, সূক্ষ্ম, সুললিত কণ্ঠে মৃগনয়নী যেন সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন সোনার হিন্দোলায় উপবিষ্ট অল্পবয়সী সেই সুন্দর তরুণটিকে। যে দুলতে দুলতে সুন্দরীদের সঙ্গে মনোরম আলাপে ব্যস্ত এবং তাদের সঙ্গে আমোদ আহলাদে মশগুল। ওদিকে সুন্দরী নায়িকা প্রতীক্ষায় কাল গুনছে। আলুলায়িত কেশ। ক্রোধে আরক্ত মুখমণ্ডল। একহাতে কৃপান। বাহুতে ও বক্ষদেশে মল্লদের মত মর্দিত মৃত্তিকার অবলেপন। নায়ক কেন অপর স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করে নানান বাহানা করছে! শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে! নায়ক তখন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে চলে যাবার বাহানা করে লুকিয়ে পড়েছে। নায়িকাও তখন অস্ত্র ফেলে দিয়ে বিরহে আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে। সারাক্ষণ অস্থির অস্থির। একাকিনী গৃহে বসে আছে বিষাদময়ী প্রতিমার মত। ক্রমে শরীর কৃশ। নায়কের

পরানো ফুলমালা শুকিয়ে গিয়ে তার দুঃখের মত দুলছে গলায়। নায়ক কি ফিরে আসবে না?···

গান শেষ হবার পরও কতক্ষণ স্তব্‌ধ হ'য়ে বসে রইল রামতনু! ওর বুঝতে বাকী রইল না যে এই মহীয়সী রমণী অপার গানের সাগর! তাতে ডুব দিয়ে মণি-মাণিক্য তুলে আনতেই হবে ওর! ও মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করলো। এবার ওর পরীক্ষা। না। রামতনু এতটুকুও ভীত নয়। বরং আত্মবিশ্বাসে অটল।

গান শেষ করে মহারাণী সর্বাগ্রে রামতনুর দিকে ফিরে তাকালেন। রামতনুর মুগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি মিললো। মনে মনে তৃপ্তি বোধ করলেন মহারাণী মৃগনয়নী! এই নবীন তরুনের চোখে মুখে এক ভুবনজয়ী প্রতিভার স্ফূরণ দেখলেন তিনি। তাঁর হৃদয় কন্দরে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হলো! তার মনে হলো এই তরুণ এক আশ্চর্য্য আধার! তাঁর প্রিয়তম স্বামী, মহারাজা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরোত্থান করে যে ধ্রুপদী ঐশ্বর্য্য রেখে গেছেন, এই তরুণ সেই ঐশ্বর্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এই তরুণই তাঁর ঐতিহ্যের পতাকা কেবল বহনই করবে না, পারবে তাকে আরও উচ্চে তুলে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু এই বিশ্বাস দৃঢ় হবার আগে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দেখতে হবে যে তাঁর অনুমান যথার্থ কি না।

মৃগনয়নী নিজে উঠে গিয়ে রামতনুর হাত ধরে এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। উপস্থিত সবার মাঝখানে। তারপর সকলের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। যতটুকু জেনেছেন হজরত জীর কাছ থেকে ততটুকুই। রামতনু সকলের দিকে করজোড়ে প্রণাম জানালো। সবাই সাগ্রহে ওর দিকে তাকালো। সকলেই দেখল এই সদ্য তরুণ অতিশয় রূপবান। কিন্তু এর গানের অন্তরটিও কি এমনি সুন্দর। এই এই ক্ষণে প্রশ্নই সবার মনে। মহারাণীর সঙ্গে যারা বিভিন্ন যন্ত্রে সঙ্গত করেছিলেন, রাণীর অনুরোধে তারাই রামতনুর গানে সহায়তা করতে আপন আপন যন্ত্র নিয়ে বসলেন।

রামতনু ধ্রুপদে আলাপ সুরু করলো। মুহূর্তে দরবারের পরিবেশ

পাল্টে গেল! সকলেই যে যার আসনে নড়ে চড়ে বসলেন। ধ্রুপদ তো কেবল ছন্দোবদ্ধ পদই নয়, তান তাল মিলিয়ে যার রচনা, সেই তান তাল নিয়ন্ত্রন করাও সহজ কাজ নয়। উঁচু জাতের ওস্তাদের পক্ষেই ভালভাবে তা করা সম্ভব। কল্পনা শক্তির প্রয়োজন ধ্রুপদে যতটুকুই থাক না কেন, সভার মধ্যে তার যথার্থ রূপটি মনে এনে যথার্থ রূপে সেটিকে পেশ করা—যার তার কাজ নয়। গুরুদেব যেমন তান ধরিয়ে দিয়েছেন, তেমন ভাবেই এগিয়ে যাওয়া কাম্য। কিন্তু গায়ন-বৈশিষ্ট ? সে তো গায়কের নিজেরই! আগে থেকেই যে কিছু ভেবে স্থির করে নিয়েছে রামতনু, তা নয়। ও স্বতঃই দেশীয় রীতিতে, যা কিনা মহারাজা মানসিংহ প্রচলিত করে গেছেন, সেই চারকলিতে নিবদ্ধ —সব রাগ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে এই যে বিস্ময়কর সৃষ্টি, সেই রীতিতেই আলাপ সুরু করে ক্রমে ক্রমে ধুয়া ও আভোগে এসে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছে গেল! আসরের সবাই একযোগে তারিফ করে উঠলো। বিশেষতঃ, উপস্থিত সব ওস্তাদই এই নবীন যুবকের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন যেন! তারা নিজের কানে না শুনলে, হয়তো, হয়তো কেন—নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন না। ধ্রুপদ গানের সমগ্র স্থায়ীপদ—স্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদি চারটি তুক্ই যে এভাবে এক নিঃশ্বাসে গান করা যায়, এ একেবারে ধারণাতীত, অবিশ্বাস্য! অথচ সেই ঘটনাটাই ঘটালো এই অপরিচিত নবীন যুবক! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! শত কণ্ঠে তারা রামতনুর প্রশংসা করতে লাগলেন।

আর মহারাণী মৃগনয়নী! রামতনুর গানের আলোতে তাঁর মৃগনয়নে স্মৃতির প্রতিফলন ঘটে। স্বামীর কথা মনে পড়ে তাঁর! এই নবীন যুবক যেন সেই মহারাজা মানসিংহ, কিংবা তাঁর যথাযোগ্য উত্তরসূরী! পারলে এই যুবকই পারবে স্বামীর স্মৃতির পতাকা আরও আরও উর্ধে তুলে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ কথা তো তিনি শুনেছেন, জানেন যে যুবক আচার্য্য হরিদাস স্বামিজীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। গওস সাই' বলেছেন। এতদিন—এতবছর স্বামীর বেদনাময় অস্তিত্বের স্মৃতি

নিয়েই বেঁচে রয়েছেন তিনি! এভাবেই তাঁর আয়ুষ্কাল কেটে যাবে, তারই মাঝে মাঝে যদি এক আধজন শিষ্য বা শিষ্যা ওপরে উঠে আসে, স্বামীর গানের ধারা তাহলেই বহমান থাকবে—এমনটাই ভেবেছিলেন মৃগনয়নী। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, মৃগনয়নীর মনে হচ্ছে অস্তিত্বের বেদনার চেয়েও অস্তিত্ব বড়। তাই তো আজ এত সুখের ধারা মনের আল্ ভেঙ্গে খরস্রোতে বেরিয়ে আসছে। রামতনুর মধ্যে তিনি যেন তাঁর সমগ্র সত্তাকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করলেন। আনন্দে জেগে উঠলো বুঝি তাঁর হৃদয়ের অতলগভীরে আচ্ছন্ন বিলাপ! এ কেমন বিলাপ! কিসের জন্য বিলাপ? কোন কিছুই এখনও স্পষ্ট নয় মৃগনয়নীর কাছে। হয়তো বিলাপ নয়। শুধুই এক আনন্দ! ভীষণ আনন্দ আজ তাঁর হৃদয়ে! তিনি মুখে কিছুই বলতে পারলেন না অনেকক্ষণ!

তারপর এগিয়ে গিয়ে রামতনুর মাথায় হাত রাখলেন। রামতনু তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল আবার!

মহারাণী হজরত গওসের দিকে ফিরে বললেন: "ফকির সা'! আপনার এই ছেলেটি আমাকে দিয়ে দিন। আমার সঙ্গীতের দরবারে একে আমি প্রত্যেকদিন চাই! আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

হজরত গওস মৃদু হাসলেন। "মহারাণী? আমি ফকির মানুষ! আমি কি বুঝি দুনিয়াদারির? তবে দীন দুনিয়ার মালিক যিনি, তাঁর অহৈতুকি কৃপা আমি সব সময়ই পেয়েছি। আমার এই শেষ বয়সে এই ছেলেটা ফের আমার কাছেই ঘুরে চলে এসেছে! তা আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেছলাম ঠিকই। এখন আপনার কথা শুনে আমি আরাম পেলাম! তান্নোবেটা তো আপনারও পুত্রের মতো। ও যদি চায়, যদি ইচ্ছে করে, তবে রোজই এখানে আসবে। নিশ্চই আসবে। আপনার কাছ থেকে এখনও ওর বহু কিছু শেখবার আছে। আর এ কদিনেই আমি যা দেখেছি—গানের বিষয়ে ওর যা কৌতূহল, যে ভীষণ ক্ষুধা; তার সবটুকু মেটাবার ক্ষমতা আমার আর নেই। একমাত্র আপনারই সেই ক্ষমতা আছে, মহারাণী। তান্নোবেটা আসবে

নিশ্চয়ই আসবে। আপান না বললেও ও নিজেই আপনার কাছে বলতো। কি তান্নো বেটা! আমি কি ভুল বা মিথ্যে বলছি কিছু?'

রামতনু সলজ্জ হেসে মাথা নাড়ল।

মৃগনয়নী এবার সোজা রামতনুর দিকে তাকিয়েই বললেন, "এসো, তুমি রোজই এসো! কি! আসবে তো?"

আসলে রামতনুর কথা বলার তেমন অভ্যাস তো নেই। এতদিন ও আশ্রম-জীবন অতিবাহিত করেছে। শাস্ত্র পাঠ ও সঙ্গীতের সাধনা। তাতেই ও নিমগ্ন ছিল। কথা বলার অবকাশ তো আশ্রম-জীবনে ছিল কমই। তাই সহজেই ও আপ্লুত হ'য়ে যায়, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! ও সরলভাবে বলে উঠল, "আপনি না বললেও আপনার কাছে আমিই প্রার্থনা জানাতাম। আমাকে আপনার সামান্য সেবক বলেই জানবেন। আপনি অনুমতি দিলেন। তাই আমি কৃতার্থ বোধ করছি। আমি অবশ্যই আসবো। প্রত্যেকদিন আসবো। শুধু আসবো না। আপনার পায়ের কাছে বসে আমি শিখবো। আপনি এইটুকু কৃপা আমাকে করবেন। আমি আপনার আভারি (কৃতজ্ঞ) থাকবো।"

···মহারাণী মৃগনয়নীর সঙ্গীত মন্দিরে অতি দীন সেবকের মত নিত্য যাতায়াতে ক্রমশঃ সহজ হয়ে এল রামতনু। মৃগনয়নী ধীরে ধীরে এই সদ্য-কৈশোরোত্তীর্ণ-যুবকের সঙ্গীতে অসামান্য বুৎপত্তি আবিষ্কার করে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। তাঁর পূর্ব অনুমান যে ভুল নয়, স্বামীর রেখে যাওয়া ঐতিহ্যের যে এই ছেলেটি যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে, এই ভাবনাটি তাঁকে ভেতরে ভেতরে উল্লসিত করে তুললো! তিনি অবশ্যই জানেন যে রামতনু নামে এই ছেলেটি স্বামিজী হরিদাসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কিন্তু রামতনুর সঙ্গে এ কদিনের কথাবার্তাতেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আচার্য্য হরিদাসজী কোন সঙ্কীর্ণ মন ওস্তাদদের মত নন! তিনি সাক্ষাৎ দেবর্ষি নারদ! তাঁর মধ্যে ঐ রকম সঙ্কীর্ণতার কল্পনা করাও পাপ। সে চিন্তা মৃগনয়নী করেনও নি। তবুও রামতনুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যখন নিশ্চিত করে জানলেন যে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি, ইতিহাস, বিশেষ করে সঙ্গীতের

ইতিহাস নিয়েও আচার্যজী তাঁর এই শিষ্যটির সঙ্গে প্রভূত আলোচনা করেছেন। পড়তে অনুরুদ্ধ করেছেন। এবং মহারাজা মানসিংহ যে ধ্রুপদ সঙ্গীতের নতুনতর বৈশিষ্ট প্রদান করেছেন, তাও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। শিক্ষাদানও করেছেন সেই পদ্ধতিতে। তখন মৃগনয়নীর প্রাণে এক অভূতপূর্ব নবোল্লাসের সূচনা হলো! তিনি নতুন আধার পেয়ে একেবারে মেতে উঠলেন। ক্রমে আবিষ্কার করলেন যে রামতনুর কেবল কণ্ঠসঙ্গীতেই নয়, কয়েকটি যন্ত্রেও সমান পারদর্শী। যেমন তত্‌ বা তারের যন্ত্র—বীন্‌; কানুনে দক্ষ রামতনু; তেমনি বিতত্‌ বা চর্মাবৃত যন্ত্র—মৃদঙ্গ, ঢুহুল এবং দায়েরা বাজাতেও অতিশয় পারঙ্গম! তাঁর সুখের আর অবধি রইলো না! কোন সার্থক যন্ত্রবাদকের পক্ষে যেমন গান জানা জরুরী; তেমনই সার্থক গায়কেরও দু'একটি যন্ত্রবাদ্যে দখল থাকা সমানভাবে কাম্য। রামতনুর এই গুণ দুটিই যে কেবল আছে, তাই নয়, বরং অতিবেশী পরিমাণেই আছে। সন্দেহ নেই, কালে এই যুবক হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের এক বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। এর কৌতূহল, এর অনুসন্ধিৎসার পারাপার নেই। তা ছাড়া, রামতনুর গলার স্বর বা আওয়াজ গাঢ়, ঘন—প্রাণশক্তিযুক্ত, ভরাট। সর্বোপরি, মিষ্ট ও মধুর কণ্ঠ ওর অনায়াসেই মন্দ্র, মধ্য, তার-এ পরিব্যাপ্ত হয়। এক কথায়, সার্থক বাগ্‌গেয়কার বলতে যা বোঝায়, রামতনু তাই। মহারাণী মৃগনয়নী প্রতিদিন নিজেকে উজার করে দিয়ে রামতনুর শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন। রামতনুও শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে লাগল। মৃগনয়নীর আওয়াজের সাম্য-বৈষম্য সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান, তেমনিই শাস্ত্রে ও কলাশাস্ত্রে, প্রবন্ধগীত, প্রাচীন মার্গসঙ্গীত, এমন কি বাদ্য ও নৃত্যেও তাঁর অভিজ্ঞতা অতুল, অসীম। দেশী ভাষা এবং সেই ভাষার গীতেও তাঁর সমান পারদর্শিতা। তার ওপর অসামান্য বাকচাতুর্য এবং রসভাব!

রামতনু একেবারে অভিভূত হয়ে গেল, বশীভূত হয়ে গেল! ওর হৃদয়-মন্দিরে এক নব দেবীমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো! ওর অন্তর্গত অনুভবের জগতে এক মহা কলরোল জেগে উঠলো! যেমন পর্বত

জটার জটিল বন্ধন থেকে মহাবেগে নিষ্ক্রমন হয় নদীগুলির ; তেমনই ওর শরীরের বিস্তারিত সব ডালপালার মত শিরা-উপশিরা মহান্ আবেগে উত্তাল হয়ে উঠে ছুঁয়ে দেখতে চাইলো চিরায়ত সেই নদীটিকে। সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুপুঙ্খ ব্যপ্ত অবয়বটিকে যেমন ও উৎকীর্ণ করে রাখতে চাইলো উৎসারিত স্নায়ুর গোপন কুঠুরীতে ; তেমনই সেই দেবীমূর্তির পায়ে নিবেদিত প্রাণ, অর্ঘ্যপ্রদান করতে লাগল আপন-রচিত গীতের অঞ্জলীতে।

রামতনুর মনের গহণ থেকে উঠে আসে বাণীর ফোয়ারা ! গীতের পর গীত রচনা করে চলে ও। হৃদয়ের অদৃশ্য মঞ্চে কার নুপুর নিক্কণ বেজে যায় অনুক্ষণ। কে যেন ওর গানের ডাকে সারা দেয়। তাকে চেনে না ও। জানেও না কে। তবুও রাত্রিগুলি ভরে ওঠে নক্ষত্ররাজির স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটায়। ঘুম আসেনা। আসতে চায় না। ও উঠে বসে। কাগজের বুকে ফুটে ওঠে ওর মনের আর্তি !—তোমার হৃদয়ে এই হৃদয়, ছায়াঘন বনে বনে পাতা ঝরা কোমল মর্মর ; তোমার মনের আকাশে, আকাশের ভিটেতে শীতল জ্যোৎস্নালেপা মাটিতে স্নিগ্ধ-ধারায় শান্ত হোক তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়। ধরিত্রী রজঃস্বলা হলে ভাদরের বন্যার মত সুকান্ত ফসল তাকে আলিঙ্গন করে। নিশ্চিত আশ্রয়ের সুখে স্বপ্ন দেখে ! কিন্তু অশান্ত হৃদয় আমার স্বপ্ন দেখার স্বপ্নে বিভোর হওয়াতে—না, না ! তার চেয়ে তোমার দুবাহুর আশ্রয়ে' গিরিচূড়া সমাকীর্ণ উপত্যকার শীতল কল্লোলে. মুখোমুখি একতালে হোক আজ ঝুলন যাত্রা ! আর নয় তো চলো, কোন এক অজানা সমুদ্রের কাছে। যেখানে উল্লসিত ঢেউয়েরা বালুচরে ক্রমাগত চুম্বন করে। তোমার দেহের হিল্লোলে, বুকে বুকে, মুখেমুখে একতালে বাহুতে বাহুতে মিলিয়ে দাও গাঢ় মেঘে আকাশে পৃথিবীতে উরু, জানু নীবি উদরে কটিতে। তোমার দেহের ছায়াতে আহা প্রস্ফুটিত কুসুমের দলে, অতলান্ত দীর্ঘিকায় ডুব দিয়ে প্রখর তাপের হোক নিবৃত্তি !···

....লিখতে লিখতে হঠাৎ কখন থেমে গেছে রামতনু। প্রদীপটাও গেছে নিবে। ও চেয়ে আছে দূরে—অনেক দূরে। আকাশের নীলিমায়

যেখানে আলপনা এঁকে দিচ্ছে জ্যোৎস্না প্রিয়তমের মুখচুম্বনের নিশ্চিত প্রতীতিতে।

কেমন একটা বিষণ্ণ একাকীত্ব রামতনুর চারিপাশে শক্ত দেওয়াল তুলে দিতে লাগল। মনে হ'তে লাগল ওর, তলিয়ে যাচ্ছে ও এই একাকীত্বের চোরাবালিতে। কিছুতেই যেন আর বেরুতে পারছে না! কারা যেন ওকে টানছে। কেবলই নীচের দিকে টানছে। ওর ভাবনার জগতে হঠাৎই কেমন একটা অনামা, অদৃষ্টপূর্ব সন্ত্রাসের মেঘ জমা হতে সুরু করেছে! কোথা দিয়ে কি ভাবে যে ও মুক্তির আলোতে এসে স্বাভাবিক স্বভাবে ফিরতে পারবে, তা বুঝতে পারছে না। এমন বিরুদ্ধ ভাবনার জগতে কবে, কখন যে ও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেটাই ওর অজানা। কেন এমন হলো? কেন এমন হয়? কেন ওর নিস্তরঙ্গ সাধনার জগতে এমন মত্ত কোলাহল শুরু হলো? খেই ধরতে পারছে না ও।

রাত্রির মধ্যযাম এখন অতীত হয়ে গেছে। শেষ প্রহরের ঘণ্টা বেজে উঠলো বুঝি রাজবাড়ীতে। নাঃ! আর ঘুম আসবে না। অবকাশও নেই আর ঘুমোবার। ব্রাহ্মমুহূর্ত সমাগত। রামতনু উঠে পড়লো। রোজই এই সময়ে ঘুম ভেঙ্গে যায় ওর। আশৈশবের অভ্যাস। বৃন্দাবনের আশ্রম থেকেই এই অভ্যাস। হাত-পা, মুখ চোখ ধুয়ে, পবিত্র হয়ে আসনে বসল ও। মনকে নিবদ্ধ করলো একেশ্বরের চরণে। তম্বুরার তারে প্রাণের ছোঁয়া লাগল। রামতনুর ভরাট দরাজ গলায় সুর-সুন্দরীগণ নৃত্য আরম্ভ করলো। রেওয়াজের কঠিন সাধনায় নিজেকে সপেঁ দিল ও। তদগত-প্রাণে বাগ্‌দেবীর ধ্যান মূর্তি জেগে উঠতে লাগল!

আজ সকাল থেকেই গোয়ালিয়রে বেশ উত্তেজনা। হাট-বাজার, দোকান পাট সব বন্ধ। লোকজনও একটা চরম দুঃসময়ের আশঙ্কায় প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন অবস্থা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তের জনগনই এই রকম মহা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই কালাতিপাত করেছে। করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এইরকম

বলাই ভাল। তবুও বিপদ যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, তখন তো প্রস্তুতি নিতেই হয়। যেমন প্রজাসাধারনের, তেমনই নিজ নিজ রাজ্যের কর্ণধারদেরও, তা তিনি রাজা, মহারাজা বা মহারাণী, যেই হোন। এমনিভাবে ইতিহাসের এক একটা মহা সন্ধিক্ষণ আসে, আর সব ওলট পালট হয়ে যায়। প্রজাসাধারনের জীবন-যাত্রা হয়ে যায় পর্য্যুদস্ত। পাল্টে যায় রাজা-মহারাজা মহারাণী। কেউ বন্দীজীবনের অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যায়। কেউ বা আগেই মারা পড়ে। ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে গত কয়েক শ' বছরের মধ্যেও একটা সুষ্ঠু কেন্দ্রিয় শাসন ব্যবস্থা তো গড়ে উঠতে পারলো না। সেই মৌর্যসম্রাটদের আমল থেকে গুপ্তযুগ পেরিয়ে পৃথ্বিরাজ চৌহান পর্য্যন্ত একরকম স্থিতিস্থাপকতার যুগ ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীন কলহ শেষ পর্য্যন্ত এমন পর্য্যায়ে উঠে এলো যে ভারতবর্ষ প্রকৃতভাবেই যেন টুকরো টুকরো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এবং সেই সুযোগে অনিবার্য্যভাবে ঘটে গেল বিদেশী আক্রমণ। গজনীর মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের পর কুৎব্‌ উদ্দীন আইবক্‌ প্রতিষ্ঠা করলেন দাসবংশ। ভারতবর্ষে সুরু হলো সুলতানী যুগ।

চুরাশী বছর ধরে একটানা রাজত্ব করে গেল দাসবংশ। তারপর সুরু হলো খিল্‌জি বংশ। তারা অবশ্য বেশী সময় রাজত্ব করতে পারে নি। মাত্রই তিরিশ বছর। তারপরই হা রে রে করে ক্ষমতা দখল করলো বিখ্যাত তুঘলক্‌রা। আরম্ভ হলো তুঘলক্‌ বংশের যুগ। নয় নয় করেও তিরানব্বই বছর একটানা রাজত্ব করে গেল তারা। সেটা হল' চৌদ্দশ' তের সনের কথা। এর পরই দিল্লীর মসনদে জাঁকিয়ে বসলো সৈয়দ আর লোদী বংশীয়েরা। চৌদ্দশ চৌদ্দ সন থেকে একেবারে প্রথম পানিপথের যুদ্ধকাল পর্যন্ত। অর্থ্যাৎ, পনেরশ' ছাব্বিশ সন। বাবরের ক্ষমতা দখল পর্য্যন্ত।

সেই ঘটনাটাই ঘটে গেছে মাত্র কয়েক মাস আগে, বর্ষাকালে। লোদী বংশের গৌরবরবি যে ঢলে পড়েছে অস্তাচলের দিকে, তক্ত-আসীন ইব্রাহীম লোদীর এই সত্যটাই মালুম হয় নি। ফলে লক্ষাধিক সৈন্য

জড়ো করেও বাবুরের মাত্র বার হাজার সৈনিকের কাছে তার পরাজয় ঘটলো। দিল্লী, আগ্রা হাতছাড়া হয়ে গেল। লোদী বংশের পতন: আর মুগল বংশের উত্থান !

আমাদের অনেকেরই অবশ্য একটা ভুল ধারনা আছে যে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ থেকেই বুঝি মুগল রাজত্বের রমরমা আরম্ভ হয়ে গেছলো। তা কিন্তু নয়। বাবুরের সময় কালকে মুগল যুগের সূচনা পর্ব বলা যেতে পারে। কারণ, লোদীবংশের শেষ দিক থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজা, মহারাজারা শক্তিমান হয়ে উঠছিলেন। ভারতবর্ষ তখন কার্য্যতঃই বিভিন্নভাগে বিভক্ত। সিকন্দর লোদীর আমল থেকেই এই ব্যাপারটা সুরু হয়ে গেছলো।—

মালবের সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীন তার দুই ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে বিব্রত হয়ে আছেন। ওদিকে গুজরাটের সুলতান মাহ্‌মুদ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। জৌনপুরের স্বাধীন অস্তিত্বই মুছে গেছে কিছুকাল আগে। প্রতাপরুদ্র, উড়িষ্যার গজপতি রাজা, আরও দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তার করা যায় কি না, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাংলায় সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব। দিল্লীর মস্‌নদে বসেও সিকন্দর লোদীর সাহস হয় না তাকে ঘাঁটাবার। দক্ষিনে বিজয়নগর আর বাহমনি রাজ্য পরস্পর পাঁয়তারা কষছে। ওদিকে সিন্ধুদেশ আর মুলতান রাজনীতির ধাক্কাধাক্কিতে টল্‌টলায়মান। কেন না, কান্দাহার থেকে শাহবেগ আরঘন্‌, বাবুরের ইশারায়, সিন্ধুর পশ্চিমে এসে উৎপাত সুরু করে দিয়েছে। সিন্ধুর সুলতান নন্দা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। মুলতানে উজির-এ-আজম সুলতানের উত্তরাধীকারী ফিরোজকে বিষ খাইয়ে পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওদিকে রানা কুম্ভের নাতি, রানা রায়মল্লের ছেলে সংগ্রাম সিংহ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার। সারা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতি হবার স্বপ্ন অবশ্য তার চোখে তখনও জাগে নি।

এই ভাঙ্গনের পর্ব আড়াই তিন দশক আগে থেকেই চলে আসছে। কিন্তু প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবুর জয়লাভ করবার পরই ভারতবর্ষের

ছবিটা একটু পাল্টে গেল। যদিও, আভ্যন্তরীন কলহ, বিবাদ বা যুদ্ধ বিগ্রহের কামাই ছিল না। কারণ, ভারতবর্ষে তখন অসংখ্য ছোট বড় রাজ্য। একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঝড় ধেয়ে আসছিল ভারতের বুকের ওপর। কিন্তু, তাই নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামাচ্ছে। তেমন চেতনাই নেই কারো মধ্যে। কোন বোধ নেই। কারো মধ্যেই নেই। না রাজা-মহারাজাদের, না প্রজাসাধারনের। সমস্ত দেশ জুড়েই একটা মহা অনিশ্চয়তার কাল বয়ে চলেছে। মানুষের নৈতিক চবিত্রের ঘটেছে চরম অধঃপতন। মূল্যবোধ বলতে জীবনে আর কিছুই নেই। যে যাকে যেভাবে পারছে, ঠকাচ্ছে। ধনী চাইছে আরও ধনী হতে; শক্তিমান চাইছে আরও শক্তি। আর সাধারণ নাগরিকগণ? হায়! তারা তো সব মুক, প্রেতআত্মার মত। ভাগ্যের হাতে সবকিছু সঁপে দিয়েছে তারা। তবুও—

তবুও ইতিহাসের এক একটি মহাক্ষণ আসে যখন শক্তিমান, ধনী এবং রাজা-মহারাজাদের ক্ষণিক চৈতন্যবোধ জাগে। যখন সকলে মিলে একত্র বসতে হয। সকলের স্বার্থেই একটা সিদ্ধান্তও নিতে হয়। আমরা বর্তমানে তেমনই একটা মহাক্ষণের মুহূর্তে এসে পড়েছি।

পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে যেমন উল্কাবেগে দিল্লী, আগ্রা দখল করে নিলেন জাহিরউদ্দীন বাবুর, তা অনেকের কাছেই সুখকর বলে মনে হয় নি। বিশেষ করে হিন্দুস্থানের উত্তর ও মধ্য অংশের নৃপতিদের। এরা সকলেই অবশ্য রাজপুত নৃপতি। এরাই ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, সেই ইব্রাহিম লোদীর সময় থেকেই। ইব্রাহিম লোদী ছিলেন অবক্ষয়ী সুলতানী যুগের শেষ নখদন্তহীন বংশধর তার এমন ক্ষমতা ছিলই না যে এই সব শক্তিধর রাজপুত নৃপতিদের নিজ শাসনে রাখতে পারেন। ত', সে যাই হোক।

এবার এইসব রাজপুত নৃপতিগণ একত্র হলেন। কোথাকার কে এক বাবুর—যার চালচুলোর ঠিক নেই। কোথায় কাবুলের এক কোনে পড়ে ছিল। হঠাৎ কিছু কামান বন্দুক জোগাড় করে ভয় দেখিয়ে

হিন্দুস্থানের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে, তা বরদাস্ত্ করা যায় না। এর বিরুদ্ধে সবাইকে সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে—হবেই।

সেই মতই, মেবারের রানা সঙ্গ-এর নেতৃত্বে আজমীর, অম্বর, মাড়বার, চান্দেরী এবং গোয়ালিয়রের রাজন্যবৃন্দ একটা চরম সিদ্ধান্ত নেবার জন্য শলা-পরামর্শে বসলেন। স্বভাবতঃই, গোয়ালিয়রের মহারাণী হিসাবে মৃগনয়নীকে পরামর্শ সভায় উপস্থিত থাকতে হলো।

....কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করেছিলো রামতনু। রাণী মৃগনয়নী আর নিয়ম মত সঙ্গীত-দরবারে উপস্থিত থাকছেন না। অবশ্য, সঙ্গীতের আসর সেজন্য বন্ধ নেই। আসর বসছে নিয়মিতই। ওস্তাদেরা আগের মতই আসছেন। আর উপস্থিত থাকছে রাণী মৃগনয়নীর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্য এবং শিষ্যা। এরাও গীত-বাদ্যে এবং দু'তিনজন তো নৃত্যেও অতীব পারদর্শী। মৃগনয়নী সকলের সঙ্গেই রামতনুর পরিচয় করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে মৃগনয়নীর প্রধানা শিষ্যা হোসেনী রামতনুকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করলো। হোসেনী কেবল রূপে নয়, গুণেও সকলের মধ্যে বিশিষ্টা। কয়েকদিনের মধ্যেই হোসেনীর সঙ্গীতে, বীনবাদন এবং ধ্রুপদী নৃত্যে অসামান্য পারদর্শিতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে গেল রামতনু। মাধুর্য্যময়ী হোসেনী রামতনুর মানসিক জগতে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে দিল! এক কথায়, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এবং সুমধুর সঙ্গীতে হোসেনী রামতনুর হৃদয়-মন্দিরে এক অন্যতর মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো!

জীবন এক আশ্চর্য্য সুন্দর ধাঁধা। বিংশতি বর্ষিয় যুবক রামতনুর আর অভিজ্ঞতা কতটুকু? ও আপন জগতেই এতদিন বুঁদ হয়ে ছিল। বাহিরের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ ওর এতাবৎকাল হয় নি। কার্য্যকারণে এই গোয়ালিয়রে এসে ও নতুন করে যেন আবিস্কার করলো নিজেকে। অনুভব করলো নিজের মধ্যে একটা নিশ্চিত পরিবর্তন। কেবল শরীরে নয়। মননেও। দিনে দিনে হোসেনীর প্রতি আসক্তি ওর বাড়তেই লাগল। এবং ও লক্ষ্য করলো যে হোসেণীও ঠিক একইভাবে ওর কাছে, ক্রমশঃ আরও কাছে এগিয়ে

আসছে। অবশেষে উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। এমনই অবস্থা হলো যে পরস্পরকে আরও নিকট সান্নিধ্যে পাবার জন্য ওরা ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

কিন্তু তাদের এই আকাঙ্খা আপাততঃ দমন করে রাখতেই হলো। উভয়েই বুঝতে পারলো যে রাণীমাতা মৃগনয়নীর অনুমতি ব্যতিরেকে ওদের মিলন অসম্ভব। কেন না, হোসেণী তাঁর পালিতা কন্যার মতই।

আর মৃগনয়নী এখন গোপন রাজকার্যে ব্যস্ত।

যদিও সঠিক জানে না কেউই। তবু, রাজকর্মচারী কয়েকজনের কাছ থেকে আভাসে ইঙ্গিতে যতটুকু জানতে পেরেছে রামতনু, তাতে ওর মনে হয়েছে যে দেশের সামনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কয়েকজন রাজা-মহারাজা অত্যন্ত গোপনে এখানে এসেছেন। দিল্লী, আগ্রা থেকে খানিকটা দূরে বলেই তারা গোয়ালিয়রে এসে সমবেত হয়েছেন। অন্যত্র গোপনীয়তা বজায় রাখাই কঠিন হতো।

এখন সিদ্ধান্ত কি হলো সেটুকুই জানবার।

এবং তারই আভাস যেন পেয়ে গেল রামতনু সেদিন অপরাহ্ন বেলায়। রোজকার মতই ও যখন গওস সা'র বাসস্থান থেকে রাজবাড়ীর দিকে যেতে পথে এসে নামল।

সকাল থেকেই যে দোকান-পাট, হাট-বাজার বন্ধ, এ সংবাদ ও বাড়ীর রাঁধুনী মহিলার মুখ থেকেই শুনেছিল। শুনেছিল নগরীতে উত্তেজনার কথাও।

পথঘাট আপাত দৃষ্টিতে জনশূন্যই বটে। কিন্তু, রাজবাড়ীতে পৌঁছতে রামতনুকে তিনটি বাঁক পেরিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি বাঁকের মুখেই লক্ষ্য করে ও মানুষের জটলা। উত্তেজিত বা ভীত স্বরে কথাবার্তা। টুকরো টুকরো কথা ওর কানেও আসে। সেগুলো থেকে বোঝা যায় যে একটা যুদ্ধ আসন্ন। সে জন্যেই উত্তেজনা। এবং কেউ কেউ ভীত। উত্তেজনার অবশ্য আরও একটা কারণ ও বুঝতে পারে লোকজনের কথাবার্তা থেকেই। নতুনভাবে না কি আবার কর বসানো হবে।

একেই তারা করভারে জর্জরিত। আবারও নতুন কর দিতে কেউ রাজী নয়। তবে কি দোকান-পাট, হাট-বাজার সেই কারণেই বন্ধ? লোক-জনের কথা থেকে তাই মনে হয় রামতনুর। যুদ্ধ করতে অর্থের প্রয়োজন। নতুন কর না বসিয়ে রাজা-রাজরাদের উপায় কি?

ঘোড়সওয়ার সৈনিক দলকে আসতে দেখে লোকজন এদিক ওদিক সরে গেল। রামতনুও তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীর পথের দিকে ঘুরে গেল।

কয়েকদিন ধরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ-নির্গমনও কঠিন হয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই নিরাপত্তার কারণে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ এসেছেন তাই। এটুকু রামতনু সহজেই বুঝতে পারে। গোয়ালিয়র বা প্রাচীন গোপগিরি শহরটি ধাপে ধাপে নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যেমন অনেক মন্দির আছে, তেমনি বসত বাড়ীও আছে। একেবারে শীর্ষদেশে মজবুত দুর্গের পেছন দিকে রাজপ্রাসাদ। প্রবেশ পথ একটিই—'হাথিয়া পৌর' বা 'হাতী দরোয়াজা'। এখানে এসেই ইদানীং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে রামতনুকে। ও এসে সোজা হস্তীপৃষ্ঠে আসীন রাজা মানসিংহ তোমরের, যিনি ছিলেন রাণী মৃগনয়নীর স্বামী—সেই মূর্তির পাদদেশে বিস্তৃত চাতালে বসে পড়ে। তখন একজন দুর্গরক্ষী ওর কাছে এগিয়ে আসে। ওকে দেখে, তারপর ফিরে যায়। কি ইশারা করে। তারপর বিশাল দরজার নীচে একটি ফোকরের মত ছোট্ট দরজা উন্মুক্ত হয়। রক্ষীর আহ্বানে রামতনু সেই ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। ফোকর বন্ধ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

সঙ্গীত-কক্ষে এসে চুপ করে ও বসে পড়ে। একাকী। এক কোণে। আর কেউ বোধ হয় তখনও আসেনি। কিংবা হয়তো আসবে না আজ কেউ। মনের ওপর চাপ অনুভব করে রামতনু। রাজনীতির কিছুই ও বোঝে না। বোঝার কথাও নয়। কারণ, এতদিন ওর জীবন কেটেছে বৃন্দাবনের আশ্রমে। নিভৃত পরিবেশে। সেখানে রাষ্ট্রনীতির উষ্ণ বাতাস কখনও এসে পৌঁছয় নি। তাই তেমন করে ভাববার অবকাশও ঘটেনি। তবে, এখন, এই পরিবেশে

এবং পরিস্থিতিতে ওর কেমন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিতেই ও বুঝে নিতে পারছে যে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি যদি চঞ্চল হয়ে পড়ে কোনও কারণে, তাহলে তার প্রভাব—অপপ্রভাব শিল্পক্ষেত্রেও পড়ে। অনিবার্যভাবেই পড়ে—এই রকম এক বোধের জন্ম হয় ওর চৈতন্যের মগ্ন-জঠরে। এমন অবস্থায় কারোরই বোধ হয় কিছুই করার থাকে না। কেবল ঘটনা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া। তবুও ওর শিল্পীমন অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয়, কিছু যদি একটা করা যেতো। কি যে করা উচিত এই অবস্থায় সে সম্পর্কে ওর ধারনা স্পষ্ট নয়। তবু একটা তাগিদ ও অবশ্যই অনুভব করে। মনের উপর চাপ আরও গভীর হয়।

তখনই হোসেনী এসে পড়ায় ও স্বস্তি বোধ করে। চারিদিকেই কেমন একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। সকলেই গম্ভীর সকলেই চুপচাপ। এর মধ্যে হোসেনীই যেন একমাত্র ভোরের বাতাসের মত নির্মল। ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আহ্বান জানায়ঃ আসুন দেবী! আজ আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন!"

হোসেনীর গোলাপী-মুখে লজ্জার রক্তিমাভা জাগে! বলতে পারে না মুখ-ফুটে যে কিসের বা কার টানে সে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। আজকাল বাড়ীতে আর মন টেঁকে না হোসেনীর। এমন নয় যে এই রাজবাড়ী, এই সঙ্গীতের দরবারে ও নতুন আসছে। বস্তুতঃ রাজবাড়ীই ওর আসল বাড়ীর চেয়েও বেশী আপন। রাণী মৃগনয়নী আপন মায়ের চেয়েও বেশী। এইখানেই তার যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষা সব। তবু কি যে হয় আজকাল। সকালটুকু কেটে যায় একরকম ভাবে। দুপুরের পর থেকেই ক্রমশঃ চঞ্চলতা বাড়ে। বাড়ীর টুকিটাকি কাজে অনবরত ভুল করে। আর মায়ের ধমক খায়। ধমক দিয়েই মা হেসে ফেলে। হোসেনীর বাবাকে ডেকে হাসতে হাসতেই বলে, মেয়ের সামনেই,— "আমাদের লাড্‌লী বেটি সেয়ানী হয়ে গেছে। এবার বেটির শাদীর কথা ভাবো। ভাল লড়কার খোঁজ খবর নাও।"

কথাগুলো মনে পড়তে আরও লাজিয়ে যায় হোসেনী। তারপর

হঠাৎ খেয়াল হয় যে রামতনু কিছু জিজ্ঞেস করেছে। যথাসাধ্য নিজেকে সামলে নিয়ে হোসেনী কোন মতে উত্তর দেয়: হ্যাঁ, মানে শহরের অবস্থা তো ভাল নয়। যে কোন সময় গোলমাল লেগে যেতে পারে। তাই মা বলছিলো……

"তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, তাই তো?" হোসেনীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রামতনু বলে উঠলো।

হোসেনী পলকের জন্য রামতনুর চোখে চোখে তাকিয়ে মুখ নীচু করে হাসল। কোন উত্তর দিল না।

রামতনু বলল: আমিও আজ তাড়াতাড়ি ফিরে যাব বলে ভাবছি। আব্বাজানের তবিয়ত্ তেমন ভাল নেই। ফকির গওস সা'কে আব্বাজান বলেই ডাকে রামতনু!—উনি নিজে অবশ্য কিছু বলেন নি। তবু আমার তো উচিত এ সময় তাঁর কাছে কাছে থাকা!" রামতনু তাকায় হোসেনীর দিকে। হোসেনী তখনই দৃষ্টি নত করে। বুকে একটা ধাক্কা লাগে ওর। ক্ষণেকের জন্য মুক হয়ে যায় রামতনু। হোসেনীও কোন কথা বলে না। বলতে পারে না। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। অবশেষে রামতনুই সবাক হয়।

"আচ্ছা এই যে চারিদিকে থম্‌থমে ভাব। সবাই বলছে যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ নাকি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এই ক'মাস আগেই তো একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেল। কে এক বাবুর শা' দিল্লী, আগ্রা দখল করে নিলো। তাহলে আবার কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হতে যাচ্ছে?"

"আপনি কিছু জানেন না?" হোসেনী মুখ তুলে প্রশ্ন করল। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, "আমিও অবশ্য বিশেষ কিছু জানি না। বুঝিও না। তবে আমার আব্বার মুখে শুনেছি যে বাবুর শা'-এর অধীনতা স্বীকার করে নিতে রাজপুত রাজা-মহারাজারা ইচ্ছুক নন। আমাদের রাণীমাও বাবুর শা'-এর বশ্যতা স্বীকার করতে চান না। সে জন্যেই রাজপুত রাজাদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়েছেন। এখন কি ভাবে বাবুর শা'-এর মোকাবিলা করা হবে, সেই আলোচনাই চলছে। আজকালের মধ্যেই পাকা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। যদি যুদ্ধ

করাই স্থির হয়, তবে, হয়তো ময়দান্-এ-জঙ্গ বা রণক্ষেত্র হবে—কানুয়ার ময়দান।"

"কিন্তু জিতবে কোন্ পক্ষ?" রামতনু প্রশ্ন করে।

হোসেণী রামতনুর প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলে।—আরে, আমি তা কি করে বলবো? আর, কেই বা পারে যুদ্ধের মীমাংসার কথা আগে থেকে বলতে?

,তা ঠিক।' রামতনু নিজের ভুল বুঝতে পারে। তবে ওর মনের ভেতর যে কথাগুলো আলোড়ন তুলছিল রাজবাড়ীর পথে আসতে আসতে, সেগুলো ও ভুলতে পারে না। ও হোসেণীকে বলার জন্য যতটা না তার চেয়েও যেন বেশী করে নিজেকে শুনিয়েই বলতে থাকে: "জানেন হোসেণী। ইদানীং আমার মনে নানারকম কথার সৃষ্টি হচ্ছে। আমার নিজের কাছেই কথাগুলো কেমন অচেনা অচেনা ঠেকছে। এমন করে এসব কথা কখনও আমার মনে জাগে নি। আমি পথে আসতে আসতে সাধারণ নাগরিকদের নানারকম কথাবার্তা শুনলাম। রোজই শুনছি। আর আমার মাথার ভেতরে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।—করের বোঝা বাড়তে বাড়তে একেবারে অসহ্য পর্য্যায়ে পড়ে গেছে। বাড়তি কর দিতে আর কেউ-ই রাজী নয়। ব্যবসাদারেরা খাদ্যশস্য সব লুকিয়ে ফেলছে। বাজারে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। ফলে দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের রাঁধুণী আপা (দিদি) বলছিল। সেই তো হাট বাজার করে। তার মুখ থেকেও অনেক রকম কথা শুনি।"

"কি কথা শোনেন? কি কথা বলে আপনাদের রাঁধুণী-আপা?

হোসেনীর প্রশ্নের উত্তরে রামতনু বলে, "দেশের অবস্থা না কি ভাল নয়। যুদ্ধে যুদ্ধে দেশটা একেবারে ছারখার হয়ে গেল! এখন এমন অবস্থা যে কেউ আর কাউকে বিশ্বাস করে না। একটা ঘৃণার বাতাস, বিদ্বেষের বাতাস পরিবেশ কলুষিত করে দিচ্ছে!" বলতে বলতে সহসা চুপ করে গেল রামতনু। ওর মনটা যেন কোন সুদূরে উধাও হয়ে গেছে। ওর দুচোখের দৃষ্টিও ঝরোকার ফাঁক দিয়ে বাগিচার সবুজ পেরিয়ে নিরুদ্দেশ। মুখে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রনার অভিব্যক্তি।

বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে রামতনুর অনিন্দ্য মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে হোসেণী। কোন কথা বলে না। বুঝতে পারে, রামতনুর কথা শেষ হয় নি।

....কোথায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তা না, আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবলই বিভেদ ঘটিয়ে দিচ্ছি। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ কেবল দেশের ক্ষতিই করে দিচ্ছে। মুষ্টিমেয় কয়েক-জন হয়ে যাচ্ছে ধনী এবং ক্ষমতাবান। আর দুর্বল, দরিদ্রশ্রেণী যাচ্ছে বেড়ে। এ সবের কি শেষ নেই! শেষ হবে না? এতে তো দেশের সাধারণ মানুষেরই ক্ষতি হচ্ছে!" খানিকক্ষণ আবার চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে রামতনু। তারপর আবার বললে শুরু করে। ওর গলার স্বরে কি এক আবেগ কেঁপে কেঁপে ওঠে, হোসেণী অনুভব করতে পারে। তার বুকেও জাগে কি এক আবেগের স্পন্দন!

রামতনু বলে, "আমি মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দেখি। দেখছি ইদানীং। সমস্ত দেশ এক হয়ে গেছে। সারা হিন্দুস্থান এক হয়ে গেছে। এই পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানের যিনি শাসক হবেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে শাসন করবেন। এই দেশ আমাদের। এখানে কেউ উঁচু জাতের নয়; গরীবও নয় কেউ, ধনীও নয় কেউ, কেউ কারোর ওপর পীড়ন করবে না, অত্যাচার করবে না। এখানে থাকবে না কোন হিংসা বিদ্বেষ ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ—কিচ্ছু না। কেবল ভালবাসা—ভালবাসা....হঠাৎ চেতনা হয় ওর। হোসেনী বসে আছে। আর ও নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে! ওর এসব কথা শুনে না জানি কি ভাবছে হোসেনী। বাস্তবে ফিরে আসে ও। সলজ্জ হাসি মুখে হোসেনীর দিকে তাকায়। মাথায় একটা ঝাঁকুনী দেয়। একরাশ কুঞ্চিত কেশরাশি ওর ঘাড়ের ওপর দুলে ওঠে, নেচে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, "দেখুন! আপনি বসেই আছেন। আর আমি নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছি। কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছি কদিন ধরে—। আচ্ছা! আপনার তো এই গোয়ালিয়রেই জন্ম! এই জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? আমার গ্রাম, যে গ্রামে আমি

জন্মেছি—বিহট, বিহট আমার গ্রামের নাম, সেই গ্রাম এখান থেকে চোদ্দ বা পনের ক্রোশ দূরে। তা সে গ্রাম ছেড়ে তো আমরা ন'বছর বয়সেই চলে যাই কাশীতে। শুনেছি যে ফকির গওস্ হজরতের দোয়াতেই আমার জন্ম। আমার জন্মের পর মা-বাবা আমাকে নিয়ে গোয়ালিয়রে এসেছিলেন। তা, সেই স্মৃতি তো আমার নেই। এখন, এখানেই যখন থাকতে হবে। তখন, এখানকার ইতিহাস জেনে রাখা দরকার। আপনি যদি কিছু জানেন তো বলুন!"

হোসেনী বলে, "আমি যা জানি তা আমার আব্বার মুখে শোনা। আমি নিজে তো এই বিষয়ে কোনও কিতাব পড়িনি। আব্বার মুখে হিন্দুস্থানের কত কিস্সা শুনেছি। যেমন, একশ বছরেরও আগে যখন তৈমুর লঙ্ নামে এক দস্যু এই আমাদের হিন্দুস্থানে এসেছিল, লুটপাট, দাঙ্গাবাজী করে, দিল্লী নগরীকে শ্মশান বানিয়ে দিয়েছিল একেবারে। গজনীর মামুদ কতবার যে হিন্দুস্থানে লড়াই চালালে। তারও আগে, তরাইয়ের যুদ্ধেই এই অঞ্চলে হিন্দুরাজত্ব শেষ হয়ে গেছলো। তারপর এল একে একে, দাসবংশ, খিলজী বংশ, তুঘ্লক, সৈয়দ, শেষে লোদীবংশ। তা লোদীবংশের শেষ সম্রাট ইব্রাহিমও তো কমাস আগে পানিপথের যুদ্ধে শেষ হয়ে গেলো! কে এক জাহিরুদ্দীন বাবুর দিল্লী আগ্রা দখল করে নিল। আব্বাজান কদিন আগেই আমার মায়ের কাছে বলছিলেন, আমি শুনেছি। এই জাহিরুদ্দীন বাবুর লোকটাও নাকি সেই নৃশংস হত্যাকারী তৈমুর লঙেরই বংশধর! একবার যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে, তাকে আর হটানো অত সহজ হবে না।'

"তাই!" রামতনু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।—"কিন্তু আমাদের রাণীমাতা আর ক'জন রাজপুত রাজা যে তাকে দিল্লী থেকে হটাবার জন্যে যুদ্ধ করতে তৈরী হচ্ছেন? আপনিই তো বললেন যে কানুয়ার ময়দানে এবার লড়াই হবে?

"আমি তো বাবার মুখে তাই শুনেছি। তবে, লড়াই করা মানেই তো আর জিতে যাওয়া নয়। হারও তো হতে পারে?"

রামতনু যেন একটু চিন্তিত স্বরে বলল, "তা বটে। তা, যাক গে।

সে সব তো পরের কথা। এখন তো কেউই আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না যে কোন পক্ষ হারবে আর কোন পক্ষ জিতবে? যে কথা বলছিলেন আপনি। গোয়ালিয়রের ইতিহাস আপনার আব্বার কাছে যা শুনেছেন, বলুন!"

হোসেনী বলতে লাগল, "গোপাচল বা গোপগিরি ছিল গোয়া-লিয়রের পুরানো জামানার নাম। সূরয্ সেন নামে কচ্ছবাহ রাজবংশের এক রাজা এই শহর বসিয়েছিলেন। এই রকম শোনা যায় যে রাজা সূরয সেন কুঠকে বিমার থে (কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন)। শিকার খেল্‌তে গিয়ে একদিন তার খুব পিয়াস লেগে যায়। তিনি তখন ঘুরতে ঘুরতে একটি পাহাড়ী গুহার কাছে চলে এলেন। তা সেই গুহাতে থাকতেন এক সাধুমহারাজ। গোয়ালিপ্ ছিল তাঁর নাম। সেই সাধু নিজের কমণ্ডলু থেকে রাজাকে জল ঢেলে দিলেন। কি তাজ্জব কি বাত্! জল খেতেই রাজার কুষ্ঠ-কে-বিমারি একদম সেরে গেলো! রাজা তখন সাধুমহারাজের খুব আভারি (কৃতজ্ঞতা) হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাত্মাজী! আমাকে বলুন, আপনি কি চান? আমার সাধ্য থাকলে আমি দেবো!"

তখন সাধু মহারাজ সূরয সেন রাজাকে বললেন, "বেটা! তুই পাহাড়ের ওপর একটা দূর্গ তৈরী করে দে আমাকে।"

রাজা সূরয সেন তারপর এই দূর্গ তৈরী করে দিলেন। তারপর সাধু মহারাজের নামের সঙ্গে মিল রেখে এই নগরের নাম হলো গোয়ালিয়র।"

রামতনু কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মধুর স্বরে কে ডাকল: 'প্রেমা!'

দুজনেই চম্‌কে ফিরে তাকালো। কখন রাণীমাতা মৃগনয়নী এসে দাঁড়িয়েছেন! খুবই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত মনে হচ্ছিলো তাঁকে। তাঁর দেবশ্রী বদনে কি আসন্ন দুর্যোগের আভাস? মুখমণ্ডলও রঙহীন, গন্ধহীন শুষ্ক পুষ্পের মত। পদ্মআঁখি যুগলের কোলে কালো মেঘ জমেছে যেনো!

রামতনু ও হোসেণী দুজনেই ত্রসেস্তে উঠে দাঁড়ালো। খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই মহারাণীর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা কোন আদেশের অপেক্ষায়।

মৃগনয়নী মৃদু হাসলেন: তোমরা খুব অবাক হয়েছো আমাকে দেখে মনে হচ্ছে! রাজনীতি, কুটনীতিতে দিল্‌চস্পি (অনুরাগ) আমার কোনও কালেই ছিল না। আর সত্যি বলতে কি, লোদী সম্রাটদের সঙ্গে তো একটা মোটামুটি বোঝাপড়া হয়েই গেছলো। মহারাজা মানসিংহ যতদিন ছিলেন তিনিই ওই সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এমন কি, তার মৃত্যুর পর গত দশ বছরে আমাকেও এসব নিয়ে কখনও চিন্তা করতে হয়নি। এখন যা অবস্থা হয়েছে দেশের। আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না। বিধর্মীদের কবলে তো এই পোড়া দেশ কবেই চলে গেছলো। এখনও তারই জের চলছে। একথা তো সত্যি সুলতানেরা পরদেশী এবং বিধর্মী হলেও, অনেক অত্যাচার অবিচার করলেও, এই হিন্দুস্থানকে তারা সত্যিই ভালবেসেছে। এই হিন্দুস্থানকেই তারা তাদের আপন দেশ বলে মেনে নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের মত হয়েই মিশে গেছে। মামুদ, সবুক্তগীন, তৈমুরলঙ বা চেঙ্গিস্ খানের মত লুটেরা নয় এরা। তাদের মত খুনী, নৃশংস মানুষ নয় সুলতানেরা। কিন্তু বেশীদিন ক্ষমতায় থাকলে যা হয়। নিজেদের মধ্যেই শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। সুলতানেরাও এই রোগেই মরেছে। ইব্রাহিম লোদীটা তো একেবারে অপদার্থ। লক্ষ সৈনিক নিয়েও বাবুরের কয়েক হাজার সৈন্যের মুকাবলা করতে পারলো না।'—

রামতনু হঠাৎ বলে ফেললো, 'রাণীমা! শুনেছি যে এই বাবুর নাকি কামান, বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছে? সেগুলি নিশ্চয়ই মারাত্মক অস্ত্র?'

"তা তো বটেই।' মৃগনয়নী বললেন, "কামান, বন্দুকের প্রত্যক্ষ শক্তি দেখেই তো লোদী সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে!"

"কিন্তু আপনারাও তো শুনছি সেই মারাত্মক অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে যাচ্ছেন? আপনারাও কি সফল হবেন?" রামতনু প্রশ্ন করে বসে।

মহারাণী মৃগনয়নী কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রামতনুর দিকে। এই প্রশ্ন যে তাঁরও মনে। এই প্রশ্ন তিনিও রেখেছিলেন রাজপুত রাজাদের সঙ্গে গোপন আলোচনার আসরে। তাঁদের সকলের মনেও এই প্রশ্ন, এই দ্বিধা। শেষ পর্য্যন্ত রানা সাঙ্গা (সংগ্রাম সিংহ) বলেছিলেন যে চেষ্টা করলে হয় তো কিছু কামান-বন্দুক জোগাড় করা যাবে। কিন্তু, এত অল্প সময়ের মধ্যে সৈনিকদের তালিম দেওয়াটাই তো সবচেয়ে শক্ত কাজ। আর অস্ত্র প্রয়োগে যথাযথ কুশল না হলে তো সেগুলি দিয়ে কোন ফললাভ করা যাবে না। তবুও ছোট্ট একটা বাহিনী হলেও প্রস্তুত করে নিতে হবে। যদিও অভিজ্ঞ ওস্তাদের তো অভাব। দু' একজনকে লোভ দেখিয়ে বা জোর করে, চালাকি করে বিপক্ষ দল থেকে ভাঙ্গিয়ে আনতে হবে। যদিও কাজটা সহজ নয়।

মহারাণী অবশ্য এত কথা রামতনুকে বলার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না। রামতনুর দিকে তাকিয়ে থেকেই তিনি বললেন ঃ "সফল হবো কি হবো না, তাই ভেবে তো কেউ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকে না। কাজের দায়ীত্ব নিতে হয়। পালনও করতে হয়। সফলতার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসও করতে হয়। আমাদেরও সেই চেষ্টা করতে হবে। নইলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। পড়বে কেন, পড়েছেই বলা যায়।"

রামতনুর মনে আজ অবিরত প্রশ্নের ঘুর্ণবাত বহে যাচ্ছে। ও আবার বলে উঠল ঃ "কিন্তু রাণীমা! আমার তো মনে হয় আপনারা যথেষ্টই বিলম্ব করে ফেলেছেন! বাবুর শাহ্ দিল্লীশ্বর হ'য়ে বসার বহু পূর্বেই' তাকে হিন্দুস্থানের সীমান্তের ওপারেই বাধা দেবার প্রয়োজন ছিল। এখন এতবড় যুদ্ধে জয়লাভ করে যে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাবুর শাহ্ দিল্লী এবং আগ্রাতে জাঁকিয়ে বসেছেন, সেখান থেকে তাকে হটানো কি আদৌ সম্ভব হবে? আমার তো মনে হয় না।'

রাণী মৃগনয়নী চমকিত বিস্ময়ে এবং কিছুটা সন্তোষে রামতনুর চোখে চোখে তাকালেন ঃ তুমি তাহলে রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি, নিয়েও চিন্তা ভাবনা করো নাকি? এ বিষয়েও পড়াশোনা করেছো বুঝি?"

রামতনু এবার সত্যিই লজ্জা পেলো। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ও বলে উঠল ঃ "না, না, রাণীমা ! পড়াশোনা তো দূরের কথা। এ বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানও আমার নেই, আমি কেবল লোকমুখে শুনে ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করে, আমার মনে যে বিচার বোধ জেগেছে, সেটুকুই ব্যক্ত করেছি।"

আর একবার চমৎকৃত বিস্ময়ে অভিভূত হলেন মৃগনয়নী! যে বিষয়ে কোন ধ্যান-ধারনা নেই, অধ্যয়ন নেই, সেই বিষয়েই এতখানি পূর্বজ্ঞান! কেবলমাত্র লোকমুখে কিছু শুনে, ঘটনাটি বিচার করা এবং প্রায় অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো—এতখানি পূর্বদৃষ্টি, প্রায় অবিশ্বাস্য! অসাধারণ বুদ্ধি! অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বোধ সম্পন্ন এই যুবক! একে আরও কঠোর এবং কঠোরতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে হবে! মনে মনে আদর করলেন তিনি রামতনুকে। মুখে মৃদু হাসি জাগিয়ে বললেন ঃ তোমার অনুমানই হয় তো সত্য। আমাদের এই প্রিয়তম জন্মভূমির ললাট থেকে দাসত্বের কলঙ্ক হয় তো এখনই মুছে ফেলা যাবে না। এতকাল সুলতান থেকে লোদীদের আধিপত্য একরকম ছিল। এবার তো সেই লুটেরা তৈমুর লঙ্ আর চেঙ্গিস খানের বংশধর এসে পড়েছে। হ্যাঁ। জাহিরুদ্দীন বাবুর তাদেরই বংশধর বলে শুনেছি। এ হলো চুঘ্‌তাই তুর্কীদের স্বজাত। কি জানি, হয় তো এই বাবুরের এবং পরে তারই বংশধরদের ওপর নির্ভর করে আছে হিন্দুস্থানের আগামী কয়েক শতাব্দীর ভাগ্য! এই হয়তো আমাদের ভবিতব্য!"

কিন্তু এই জাহিরুদ্দীন বাবুর কি করে হিন্দুস্থানের মত বিরাট একটা দেশকে আক্রমণ করতে সাহস করলো? এ দেশেরই কেউ খাল কেটে কুমীর আনেনি তো? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে!"

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! রামতনু নামে এই বিংশতি বর্ষিয় যুবক—যে এতদিন আশ্রম জীবন কাটিয়েছে, এই পৃথিবী, এই সংসার সম্বন্ধে যার প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতাই নেই বা হয় নি ; যে কেবল একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীত সাধনাই করে গেছে, সেই তারই মুখে একেবারে সমসাময়িক

রাষ্ট্রনীতির চালচলন সম্পর্কে এমন সূক্ষ্ম প্রশ্ন যে কি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচায়ক, এটুকু বুঝতে অভিজ্ঞা মহারাণীর কোন অসুবিধা হলো না। দ্বিধার ছিটেফোঁটা যদিও বা মনের কোন কোণে থেকেও থাকে, এখন সেটুকুরও আর কোন অস্তিত্ব রইলো না। রামতনুর প্রতি তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গীই পলকে বদলে গেলো। তবু তাঁর মনের গহনে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের গতি রোধ করতেই হলো। হোসেনী, তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধিকা বলে যাকে তিনি সর্ববিষয়ে তালিম দিয়ে তৈরী করেছেন, কন্যাসমা সেই প্রেমা, প্রেমকুমারী, এখানে রয়েছে। সঙ্গীত সাধনায় প্রেমাও রামতনুর চেয়ে কোন মতেই ন্যুন নয়। বরং এখনও পর্য্যন্ত সমান সমানই বলা যায়। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো আছে তা অবশ্য এখনই জানা সম্ভব নয়। তবে একটা বিষয় সম্প্রতি মৃগনয়নী জেনেছেন। রামতনু এবং প্রেমকুমারীর মধ্যে গভীর, নিটোল এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রূপে গুণে প্রেমকুমারীও অসামান্যা। বংশ পরিচয়েও প্রেমকুমারী বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

প্রেমকুমারীর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ। খ্যাতিমান পণ্ডিত। কিন্তু আর্থিক স্বাচ্ছল্য তাঁর ছিল না। তাঁর নিজস্ব টোল ছিল। শিক্ষার্থীও ছিল পাঁচ ছয় জন। তাঁর নিজের সংসার ছোটই ছিল। স্ত্রী এবং কন্যা প্রেমকুমারী। কিন্তু তাঁর মৃত কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী এবং তিনটি পুত্র কন্যার প্রতিপালনও তাঁকেই করতে হতো। নিরন্তর অর্থের অভাব তাঁকে পীড়িত করতো। অবশেষে কতকটা নিরুপায় হয়েই লোদী সুলতানের দরবারে তাঁকে সভা-পণ্ডিতের চাকুরী গ্রহণ করতে হয়। এবং ওই চাকুরী গ্রহণই তাঁর কাল-স্বরূপ হয়। সে সময়ের জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ সমাজ। হৃষ্ট মনে মেনে নিতে পারে না। ব্রাত্য হ'তে হয় তাঁকে সমাজে। কিন্তু দৃঢ়চেতা মানুষ প্রেমকুমারীর পিতা সমাজের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি সপরিবারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর টোল বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতি বলতে এটুকুই। অন্যদিকে আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার ফলে তাঁর সামাজিক প্রতিপত্তি বরং বৃদ্ধিই পায়। যা হোক।

প্রেমকুমারীর ইস্‌লামী নাম হয় হোসেণী। ব্রাহ্মণ কন্যা বলেই

প্রেমকুমারীকে সবাই ব্রাহ্মণী বলে ডাকে। তিনি অবশ্য প্রেমা বলেই ডাকেন। প্রেমা এখন রামতনুর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুজনকে দেখে একটু কি বিচল হলো তাঁর মন! না, না, তা কেন! মনে মনেই হাত ঝেড়ে ফেলার মতো চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিলেন। বরং, ভালই তো লাগছে দুজনকে পাশাপাশি! বাইরের দিক থেকে চমৎকার লাগছে দুজনকে। অন্তরের দিক থেকেও দুজনের এমন চমৎকার মিলন—? মৃগনয়নী নিজেকে ধমক্ দিলেন! কেন এমন অ-ন্যায্য জিজ্ঞাসা তার মনে? একটু বা লজ্জিতও বোধ করলেন মৃগনয়নী। সতর্ক হলেন! তাঁর মনোভাবের ছায়া মুখমণ্ডলে রেখাপাত করে নি তো! রামতনু অতি প্রখর বুদ্ধিমান। কন্যাসম প্রেমাও তো নারী যুবতী! অবশ্য, তিনিও অভিজ্ঞা, বয়স্কা রমণী? এবং সামান্যা রমণী নন! যাক।

রামতনু প্রশ্ন করেছে। এবং উত্তরের অপেক্ষা করছে। মৃগনয়নী অম্লান হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "তোমার সন্দেহ অমূলক নয়, রামতনু। তুমি অভ্রান্ত অনুমান করেছ। খাল কেটেই কুমীর ডেকে আনা হয়েছে। বসো না তোমরা! প্রেমা বেটী! শরবত্ দিতে বলো।'

শরবতের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে রাণী মৃগনয়নী বলতে লাগলেন: "আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তাই তোমাদের বলছি। এই দুনিয়ায় কিছু কিছু লোক থাকে, তক্দীর কে মারা—ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া লোক। কিন্তু, তারা কখনও হেরে যেতে চায় না। তারা এমনই জেদী এমনই সাহসী যে তক্দীরের হাতে মার খেয়েও তক্দীর ফেরাবার জন্য মরীয়া হয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। আর এই সব লোকেদের স্বয়ং ঈশ্বরও বেশীদিন উপেক্ষা করতে পারেন না। হার মানতে হয় ঈশ্বরকে এদের কাছে। তক্দীরের চাকা ঘুরে যায়।

জাহিরুদ্দীন বাবুর এই রকম একজন লোক। তক্দীরের হাতে মার খাওয়া; কিন্তু তক্দীর ফেরাতে বদ্ধপরিকর। আমরা যত-টুকু সম্বাদ জোগাড় করতে পেরেছি, তা হচ্ছে, এগারো বছর বয়সে তার

আব্বার এন্তেকাল হবার পর 'ফরগনা' নামে একটি খুবই ছোট জায়গার সুবেদার হয়ে যায় সে।

'ফরগনা' জায়গাটা কোথায় ? রামতনু প্রশ্ন করে।

"শুনেছি চৈন(চীনা)—তুর্কীস্থানের কোথাও। যা হোক। ছেলের বয়স তো মাত্র এগারো। তাকে কেউ সুবেদার বলে মানবে কেন ? তার রিস্তেদাররা (আত্মীয়জন) ষড়যন্ত্র করে মেরে ভাগিয়ে দিল ছেলে-টাকে। পাঁচ ছয় বছর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, নানান দেশের মাটি ছুঁয়ে বেড়িয়ে তার কেটে গেল। একরকম ভিখারী ব'নে গেল সে। কিন্তু জেদ্ কম্‌লো না। কয়েকজন নওজোয়ানকে সাগ্‌রেদ বানিয়ে একটা দল গড়লো। তখন সে আর তার দলবল কাবুলে আস্তানা করেছে। সেখানে একদিন কি একটা গোলমাল লেগে গেল। আর সুযোগ বুঝে গদী থেকে সুলতানকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই সেখানে বসে পড়লো। মৃত সুলতানের এক ছেলে পালিয়ে বাঁচলো।"

"আরে বাহ্! বহুত্ বাহাদুর ছেলে তো!" রামতনু তারিফের স্বরে বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু, আট বছর পর সেই মৃত সুলতানের ছেলে এসে বাবুরকে হারিয়ে ফের কাবুল দখল করে নিল। ব্যস! আবার রাস্তায় নামতে হলো বাবুরকে।—

কিন্তু, ঈশ্বরের কি কৃপা! হিন্দুস্থানের দিকে চোখ পড়লো বাবুরের। আর তক্‌দীরও যেন ডেকে নিল তাকে হিন্দুস্থানের দিকে। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর দুজন ওম্‌রাহ্—দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ। তারা ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো। এবার তারা সুযোগ বুঝে খুব গোপনে বাবুরের সঙ্গে মিতালী করলো। তাকে বললো হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে। ভেতর দিক থেকে তারা সব রকম সাহায্য দেবে বাবুরকে—সে রকম ওয়াদা করলো। (প্রতিশ্রুতি দিল।) বাবুরও দেখলেন এমন একটা সুযোগ যখন এসেই পড়েছে, এটা কিছুতেই হাত-ছাড়া করা যায় না। এই দুই নিমকহারাম যখন তার কাছে এসে পড়েছে, এবার হিন্দুস্থানকে কব্‌জা করতেও কোনও অসুবিধে হবে না।"

"কিন্তু ওই দুজন—দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ-য়ের কি একই রকম উদ্দেশ্য ? ইব্রাহিম লোদীকে হটিয়ে দিয়ে বা মেরে ফেলে দিল্লীর মস্‌নদে বসবে ? দুজনের মধ্যে মসনদ্‌ নিয়ে ফের ঝগড়া লেগে যাবে না ? আর বাবুর কি এতই বোকা যে নিজের জোরে যুদ্ধে জিতে ওদের দুজনের হাতে মস্‌নদ ছেড়ে দেবে ?" রামতনু একসঙ্গে প্রশ্নগুলো করে ফেললো।

মৃগনয়নী হাসলেন।—"তাই কখনও হয় না কখনও হয়েছে ? বাবুরের মত ভাগ্যান্বেষী নিমকহারামীর উস্থল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওদের আস্তাকুঁড়ে—এটাই তো স্বাভাবিক। দৌলত আর আলম খাঁ অবশ্যই প্রথমে তা বুঝতে পারে নি। বা পারলেও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস ছিল। তবে, দুজনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। দৌলত খাঁ বদ্‌লা (প্রতিহিংসা) নেবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। তার ছেলেকে ইব্রাহিম লোদী বিনা দোষে নাকি ভীষণ সাজা দিয়েছিলো। আসলে আলম খাঁ-র মনেই ছিলো গদ্দীর খোওয়াইশ্‌। (গদীর লোভ) সে চেয়েছিল যে বাবুর ইব্রাহিমকে কোতল্‌ করে তাকেই দিল্লীর মস্‌নদে বসিয়ে দিয়ে কাবুল ফিরে চলে যাবে!"—শরবতে শেষ চুমুক দিয়ে পাত্রটা রেখে মৃগনয়নী আবার বলতে লাগলেন : "তা বাবুর তো একে-বারে আঁধির মত (ঝড়ের মত) ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্জাবে। তারপর লাহোর দখল করে নিলো। তখন দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ-র হুঁস হলো। তারা বুঝতে পারলো যে একবার যদি বাবুর ইব্রাহিমকে মস্‌নদ থেকে ফেলে দিতে পারে, তাহলে বাবুর নিজেই তক্‌ত্‌-এ-তাউসে চড়ে বসবে। সেটা তো আর তারা হ'তে দিতে পারে না। ক্ষেপে গিয়ে তারা বাবুরের বিরুদ্ধেই তুমুল লড়াই করলো। বাবুর সমঝে গেল। অবস্থা সুবিধে নয়। ফিরে গেল সে ফের কাবুলে।—

—"কিন্তু যে শের (বাঘ) একবার মানুষের খুন (রক্ত) চেখেছে, সে তো সুযোগ পেলেই ফের মানুষের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। বাবুর তো ততদিনে বুঝে গেছে যে হিন্দুস্থান দখল করা মোটেও না-মুম্‌কিন (অসম্ভব) নয়! সে তৈরী হতে লাগল। সৈন্যদল তো বাড়ালোই।

সেই সঙ্গে কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ও চলতে লাগল।"

"কিন্তু এতসব যে জোগাড় করলো বাবুর, কি ভাবে করলো? এত অর্থ, মানে, টাকা-পয়সা পেলো কোথা থেকে? রামতনু জিজ্ঞেস করল।

"কেন?" মৃগনয়নী বললেন, "ওই যে পঞ্জাব, লাহোর কিছুদিন দখল করে ছিলো? খাজাঞ্চিখানার, তোষাখানার সব টাকা আত্মস্যাৎ করে নিয়ে গেছ্লো। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হাটে-বাজারে লুটপাট করেছে, আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের কাছ থেকে জবরদস্তি টাকা আদায় করেছে, জেব্‌রাত (গয়নাগাঁটি) ছিনিয়ে নিয়েছে। বড় কাজে হাত দেবার আগে এরকম ছোটোখাটো দুর্নীতির কাজ তো যারাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী তারাই করে থাকে! বরাবরই এমন হয়ে আসছে! বরাবরই এমন হবে। তা যাক। ঠিক এক সাল বাদেই সেই খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হয়ে—হিন্দুস্থানে ঢুকবার ওইটাই রাস্তা—ফের পঞ্জাবে ঢুকে পড়লো বাবুর। এইবার দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ-র যুদ্ধ করার সখ মিটিয়ে দিল। তাদের একেবারে পর্যুদস্ত করে পঞ্জাব দখল করে নিল। কিন্তু পঞ্জাব দখল মানে তো আর দিল্লী দখল নয়। বাবুর তা জানে। দিল্লীর মস্‌নদে যে সুলতান ইব্রাহিম লোদী বসে আছে। তাকে হারালে, হারাতে পারলে, তবে তো হিন্দুস্থান দখল করা হলো। আর এই সুলতান ইব্রাহিমও এত বোকা! বিপদ যে ঘাড়ে এসে পড়েছে, সেটুকু পর্য্যন্ত সময়ে বুঝে উঠতে পারেনি। তার দাম দিতে হলো পানিপথের লড়াইয়ে। নিজে তো মরলই। ভাল ভাল সৈন্য সেনাপতিও গেল। আর আমরা—ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে পড়লাম নতুন বিপদের মধ্যে! এখন আমরা একজোট হয়ে যদি বাবুরকে তাড়াতে পারি তো কথাই নেই। নচেৎ, হিন্দুস্তানের তক্‌দীরে যে কি লেখা আছে কে জানে!" রাণী মৃগনয়নী চিন্তিত মনে চুপ করে গেলেন।

'যেদিক দিয়েই হোক—একটা পরিবর্তন আসছেই। একটা নয়া জমানা সুরু হ'তে যাচ্ছে। আপনারা জিতলেও আসছে। বাবুর শাহ্‌ জিতলেও আসছে! আচ্ছা, রাণীমা! যদি আপনারা জিতে যান।

তাহলে দিল্লীর মস্‌নদে কে বসবেন?"—এইবার প্রথম কথা বলল প্রেমা। এতক্ষণ সে শুনছিল।

রাণী মৃগনয়নী উত্তর দিলেন নির্দ্ধিধায়ঃ "আমরা যদি বাবুরকে হারাতে পারি কানুয়ার যুদ্ধে; তাহলে সংগ্রাম সিংহই দিল্লীর মস্‌নদে বসবেন। তাঁর সম্পর্কে কোন বিতর্কই নেই আমাদের মধ্যে।"

"আর কানুয়ার যুদ্ধে আপনারা পরাজিত হলেও তো বর্তমান অবস্থার কোন হেরফের হবে না।" রামতনু প্রশ্ন করল, "কারণ, বাবুর তো দিল্লীর মস্‌নদে বসেই আছে!"

"উহুঁ! এ কথাটা ঠিক বললে না, রামতনু! আমরা হেরে গেলে বর্তমান অবস্থার হেরফের হবেই। তখনই স্থরু হবে আসল লড়াই। আমাদের পরাজিত করে বশ তো করবেই। তারপর নতুন নতুন আইন-কানুন করে ঘাড়ে চাপাবে। জবরদস্তি করবে। কতরকম কর বসাবে। না দিতে চাইলেই অত্যাচার বাড়বে। আরও কত রকমের চাপ সৃষ্টি করবে। সে সব এখনই বলা মুস্কিল। মোট কথা, তখনই শুরু হবে আসল জমানা, নয়া জমানা—মুগল-এ-আজম্‌!" মৃগনয়নীর অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়লো! কেউ কোন কথা বলছে না। হঠাৎ চারদিক কেমন নিস্তব্‌ধ হয়ে গেল!

....হঠাৎ রাণী মৃগনয়নীই সচেতন হলেনঃ "আরে! কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল যে। ক'টা ঘণ্টা পড়েছে, প্রেমা শুনেছো?"

"চারবার ঘণ্টা বেজেছে শুনেছি।" প্রেমা উত্তর দিল।

"তবে তো বেশ রাত হয়েছে।" বলতে বলতে রামতনুর দিকে তাকালেন। রামতনুও উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো মৃগনয়নীর দিকে। কি বলতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে মৃগনয়নী দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্রেমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বাড়ী তো কাছেই। দুর্গসীমার মধ্যে। তুমি তো ফিরে যেতে পারবে। সঙ্গে মুনিয়াদাসীকে নিয়ে তুমি চলে যাও! নইলে তোমার আব্বা-আম্মা চিন্তায় থাকবে। কিন্তু রামতনুর ঘর তো নীচে। অনেকটা পথ যেতে হবে। এখন ফৌজী-কানুন চলছে। পথের আলোগুলোও এখন জ্বালানো হচ্ছে না। তাছাড়া. এই শহরে তুমি

নতুন এসেছো। তুমি পরিচয় দিলেও তোমার কথা সান্ত্রীরা বিশ্বাস না-ও করতে পারে। তুমি আজ রাতটা থেকেই যাও!" বলে মুখ ঘুরিয়ে ডাকলেন—"মেন্‌কা!"

প্রৌঢ়া মেন্‌কা এসে দাঁড়াতেই রাণী বললেন, "ছুধ্‌নীকে ডেকে বলো শরবতের পাত্রগুলো নিয়ে যাক। আর মুনিয়াকে ডেকে দিক। প্রেমা বেটীকে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর তুমি আমার পাশের ঘরে রামতনুর থাকার বন্দোবস্ত করে দাও!"

মুনিয়ার সঙ্গে প্রেমা চলে গেল। ছুধ্‌নী নামে দাসী শরবতের পাত্রগুলি নিয়ে গেল। মেন্‌কা পরিচারিকা নিম্নস্বরে রামতনুকে ডাকলো ঃ "আসুন!"

"যাও, রামতনু!" মৃগনয়নী বললেন, "ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পাল্টে নাও! আমিও গুসলখানায় যাই। স্নান সেরে নিয়ে আমিও যাচ্ছি। একসঙ্গেই খাব আমরা।" রাণী ভিতর মহলের দিকে চলে গেলেন।

রামতনুও মেন্‌কার সঙ্গে পা বাড়ালো। ভিতর মহলে এই প্রথম-বার ও যাচ্ছে। এতদিন যাবার কোন কারণও অবশ্য ঘটেনি। যেতে যেতে কেবলই ওর মানসপটে হোসেনীর অনিন্দ্য মুখটি ভেসে উঠছিল। যাবার আগে দৃষ্টি দিয়ে বিদায় নিয়েছিল হোসেনী। বারে বারে সেই ছবিটিই দেখছিল রামতনু।···

···খুব যত্ন করে, পাশে বসিয়ে, নিজের হাতে পরিবেশন করে রাম-তনুকে খাওয়াতে লাগলেন মৃগনয়নী। মেন্‌কা জোগাড় দিচ্ছিল নানা আকারের পাত্রে নানা রকমের খাদ্য সম্ভার। রামতনুর আহার বিষয়ে তেমন কোন বাছ বিচার ছিল না। ছোটবেলা মায়ের সঙ্গেই বেশীর ভাগ কেটেছে। মা অনেক রকম রান্না করতো তা ঠিক। তবে সে-গুলির মধ্যে নানারকম মিষ্টিদ্রব্যই ছিল প্রধান। রামতনু মিষ্টি খেতে ভালবাসতো তাই। আর একটা জিনিষ ওর খুব প্রিয় ছিল। দধি। ছু'একখানা চাপাটি সব্‌জি দিয়ে খেতো কি না খেতো দহির সঙ্গে সুগন্ধী লাড্ডু অথবা প্যাঁড়া মেখে ওর খাওয়া চাই-ই চাই। তারপর

তো আশ্রম জীবন। সেখানে খাওয়ায় বৈচিত্র্য ছিল কমই। কিন্তু গুরুদেব হরিদাস স্বামীজীর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে ছিল কঠোর দৃষ্টি। ব্যায়াম, প্রাণায়াম ইত্যাদি তো করতে হ'তোই। সেই সঙ্গে শরীরে বাড়তি পুষ্টির জন্য নানা রকম বাদাম পেষাই করে শরবত তৈরী করতে হতো প্রত্যেককে প্রতিদিন সকাল বেলা। একেকদিন এক এক জনের ওপর ভার পড়তো। স্থানীয় আভীর সম্প্রদায় প্রতিদিন সকালে দিয়ে যেতো পর্য্যাপ্ত পরিমানে দুধ এবং দহি। মিষ্টান্নের ব্যাপারী একজন দিয়ে যেতো লাড্ডু, প্যাঁড়া, বালুসাই, পেঁঠা ইত্যাদি হরেক রকম মিষ্টি। এই খানে, গোয়ালিয়রে এসেও কিছুই অসুবিধা হয়নি ওর। গওস সা' হজরতের বাড়ীটি বেশ বড়ই। মহারাজা মানসিংহেরই দান। দুইজন দাস-দাসী এবং একজন রাঁধুনী আছে। মহারাজার আমল থেকেই তাঁর খরচাদি রাজকোষ থেকেই মেটানো হয়। রাণী মৃগনয়নীর আমলেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। তবে, পারিবারিক সূত্রে পাওয়া অনেকটা পরিমাণ ভূ-সম্পত্তিরও মালিক তিনি। সেই সূত্রেই তাঁর বাৎসরিক আয়ও কম নয়। তিনি সামান্য কিছু রেখে আয়ের বাকী অংশ বিভিন্ন মক্‌বরা, মক্তব মাদ্রাসা এবং দরিদ্র আশ্রমে দান করে দেন। এ সমস্তই তিনি নিজে রামতনুকে বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি রামতনুর দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসও জেনে নিয়েছেন। সেই মত বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। কাজেই, রামতনুর এ পর্যন্ত কোনোই অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু কোন রাজবাড়ীতে আহার গ্রহণ ওর এই ক্ষুদ্র জীবনে প্রথম। আহারে এমন আড়ম্বর, পদের এমন বৈচিত্র জানা ছিল না রামতনুর। এত বিচিত্র মধুর স্বাদের খাদ্যও আগে কখনও খায় নি ও। তবুও অল্প অল্প করে সব কিছুই খেয়ে যাচ্ছিলো। বস্তুত, না খেয়ে উপায়ও ছিল না। মৃগনয়নী কখনও হেসে কখনও মৃদু ধমক দিয়ে রামতনুকে খেতে বাধ্য করছিলেন। —"তোমার এখন শরীর গড়ে ওঠার বয়স। এ সময় প্রাণ ভরে খাবে। তোমাকে মস্ত বড় গায়ক হতে হবে। সারা হিন্দুস্থানে শ্রেষ্ঠ গাবৈয়াদের মধ্যে তুমিই হবে সেরা। তোমার বুকে যদি জোর না থাকে, প্রভূত দম না থাকে, তাহলে তুমি কি ভাবে

লড়াই করবে? ভাল ভাল খাদ্য না খেলে—শরীরে তাকত্ হবে না। লড়াই ও করতে পারবে না।"

রামতনু হেসে ফেললো। বলল, "কিন্তু এই ভাবে যদি আমি খেয়ে যাই, তাহলে লড়াই করা তো দূরের কথা, শরীর নিয়ে নড়া চড়া করতেও পারবো কিনা সন্দেহ। একেবারে কাশীর মহারাজা হয়ে যাব আমি!"

"কেন, কেন কাশীর মহারাজার কি হয়েছিলো?" মৃগনয়নী প্রশ্ন করলেন।

"বলছি।" রামতনুর খাওয়া প্রায় শেষ। ও বলতে লাগল, "আমরা তখন কাশীতে। আমার পিতাজীকে তো পণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট গবৈয়া হিসাবে সকলেই মান্য করতো। তৌহার পরবে তো বটেই, এমনিতেও রাজ দরবারে পিতাজীর প্রায়ই ডাক পড়তো। তা একবার দীবালীর সময়, অন্নকূটের দিন, পিতাজীর কাছে আমন্ত্রণ এলো। গঙ্গাজীর বুকে বজরা ভাসবে মহারাজার। সারারাত মহ্ফিল্ হবে। কাশীর বড় বড় ওস্তাদ গবৈয়া, বাজনদার তো থাকবেই। আর থাকবে কাশীর কয়েকজন গুণবতী দামী দামী গায়নী। (বাঈজী)। প্রত্যেক বছরেই হয়।"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো জানি। মহারাজা মানসিংহ থাকতে দুই তিনবার গিয়েছি তো আমিও তাঁর সঙ্গে! তা কাশীর মহারাজার কি হলো, বলো?" মৃগনয়নীর চোখে মুখে আগ্রহ!

"বলছি। শুনুন!" বলতে গিয়ে আবার হেসে ফেলল রামতনু। ওর হাসির ছোঁয়াচে রাণী মৃগনয়নীর মুখেও হাসি জাগলো।—"তা, পিতাজী আমাকে সঙ্গে নিয়েই বজরার মহ্ফিলে গেলেন। আমরা গিয়ে তো বজরার ওপরের মঞ্জিলে, যেখানে আসর বসবে, সেখানে গিয়ে বসলাম। বিশাল বজরা। মাঝখানে মহারাজের জন্য আসন পাতা হয়েছে। তিনি তখনও আসেন নি। আর সকলেই মোটামুটি এসে গেছে। দূর দূর থেকে অনেক রঈস্ আদ্মীও এসেছেন। এখন

মহারাজের অপেক্ষা। তিনি এলেই মহ্‌ফিল আরম্ভ হবে। যন্ত্রীরা তাদের যন্ত্রগুলি বেঁধে নিচ্ছেন।"—

এই সময় নীচে হৈ হৈ সুরু হলো। মহারাজা আসছেন। আমি ছুটে গিয়ে বজরার বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি—ওহ্! মনে হলো কি বিন্ধ্য-পর্বতটাই বজরাতে উঠে আসছে না কি? নেহাৎ জড়িদার পোষাক, মণি-মুক্তার গজ্‌রা (মালা) আর মাথাতে উষ্ণীষ পরে ছিল। তাই মানুষ বলে শেষে বুঝতে পারলাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি চড়ে আসরে এসে বসলেন। এমন হাঁসফাঁস করে হাঁফাতে লাগলেন যে মনে হলো এক্ষুনি দম বেরিয়ে যায় কি না। একদম পসীনা পসীনা হয়ে গেছেন মহারাজা। (ভীষণ ঘেমে গেছেন!) চারদিক থেকে চারটে বড় বড় ময়ূরপুঁছ্ (ময়ূরের পালক) দিয়ে তৈরী পঙ্খা দিয়ে চারজন দাসী হাওয়া দিতে লাগল। "অথচ, মহারাজার উমর (বয়স) কিন্তু কুড়ি-বাইশ! পিতাজী বলেছিল।"

রামতনুর বর্ণনাতে, বলার ভঙ্গীতে, মৃগনয়নী সদ্য কিশোরীর মত খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—"দুষ্টু ছেলে!" তারপর গোলাপ নির্যাস দিয়ে তৈরী সুগন্ধ মিষ্টি-খোয়া ভর্তি পাত্রটী এগিয়ে দিলেন রামতনুর দিকে। —"নাও! এটুকু খেয়ে ফেলো।"

"হরগীজ্ নহী! (কিছুতেই না।) আমি আর একটুও খাবো না।" রামতনু প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল।

"ভয় নেই! এটুকু খেলে তুমি মহারাজার মত মোটা হয়ে যাবে না। নাও! খেয়ে ফেলো তো, পেয়ারে তান্নো আমার! হাঁ করো—মুঁহ্ খোলো! আচ্ছা, আমিও তোমার সঙ্গে খাচ্ছি। তুমিও খাও! আমিই তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি! মুঁহ্ খোলো! হাঁ করো, তান্নো পেয়ারে! আহ্!···

···স্তিমিত প্রদীপের আলোতে বিশাল কক্ষের আঁধার আরো

ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। চারিপাশের এই নিঃশব্দ নির্জনতার ভার বুকে নিয়ে রামতনু শুয়ে আছে বিরাট শয্যার ওপরে। চোখে নিদ্রা নেই। কিন্তু পৃথিবীর সকলেই কি এখন নিদ্রিত? কে জানে। বৃন্দাবনের আশ্রমের কথা মনে পড়ে। সকলেই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল গুরুদেব এখনও ঘুমোন নি। রামতনু জানে। এ সময় উনি গ্রন্থপাঠ করেন। এই সময় যে রামতনুও গ্রন্থপাঠ করে, তা আবার গুরুদেবও জানতেন। রামতনুর আহারে যেমন বাছবিচার নেই। সবরকম জিনিষই ও খায়। তেমনি গ্রন্থ পাঠেও ওর কোন রকম বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। গম্ভীর দর্শন বা ইতিহাসের গ্রন্থও যেমন পড়ে, তেমনই রসশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার গ্রন্থও সমান আগ্রহে পড়ে। কিন্তু এখন, আজ, ওর সঙ্গে কোন গ্রন্থ নেই। মনের মধ্যে কি এক অজ্ঞাত বিষাদের মেঘ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে দিতে চায়; বোধের মধ্যে অনুভব করে ও এক ভাসমান আকুতি। চারিপাশের আঁধার এসে সজল দেহের উষ্ণ পরশ দিয়ে যায় ওর শরীরে। ক্রমশঃ সত্য হয়ে ওঠে মনের ভিতরে আর একটি মনের পৃথিবী। সেই পৃথিবীর সবটুকু রূপ না প্রত্যক্ষ না সচেতন। তবু তাই যেন ওর মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে সত্যরূপ ধরে ক্রমে ক্রমে আকার নিতে থাকে। আর ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে দুরু দুরু! নিজেকে ভীষণ তিরস্কার করলেও আবার সেই প্রতিচ্ছায়া ওর আকাশ মনকে আচ্ছদিত করে। ও গুণ্ গুণ্ করে সুরে সুরে আবৃত্তি করতে থাকে: "বসন্তে বাসন্তী কুসুম সুকুমারৈরবয়বৈর্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণাম্। অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তা কুলতয়া বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমুচে সহচরী॥... বসন্ত ঋতুতে একদা শ্রীমতী রাধা শ্রীহরির অনুসরণ করে পরিভ্রমণ করাতে তার বসন্তকালের পুষ্পের মত কোমল দেহ লতা পথ শ্রান্তিতে ক্লান্ত এবং মদনযন্ত্রনায় কাতর হওয়াতে প্রেমজ্বালা দ্বিগুণতর বর্ধিত হয়ে উঠলো। তখন কোন সখী শ্রীমতী রাধাকে ডেকে সাদরে মধুর মধুর কথা বলতে লাগল।—হে প্রিয় সহচরি! দেখ, দেখ! বারংবার মলয়-মরুত আলিঙ্গনে লবঙ্গ-লতিকারা

কেমন মনোহর দৃশ্য হয়েছে—ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন—কোমল মলয় সমীরে মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটিরে। আর —ভ্রমর গুঞ্জন-মিশ্রিত কোকিলের কুহুরবে নিকুঞ্জগৃহ পরিপূরিত হয়েছে।—বিহরতি—হরিরিহ সরস বসন্তে—আহা! এমন মনোহর বসন্তকালে শ্রীহরি যুবতী নারীগণের সঙ্গে কেলি করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এবং—নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং—এবং সানন্দে তাদের সঙ্গে নৃত্য করতে আরম্ভ করছেন। কিন্তু,—সখি বিরহীজনস্য দুরন্তে—হায় সখি! বিরহিনীদের পক্ষে এই বসন্তঋতু যার পর নাই যন্ত্রনাদায়ক!…আহ্! রামতনুর কাতর হৃদয়ের আকুতি স্বতঃই উৎসারিত হলো। পাশ ফিরে শুতে যাবে, তখনই অনুভব করল—কেউ যেন এসে কক্ষের দ্বারপথে দাঁড়িয়েছে! ও ফিরে তাকালো!

"রামতনুর কি অসুবিধা হচ্ছে এখানে? ঘুম আসছে না?"

রামতনু তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল। সহসা কোন উত্তর জোগালো না মুখে।

"তুমি গুণ্ গুণ্ করে কি যেন গাইছিলে? সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। এসো! আমার সঙ্গে এসো! বাগীচায় খানিক পায়চারি করলে ঘুম আসবে!"

প্রশস্ত অলিন্দ সোজা অন্দর মহলের সীমায় এসে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। তারপর খানিকটা এগুলেই পাঁচ-ছয় ধাপ সোপান নেমে গিয়ে বিস্তৃত অঙ্গণ। অঙ্গণের শেষ প্রান্ত গিয়ে বাগীচার সঙ্গে মিশে গেছে।

ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে সামান্য ব্যবধানে পিছনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল রামতনু। মহারাণীকে এমন সাধারণ রূপে দেখা তো দুরের কথা, দেখার কল্পনাও কোন দিন করে নি রামতনু। অবশ্য স্পষ্ট অবয়বে ধরা যাচ্ছিল না তাঁকে। কারণ, অলিন্দের ধারে ধারে শিশার আধারের মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপের আলোক স্তিমিত। তবু সেই আধো-আঁধারে মহারাণীর অফুরন্ত কেশদাম শ্রোণীদেশ ব্যেপে ছড়িয়ে পড়েছে লক্ষ্য করল রামতনু। নাকে এসে প্রবেশ করল পুষ্প-মল্লিকার সুগন্ধ।

আ-কক্ষ অনাবৃত ছুটি সুগঠিত বাহু। কোন অলঙ্কার পরেন নি মহারাণী। কিছুটা বিস্ময় বোধ ওর হলো বই কি! অঙ্গণ পার হয়ে বাগীচায় এল ওরা।

দুইপাশে নানা ধরণের ফুলের গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার নিশীথ। কিন্তু চরাচর ব্যেপে এক ঘোলাটে আঁধার। কারণ, কুহার (কুয়াশা) মেঘ জ্যোৎস্নাকে আবৃত করে রেখেছে। মাঝের পথ ধরে মহারাণীকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিল রামতনু। মহারাণী একটি প্রশস্ত বেদীর ওপর এসে বসলেন। রামতনুকেও হাত ধরে মুখোমুখি বসালেন। রামতনু দেখল বেদীর পেছন দিকে একটি প্রমাণ আকারের প্রস্তরময় নারী মূর্তি আনগ্ন। দুই হাত ঈষৎ উত্তোলিত করে পাত্র থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে একটি ফাওবারহ্ (ফোয়ারা)। জলধারার একঘেয়ে ছর্ ছর শব্দ নিশিথিনীর নিদ্রা ভঙ্গ করার বৃথাই চেষ্টা করছে। চারিদিকে অপার্থিব এক স্তব্ধতা।

মহারাণী মৃগনয়নী কুক্ষির দু'পাশে বেদীর ওপর হাত দুটিতে ভর রেখে দেহটাকে পিছনে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, "তান্নো!—রামতনু। একটা গীত শোনাও তখন যেমন গাইছিলে। তেমনি।" কি যেন? হ্যাঁ,— সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে—সখি! বিরহীজনের পক্ষে এই বসন্তঋতু যারপর নাই যন্ত্রনাদায়ক! তারপর?

তারপর! তারপর কি এক অজানা কীটানুর সহসা আক্রমণে শরীরের বিস্তারিত সবগুলি ডালপালায় ঝড় উঠলো দুরন্ত বেগে। কেন্দ্র থেকে উৎসারিত স্নায়ুর বিদ্যুল্লেখাতে গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ হোতে লাগল অসংখ্য চিত্রাবলী, অতীন্দ্রিয় শব্দের প্রহার মস্তিষ্কের কোষে কোষে! রামতনু অন্তর্গত অনুভবে বুঝে নিতে পারে স্বণিলশীর্ষ পর্বত চূড়ার অতি স্পর্শকাতরতা, ভ্রমরের গুঞ্জন, অরণ্যের এলোকেশ, চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে চিরায়ত নদীটির কোমল পরশ···

গুণ্ গুণ্ করে গেয়ে যায় রামতনু: মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলি সদনে- প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ বিলস রতিরভস হসিত বদনে—হে

রাধিকে! রতি-আবেশে হাস্যবদনে মনোরম রতিকুঞ্জে হরির সন্নিধানে গমনপূর্বক বিহার কর ॥—কুচযুগল বিকম্পিত হওয়াতে তোমার বক্ষঃস্থ হার দোদুল্যমান! নবোদগত অশোক-কিশলয়ে নির্মিত মনোহর শয্যা বিরচিত রয়েছে, তুমি এই রতিকুঞ্জে কৃষ্ণসমীপে যাও—বিহার কর!—প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ বিলস কুচকলস তরল হারে ॥···

···মাথার শিয়রে কেবল জলের শব্দ, জলকণার উড়ে আসা সৌরভ, বাতাসের তপ্ত তাড়নার সঙ্ঘর্ষে দিশাহারা রামতনু ধরিত্রীর অনুপুঙ্খ অবয়ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে চলে শাশ্বত ভ্রমর অনন্ত মোহনাকাঙ্খী সঙ্গমের আদিম প্রয়াগে—কুসুমচয় রচিত শুচিবাসগেহে। প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ বিলস কুসুম সুকুমার দেহে—হে রাধিকে! তোমার শরীর পুষ্পাপেক্ষাও কোমল. তুমি পুষ্পময় পবিত্র গৃহে হরিসমীপে যাও—বিহার কর॥ চলমলয়পবন সুরভিশীতে। প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ বিলস রতি বলিতললিতগীতে।—হে মুগ্ধে! কেলিমন্দির মলয়-মারুত চালিত বায়ুতে সুগন্ধী ও সুস্নিগ্ধ। তুমি কৃষ্ণ-সকাশে গিয়ে—অনুরাগ সহকারে সঙ্গীতের তালে তালে বিহার কর॥···

···সহসা নয়ন মেলে চরম বিস্ময়ে মুক হয়ে যায় রামতনু! ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কোথায় এসেছে ও! এ কোন্ জগৎ? নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত দৃষ্টিতে পরিচিত জগতের রূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে প্রতিভাত হয়। এ কোন্ জগত অজ্ঞাতে গড়ে উঠল ওর চারিদিকে? সহসা কোনও উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। শারীরিক এক অবসাদ নেমে আসে চোখে। চোখের সামনে নৃত্য করতে থাকে কুয়াশায় ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো তন্দ্রার অলস পরদা। নিদ্রায় ভার আসে চোখ, সচেতন মনের চাপ সরে যায় দূরে, সরে যায় যুক্তি, বুদ্ধি নিয়মের ভার। কেবল অনুভূত হয় এক মহাসৃষ্টিপ্রবাহ; কোথায় ভেসে চলে যায় এই সৌরজগত অনির্দেশ্য মহাশূন্যতার গর্ভে···রামতনুর অবচেতন থেকে জেগে ওঠে প্রবহমান মহাসৃষ্টির সঙ্গে নিজের লীনতার মুহূর্তজাত এক প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা! অবিস্মরণীয়-মুহূর্ত! বোধের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে ওর গভীরতম সত্যরূপের কল্যাণেশ্বরীকে—যখন তাঁর এবং ওর চেতনার

মধ্যে গভীর রাত্রি নামে তিন ভুবন আবৃত করে—নেমে আসে গভীর শান্তির রাত্রি !···

* * *

বেশ কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর হজরত মহম্মদ গওস্ সা' আজই পথ্য করেছেন। জমাদিউস্বানি। (আশ্বিনমাস) অপরাহ্ন বেলা। আজই পথ্য করেচেন তাই দ্বিপ্রহরের নিদ্রা সুখটুকু বাদ দিয়েছেন তিনি। এক মনে কিতাব ইল্‌মে-চার্‌খিয়াৎ (জ্যোতিষ বিদ্যার বই) পড়ছিলেন। বা বলা ভাল যে পড়তে চেষ্টা করছিলেন। আসলে, মনঃসংযোগ করতে পারছিলেন না। অসুস্থ তিনি ছিলেন। তবে তা সামান্য বুখার (জ্বর) ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁকে একটু দুর্বল করে ফেলেছিলো তা অবশ্য ঠিক। বুখারের ধরণটা একটু অন্যরকমের ছিল ! এমন ধরণের বুখার তার আগে কোনদিন হয় নি যে এমন কম্‌জোরি করে দিয়েছে। কিন্তু, তবু তাঁর বিশ্বাস যে সামান্য বুখারই তাঁর হয়েছিল। তিনি যে কিতাব্ পড়তে পড়তেও মাঝে মাঝে অন্য চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিলেন, তার আসল কারণ রামতনু, তাঁর স্নেহের তান্নো ! তিনি তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন একদিন, তাঁর স্নেহের, আদরের তান্নো হঠাৎই কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। না, তান্নোর আচরণে, কথাবার্তায় ভক্তিতে বা শ্রদ্ধায় কোন রকম ত্রুটি ঘটে নি। তবু, হঠাৎ হজরতজীর কেন যেন মনে হলো তাঁর তান্নো বেটা রাতারাতি একজন পাকা-মানুষ বনে গেছে ! রাতারাতিই যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। চলনে-বলনে চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা অস্থিরতা, চঞ্চলতা ! স্থির হয়ে দুদণ্ড যেন বসতে পারছে না কোথাও। এটা গওস্ সা' লক্ষ্য করেছেন। এবং সেজন্যই তিনি চিন্তিত। মুখে যদিও তান্নোকে তিনি কিছু বলেন নি। এটা তিনি জানেন যে তান্নোর প্রকৃতি সাধকের। অতি উচ্চমার্গের সাধক—সঙ্গীত সাধক হবার প্রতিটি লক্ষণ,গুণাবলী তান্নোর মধ্যে বর্তমান। এবং কে না জানে—সাধককে একাসনে, নিভৃতে বসে যেমন ধ্যান করতে হয়, তেমনই প্রকৃত সঙ্গীত-সাধককে অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে দীর্ঘ সময় রেওয়াজ করতে হয়।

এ তো আর ধরে বেঁধে করিয়ে নেবার বস্তু নয়। আপন মনের তাগিদেই সাধক ধ্যান করেন বা রেওয়াজ করেন। আর এইখানেই, তিনি লক্ষ্য করেছেন, তান্নো কেমন যেন অমনোযোগী হ'য়ে পড়েছে। এ তো কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়; সুলক্ষণও নয় সাধক জীবনের প্রারম্ভে। তান্নোর প্রকৃতিও এমন অ-দৃঢ় নয়। তবু কেন এমন ঘটনা ঘটলো বা ঘটছে? কদিন ধরে এই ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে আছেন। যখন তাঁর কাছে আসে তান্নো, কুশল মঙ্গল জিজ্ঞেস করে তাঁর; তিনি জবাব দেবার ফাঁকে-ফোকড়ে তান্নোর দিকে তাকিয়ে দেখেন! বুঝতে চেষ্টা করেন কেন হঠাৎ এমন অস্থিরতা চঞ্চলতা দেখা দিল এই সদ্য-যুবার মনে! সঠিক অনুধাবন করতে পারেন না হজরতজী। যদিও সংসারে থেকে, সংসারের পথে পথেই আজীবন ভ্রমণ করেছেন তিনি, কিন্তু কখনও সংসারের পাকে-চক্রে জড়িয়ে পড়েন নি। তাঁর সাধক প্রকৃতিই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে দেয়নি। তবুও, এ কথা তো সত্য যে সাংসারিক অভিজ্ঞতার পুঁজি তাঁর মোটেও সামান্য নয়। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে তান্নোর সাম্প্রতিক অবস্থা বিশ্লেষণে অনেক তথ্য দিয়েছে। কিন্তু সেইগুলির প্রকৃত স্বরূপ তাঁকে যেন ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে জন্যই তিনি বিচলিত বোধ করছেন। তাঁর অন্যমনস্কতা বেড়ে যাচ্ছে। কিতাবে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছেন না। কেবলই অন্য চিন্তা এসে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে।

কিতাব একপাশে রেখে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালেন তিনি। শরীরটা একটু বেজুত্‌ই লাগছে। তবু তিনি ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ডানদিকের শেষের ঘরটা তান্নোর। এখন তো ওর ঘরেই থাকার কথা। এখন তো বাড়ীর বাইরে বেরুনো নিরাপদ নয়। বাবুর শা'র বিরুদ্ধে রাজপুত রাজারা একত্র হয়েছেন। সঙ্গে মহারাণী মৃগনয়ণীও আছেন। অতি দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। সে জন্যই সন্ধ্যার পর রাণীর আদেশে লোকজনের চলাচল সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য সে কারণে তান্নোর রাজবাড়ীতে যাওয়াতে কোনই অসুবিধা ছিল না। আসলে রাণী মৃগনয়ণী স্বয়ং কয়েকদিন তান্নোকে

যেতে বারণ করেছেন। অন্তত তান্নো তাঁকে এমনই বলেছে। তিনি আর প্রশ্ন করেন নি। একটা জঙ্গ (যুদ্ধ) সুরু হ'তে যাচ্ছে। মহারাণী স্বভাবতই ব্যস্ত থাকবেন। গীত-বাদ্যের আসরও বসবে না।

তিনি এসে দাঁড়ালেন তান্নোর ঘরের দরজায়। দরজা ভেজানো। কোন শব্দ নেই ভিতরে! একটু অবাক হলেন গওস সা'! তান্নো কি অবেলায় নিন্দ্‌ যাচ্ছে? তবে কি ওর তবিয়ৎ খারাপ! না। তা তো নয়। আজ সকালেই তো ও এসেছিল তাঁর ঘরে। খোঁজ খবর নিয়ে গেছে তাঁর। রসুই ঘরে গিয়ে তাঁর জন্য কি পথ্য, কেমন ভাবে পাকাতে হবে, তা বলেছে রসুয়েকে। (পাচিকা)।

তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন, "তান্নো বেটা!"

রামতনু এক মনে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছিলো। হঠাৎ হজরতজীর ডাক কানে যেতেই চম্‌কে মুখ তুলে তাকালো। ওর দুই চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। তাকিয়ে থেকেও বুঝতে যেন খানিকটা সময় গেল।—তারপর তাড়াতাড়ি কলম রেখে ব'লে উঠলো, "আব্বাজী! আপনার তবিয়ত তো ঠিক আছে?"

"আমি ঠিক আছি, বেটা! তুমি কি করছিলে?"

"আমি নূতন ভাবে সুরবিন্যাস করে একটা নূতন রাগ তৈরী করছিলাম।"

আচ্ছা! নূতন রাগ তৈরী করছিলে? কি লিখছিলে যেন দেখলাম?"

"হ্যাঁ। স্বরগম লিখে রাখছিলাম।" রামতনু জবাব দিল।

"স্বরগম! স্বরগম লেখা তুমি কার কাছে শিখেছো?"

'কারো কাছে শিখি নি। নিজে নিজেই শিখে নিয়েছি। পুরানো সঙ্গীত শাস্ত্রের কিতাব পড়েছি। সেই সব কিতাবের কোন কোনটাতে বলা আছে যে কিভাবে স্বরগম লিখতে হবে। কিন্তু সেই রকম পদ্ধতি আমার একদম পছন্দ নয়। তবে আমি তো আর কোন তৈরী গীতের স্বরগম করছি না। আমি নিজে একটা নূতন রাগ তৈরি করেছি।

তার স্বরগম তো আমাকেই তৈরী করতে হবে।" আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে রামতনু বলল।

হজরত গওস্‌জী চমৎকৃত হলেন! তবু জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি হঠাৎ নূতন রাগ তৈরী করছো কেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো রামতনু। তারপর মৃদু স্বরে বলল, "মনকে শান্ত করবার জন্য।"

"কেন? তোমার মনে কি কষ্ট ছিলো?"

আবারও খানিক চুপ করে রইলো রামতনু। তারপর একটু বা অসাচ্ছন্দ্য স্বরে বলল, "আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো আমি সব ভুলে যাচ্ছি। তো আজ সারাদিন ধরে কয়েকটা রাগ-রাগিণী মিশিয়ে নূতন একটা রাগ তৈরী করতে পারলাম। মনে হলো দেবী বীণাপাণি আমার সঙ্গে আছেন।"

"তোমার বচপনের কথা তো আমি বিশেষ কিছু জানি না। তোমাদের গাঁও তো বিহট। সেখানেই তোমার জন্ম। সেই গাঁও তো এই শহর থেকে বেশী দূরেও নয়। সেখানে তোমার বচপন কেমন কেটেছে। তোমার যা মনে আছে আমাকে একটু একটু বলতো? তোমার লিখাই-পঢ়াই কি গাঁওয়ের মক্তব-মাদ্রাসায় হয়েছে? না মা-বাবার কাছে করেছো।

ছোটবেলার কথা বচপনের কথা মনে হতেই রামতনু একদিকে যেমন আনন্দ বোধ করলো, তেমনি দুঃখ বোধে ভারাক্রান্ত হলো ওর মন। ও বলতে লাগল, "আমার তো সব কথা মনে নেই। তবে গাঁয়ের একমাত্র পাঠশালায় আমি পড়েছি। সেই পাঠশালার একমাত্র আচার্য ছিলেন তাউজী প্রভঞ্জন চতুর্বেদী। বলতে বলতে দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল রামতনুর। চুপ করে গেল ও।

গওস্‌জী বুঝলেন। রামতনুর কোনও দুঃখের স্থানে স্পর্শ লেগেছে। তিনি তাই কথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি শুরুতে কার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছো?

"কারো কাছেই না। আমি এমনিই শুনে শুনে শিখে নিতাম। কোন তৌহার-পরবে মেয়েরা গীত করতো। সেই সব গলায় তুলে নিতাম। কোন বান্‌জারা-ফকির গাঁয়ে এলে তারা যখন গান করতো, সেই সব শিখে নিতাম। তারপর আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে দীপাবলীর সময় আমার বাবা কাশী থেকে, এই গোয়ালিয়র থেকে ওস্তাদদের নিয়ে যেতেন। দুদিন ধরে খুব মহ্‌ফিল বসতো। আমি সেই সব গান তো সব বুঝতে পারতাম না। কিন্তু একদম নকল করে নিতাম। তারপর আমাদের গাঁয়ের নদীর পারে, কোন চট্টানের ওপর বসে একা একা গাইতাম। বাবা অবশ্য আমার সেই সব গান শোনে নি। তবে মা নিশ্চয়ই বলতো। আমার বাবাও তো ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন। কিন্তু আমাকে শেখান নি। তবে বলেছিলেন যে কাশীতে গিয়ে শেখার বন্দোবস্ত করবেন। সেই সুযোগ তো তাঁর হয়নি।"

"কেন ? কি অসুবিধা ছিল ?" গণ্ড্‌স্‌জী প্রশ্ন করলেন।

"অসুবিধা কিছুই ছিল না। কাশীতে যাবার কিছুদিন পরেই তো আমি আচার্য গুরুদেব হরিদাস স্বামিজীর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। তিনিই বাবার কাছ থেকে আমাকে বৃন্দাবনের আশ্রমে নিয়ে যান। আমার সব শিক্ষা তাঁরই কাছে। যেমন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দীক্ষা পেয়েছি তাঁরই কাছে। তেমনি বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থের পাঠও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি"

"তিনিই কি তোমাকে বিভিন্ন রাগ মিশিয়ে নূতন রাগ সৃষ্টি করা শিক্ষা দিয়েছেন ?

'না। এ আমি নিজে থেকেই করেছি।"

"কি ভেবে করেছো ?"

"তা তো জানি না। তবে আমার ভেতর থেকে নূতন একটা কিছু করার তাগিদ আমি সব সময়ই অনুভব করি।"

"হাঁ। এই হলো সৃষ্টির তাগিদ। তাম্নো বেটা ! তোমাকে কয়েকটা কথা বলি, মনে রেখো। যে রাগ-রূপের রীতি নীতি মেনে সঙ্গীত করে, আবার প্রয়োজন বুঝলে সেই রীতি নীতি ভেঙ্গে নূতন রীতি নীতি

তৈয়ার করে নিতে পারে, সেই অধিকার কার থাকে বল তো ?"

'আব্বাজী ! আপনি কি সঙ্গীতের দেবতার কথা বলছেন ?"

হ্যাঁ ! তোমার মধ্যে সেই দেওতার কৃপা রয়েছে ! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। কখনও যেন ঘমণ্ডী (অহঙ্কারী) হয়ে যেও না। তোমার যখন যেমন ইচ্ছা হবে তেমনই করবে। নির্দিষ্ট, বাঁধা পথে যদি তোমার গান করতে ইচ্ছা না হয়, তুমি তোমার মনের মত করে, সুর লয় তাল ভাঙ্গবে, গড়বে, নূতন নূতন ভাবে রাগ-রাগিনী তৈয়ার করে নেবে। সকলের সামনে, বড় বড় ওস্তাদদের সামনে, সেই গান গেয়ে শোনাবে। তাতে প্রশংসা যেমন পাবে, নিন্দাও তেমনই হবে। কেউ কেউ হয়তো বলবে যে তুমি পবিত্র রাগ-রাগীনির রূপান্তর করে তাদের খুন করেছো। রাগের চোটে তারা তোমাকে গালাগাল করবে। হয় তো অভিশাপ দেবে। কিন্তু তুমি কখনও তাতে ভয় পাবে না। এই দুনিয়ায় এমন কোন নিয়ম-কানুন নেই যে তা কোনদিন পাল্টানো যাবে না। বেশক্ ! সকলে এই কাজ পারে না। কিন্তু তুমি পারবে। খারাপ যদি কখনও তুমি কিছু করে ফেলো তো তোমার মনই তোমাকে তখন বলে দেবে যে এটা ভাল হলো হল না। তখন তুমি নিজেই সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তুমি খোদ্‌মোখ্‌তার (স্বাধীন), তুমি কলাবন্ত, কলাদক্ষ। তুমি যা তৈয়ারী করবে, তাই নুতন সৃষ্টি হবে। এই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি থেকে অন্ত পর্যান্ত যত কিছু কাজ হয়েছে, সবই তো তোমার মধ্যে রয়েছে। এবার তোমার খুশীমত তুমি ভাঙ্গো, গড়ো। আমি জানি তুমি তা পারবে। তোমার মধ্যে সেই তেজ আমি দেখতে পেয়েছি।'

রামতনু বিহ্বল হয়ে হজরত্‌জীর কথাগুলি শুনছিল। কোন কথা ওর মুখে জোগালো না। জোগালেও বলতে পারতো না। ওর দু চোখের কোল বেয়ে টপ টপ্ করে ঝরে পড়ছিলো ধারা অশ্রু !

গওস্‌জী রামতনুর মাথায় ডান হাত রাখলেন।'—তুমি সময় করে আমার ঘরে এসে একবার।" বলে ধীর পায়ে উঠে চলে গেলেন।

... ...

রাজপুত রাজাদের শক্তিশালী আর্যাবর্ত গড়ে তোলার সাধ সাধই

রয়ে গেলো। কানুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী পরাস্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। জাহিরুদ্দীন বাবুরের অসামান্য রণকুশলতা এবং দুর্জয় সাহসের সামনে দাঁড়াতেই পারলো না রাজপুত চমূ। বাবুরের হিন্দুস্তান বিজয় সম্পূর্ণ হলো। দিল্লীর সিংহাসনে বেশ পাকা পাকি ভাবেই তিনি বসলেন। সুরু হলো নূতন যুগ। মুগল যুগ।

তবে, রাজপুত রাজাগণ কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন যে বিজয়ী রণনেতা বাবুর মোটেও অহেতুক পীড়ন, অত্যাচার বা হত্যালীলায় মেতে উঠলেন না! বিস্ময়েরই ব্যাপার! তারা কিন্তু শুনেছিলেন অন্য-রকম। যে বাবুর শাহ্‌র ধমনীতে একদিকে তৈমুরলঙ এবং অন্যদিকে চেঙ্গিস্ খানের রক্ত বহে যাচ্ছে অর্থ্যাৎ পিতৃকূল এবং মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই যে রক্তধারা মশীকৃষ্ণ—তার আচারে-ব্যবহারে কিন্তু বিপরীত ভাবই পরিস্ফুট! পরাজিত রাজাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদয় এবং সম্মানজনক ব্যবহারই করলেন। কেবল অধীনতার অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েই সবাইকে মুক্ত করে দিলেন তিনি। রাজারা নিশ্চিন্ত হলেন। দিল্লীকে দেয় বাৎসরিক করের পরিমাণ স্থির করে দিলেন বাবুরের প্রধান সেনাপতি। রাজারা তাই মেনে নিয়ে যে যার রাজ্যে ফিরে গেলেন। শাসন কার্য্য আগের মতই চলতে লাগল। প্রজারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো রাজ্যে রাজ্যে। চিরাচরিত ভারতবর্ষ ইতিহাসের আর এক পর্বে প্রবেশ করলো।...

নিত্য দিনের মত আজও ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে স্বর-সাধনার জন্য প্রস্তুত আসনে বসলো রামতনু। কিন্তু কেবল বসাই হলো। গত কয়েকদিনের মত আজও প্রতি মুহূর্তে স্বর-সাধনায় বিঘ্ন ঘটতে লাগল! বাহিরের কেউ নয়। বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তার মন। মনই ওর বশে নেই ইদানীং! কারণগুলি ও অনুমান করতে পারে অবশ্যই। কিন্তু প্রতিরোধ করার শক্তিই যেন ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে ও! কিন্তু এই চিন্তার নাগপাশ থেকে তো ওকে মুক্ত হ'তেই হবে। নচেৎ এই সর্বনাশা কর্মনাশা চিন্তা ওর সমগ্র অস্তিত্বই ধ্বংস করে দেবে যে! কারণ, মনের সঙ্গে সঙ্গে

শরীরও যে চঞ্চল স্বভাবতঃই। এবং এই চাঞ্চল্যের অবসান এখনই না ঘটালে আরও কি বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে—তা তো জানা নেই! আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রামতনু।

শয্যার ওপরে তাকিয়ার পাশ থেকে পিতার স্ব-হস্তে অনুলিপিকৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীখানি তুলে নিল ও। ফিরে এসে আসনেই বসলো। একমনে ধ্যাননিমগ্নস্বরে পাঠ করতে লাগল: ওঁ বন্ধুক-কুসুমাভাসাং···ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং—কালীং রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ···পীনস্তনীং আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্ন-মুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম।—যিনি বন্ধুকপুষ্পবর্ণা···যিনি ত্রিনয়না ও রক্তবসনা···যাঁহার পাদপদ্মযুগলে রত্নখচিত নূপুর শোভিত···উর্ধ্বমুখ স্তনযুগলশোভিতা,-যিনি অমৃত বর্ষিণী রশ্মিযুক্তা রত্নখচিত মুকুট ধারিণী সেই শিবপ্রিয়া কালীকে আমি বন্দনা করি।—···জয়ংদেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।—জয় দাও, যশ দাও, এবং আমার শত্রু নাশকর। (কাম-ক্রোধাদি।)···

অনেকক্ষন ধরে পাঠ করার পর মন ওর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। তখন দেবী বীণাপাণির মূর্তি ওর ধ্যানে আবির্ভূত হলো: দোর্ভির্যুক্তা—চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা—হস্তেনৈকেনপদ্মং সিতমপি চ শুকং পুস্তকঞ্চাপরেন। ভাসা কুন্দেন্দু শঙ্খ স্ফটিক মণিনিভা ভাসমানা সমানা—সা মে বাগ্দেবতেয়ং নিবসতুবদনে সর্বদা সুপ্রসন্না॥···অনন্যমনা হয়ে বারে বারে জপ করতে লাগল ও। দুচোখ দিয়ে কখন অবিরল ধারা বহে চলেছে সেই বোধও ওর তখন নেই। ও যেন এই জগত সংসারের ধূলিমলিন পরিবেশের বাহিরে চলে গেল।

···হজরত গওস্ নিজের ঘরে, মেঝের ওপর আসন পেতে বসেছিলেন। তাঁর হাতের জপমালা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঞ্চালনে পরপর ঘুরে যাচ্ছিলো। কিন্তু সামান্যতম মনোনিবেশও তিনি করতে পারছিলেন না ইষ্ট প্রভুর ধ্যানে। তিনি আজ সত্যই বিচলিত। তাঁর নিজের জন্য নয়। পুত্রবৎ রামতনু—তান্নোর জন্য। তিনি নিশ্চিত করে কিছুই বুঝতে পারেননা। কিন্তু তাঁর আদরের স্নেহের তান্নোর মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। মনে হয় কি যেন একটা ঘটেছে। অথচ

তান্নো মুখ ফুটে কিছু বলেও না। থাক। তিনি আর জানার জন্য কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করবেন না। তাঁর হঠাৎই মনে হলো এবার তান্নো বেটাকে সংসারী করে দিতে হবে। তাহলেই হয় তো ওর বিষন্নতার ভাব কেটে যাবে। তিনি মন স্থির করলেন। তান্নোকে তিনি আসতে বলেছেন। ও এলে ওকে তিনি বিবাহের প্রস্তাব দেবেন। তান্নো সম্মতি দিলে তিনি উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করবেন। রাণী মৃগনয়নীর সঙ্গেও এ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। তান্নোকে যে মৃগনয়নীও প্রাণাধিক ভালবাসেন এবং স্নেহ করেন—তা গওস্ সা'র অজানা নয়!

মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরে তিনি যেন অনেকটা স্বস্তি পেলেন। আসন ছেড়ে উঠে তিনি কাগজ আর কলমদানি নিয়ে পুনরায় বসলেন। একখানি পত্রের মুসাবিদা করতে সুরু করলেন রাণী মৃগনয়নীর উদ্দেশ্যে। পত্র শেষ করে আর একবার পড়ে নিচ্ছেন, এই সময় রামতনু ঘরের দ্বারে এসে উপস্থিত হলো: "আব্বাজী! আমাকে আসতে বলেছিলেন?"

"হাঁ বেটা! এসো! আমার কাছে এসে বসো!" হজরত স্নেহের স্বরে ডাকলেন।

রামতনু হজরতজীর সামনে মেঝেতেই বসে পড়ল। ওর চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করলো না। চুপ করে বসে রইলো। হজরতজী চোখ বুঁজে একমনে মালাজপ করে যাচ্ছেন। রামতনু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। সরল, পবিত্র মুখ হজরতজীর। এমন দেবদুর্লভ মুখমণ্ডলের সামনে দৃষ্টি স্বতঃই নুয়ে পড়ে। হজরতজীর পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে স্থির বসেছিল রামতনু। একটা আশঙ্কার কাঁটা হঠাৎ ওর প্রাণের মধ্যে ব্যথা হয়ে বাজলো কি? ও ঠিক বুঝতে পারলো না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সামান্য হলেও বিচলিত হলো একটু। সজ্ঞানে প্রশ্রয় দিতে চাইল না যদিও। আসলে, এই যে ওকে চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছে। হজরতজী ওকে বসতে বলে চোখ বুঁজে আবার জপে মগ্ন হয়েছেন; সেটাই বুঝি ওর এই ক্ষণিক বিচলতার কারণ। ও

নিজেও একটু বা বিস্মিত হয় মনে মনে ! হজরতজীর কাছে বসে এমন ভাব ওর কোন দিন হওয়া তো দূরের কথা, এমন ভাব যে মনে আসতে পারে তেমনটিই ও কোনদিন কল্পনা করে নি ? অথচ, আজ, এই ক্ষণে, ও অস্বস্তি বোধ করছেই একটু। হজরতজীর এই নৈঃশব্দ ওকে চিন্তিত করে তুলছে।

"তান্নো বেটা" ! হজরত গওস্ মৃদু স্বরে ডাকলেন।

ঈষৎ চম্‌কে উঠে রামতনু মুখ তুললো ! বলল, "বলুন আব্বাজী !"

"এখানে গোয়ালিয়রে এসেছো তা প্রায় এক বছর হতে চলল ! তাই না ?"

—হ্যাঁ, আব্বাজী ! রামতনু বলল।

তুমি তো কাশী থেকে, তোমার মাতা-পিতার দেহত্যাগের পর সোজা বৃন্দাবনে গিয়েছিলে স্বামীজীর আশ্রমে। সেখান থেকে গোয়ালিয়রে আসবার আগে, আর অন্য কোথাও যাওনি, বা যেতে হয় নি তোমাকে ?"

রামতনু হজরত গওস্ সা'র কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলো না। আর কোথায় যাবে ! কেনই বা যাবে ?—সেকথাই ও মুখে বলল ঃ না, আব্বাজী ! আর কোথায় যাবো ! কেনই বা যাবো ?"

"আমারই একটু ভুল হয়েছে প্রশ্ন করা।" গওস সা' বলতে লাগলেন, "আসলে আমি জানতে চাইছিলাম যে তোমার পিতার দিক থেকে বা তোমার মাতার দিক থেকে কোন রিস্তেদার আত্মীয়-স্বজন কি নেই তোমার ! নাকি আছে, তুমি জান না ? তোমার মাতা-পিতা জীবিত থাকতে কোন দিন তেমন রিস্তেদার কখনও কি কেউ এসেছে, তুমি দেখেছো ? বা তোমরা কোনদিন কোথাও কারো বাড়ীতে বেড়াতে গেছো কি !

রামতনু এইবার নিশ্চিত বোধ করলো। সোজাসুজিই বলল যে তেমন কোন রিস্তেদার-আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে বলে ও জানে না। কেউ কেউ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু মা-বাবার মুখে ও তেমন কিছু শোনে নি। বা তাঁদের জীবিতকালে তেমন কেউ কোনদিন ওদের বাড়ীতে এসেছে বলে ও মনে করতে পারে না।

রামতনুর কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন গওস্‌জী। তারপর ঈষৎ বিষন্নস্বরে বললেন," তবে তো ইস্-ভরী-দুনিয়ামে-এই বিশাল দুনিয়াতে, তুমি একেবারে একা! সামনে তোমার এতবড় জীবন! এমন উজ্জল ভবিষ্যৎ! আর এই দুরূহপথ, এত দূরের পথ, তুমি একা কিভাবে পাড়ি দেবে? সে তো সম্ভব নয়! সে তো তুমি পারবে না কিছুতেই!" গওস্‌জী বেশ চিন্তিত মনেই কথাগুলি বললেন। রামতনুর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন তিনি।—"তান্নো বেটা! সাধনার পথে নানা বিঘ্ন। তোমাদের দেবী সরস্বতী, তুমি কি জানো, খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। সহজে তাঁর কাছে কাউকে যেতে দেন না। সুয়োগ পেলেই সাধন ভ্রষ্ট করে অপথে বিপথে-কুপথে নিয়ে গিয়ে কোন সাধকর সমস্ত সাধনার সর্বনাশ করে দেন! সাধকাকে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হয়।' এবং এই এগিয়ে যাবার জন্যই সাধককেও শরীরের কথাটা ভাবতে হয়! যেমন সময়ে আহার গ্রহণ প্রয়োজন; তেমনই শরীরের কিছু ধর্মপালনও অত্যাবশ্যক।"

রামতনু গওস্‌সা'র কথাগুলির তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারছে না। ও চুপ করে কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আব্বাজীর মুখের দিকে। গওস্ সা' এই মুহূর্তে চোখ বুঁজে বসে আছেন। অবশ্যই কিছু ভাবছেন। কিন্তু তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে কোনরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই।

তিনি চোখ মেলে তাকালেন। রামতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: "তান্নো বেটা! আমার তো অনেক বয়স হয়েছে। মানুষের জীবনের তো কোন ঠিক-ঠিকানা নেই! যিন্দেগী আর মওতের কথা কে বলতে পারে! সবই আল্লাহ্‌তালার ইচ্ছা! আমি যদি আজ মরে যাই, তবে এই শাকুন (শান্তি) আমার থাকবে কি আমার তান্নো বেটা আছে; আমি ওর মধ্যেই বেঁচে থাকবো। এখন আমার সেজন্যই একটা চিন্তা। আমার তান্নো বেটার তো এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই! আমি মরে গেলে ওকে কে দেখবে? যদি হঠাৎ বিমার পড়ে যায় তো ওর দেখভাল্ কে করবে? সময় মত খাচ্ছে কি না, খাচ্ছেই

বা কি? আর সঙ্গীত-সাধনা—সে তো সামান্য জিনিষ নয়। হেলা-ফেলার নয়। ওকে যদি সব কিছু নিয়েই ভাবতে হয়, তবে কাজ করবে কখন? এইসব চিন্তা আজকাল আমার খুব হয়। আমি ফকির মানুষ। আমার যিন্দেগী একরকম ভাবে কেটেছে। বাকী দিনও কেটে যাবে। কিন্তু তুমি এখন নওজোয়ান। তোমার তো পুরা যিন্দেগী রয়ে গেছে। তোমার জন্য তো ফকিরি নয়। তোমাকে সংসারী হতে হবে। আমি তোমার শাদী দিয়ে দিই। আমার বিশ্বাস তাতেই তোমার ভাল হবে। তুমি এখানেই চিরদিন বাস কর। তোমার আর অন্য কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এখন বল! তোমার কি মত?"

হজরত গওসের এই অযাচিত অনুগ্রহে মনে মনে অত্যন্ত কৃতার্থই বোধ করল রামতনু! কিন্তু বিবাহের নামে কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর মনের ভেতর তো জেগে উঠলো না! ওর বয়সী নবযুবকের পক্ষে যা একেবারেই স্বাভাবিক না। কিন্তু, ওর যে মনে পড়ে যায় সেই কুয়াশা ঘেরা জ্যোৎস্না, জলের শব্দ, সেই লীনতার পবিত্র মুহূর্ত-এক নব বোধের আস্বাদ! যেন ওর নবজন্ম গ্রহণ। সেই ব্যাকুল অস্থিরতার পর শান্তির শুভদ-প্রলেপ!....

না। আকাঙ্ক্ষা আর কিছু নেই ওর। কেবল বোধের গভীরে কোথাও একটা কৌতূহল, একটি প্রশ্ন হয় তো বা রয়ে গেছে!

কিন্তু এই মুহূর্তে ওর ভাবনার জগতে ওই সবের কোন ঠাঁই নেই। এখন ও বাস্তব জগতের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারছে। অস্থিরতার কুয়াশা সরে গেছে ওর চোখের সামনে থেকে। এখন ও সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। ওর সাধনার পথে কোন রকম প্রতিবন্ধকতাই ও আর মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এখন পূর্ণ সিদ্ধিলাভই ওর একমাত্র কাম্য। সে জন্য সব রকম কৃচ্ছ সাধনার জন্যই ও নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। বিবাহ যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তবে ওর কোন আপত্তি নেই। তবু ওর মনে একটা অস্বস্তির পীড়ন হচ্ছে। সত্য কথা, আব্বাজীর গৃহে ওর কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু এও তো সত্য যে ওর নিজস্ব কোন উপার্জন নেই। ওর বাবা যা রেখে গেছেন তা সামান্য না হলেও প্রচুর

তো নয়। সেটুকুর ওপর ভরসা করে সংসার যাত্রা নির্বাহ—না। সে সম্ভব নয়। অথচ, বিবাহ অর্থই তো আর একজনের ভারবহণ! তারপর....এই খানেই ওর দ্বিধা! অথচ, আব্বাজী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন উত্তরের প্রত্যাশায়। কি উত্তর দেবে। কেমন ভাবে দেবে। ভাবছিল রামতনু।

অবশেষে ও বলেই ফেলল, "আব্বাজী! আমি নিজেই আপনার আশ্রিত। আমার তো উপার্জন বলতে কিছুই নেই। এই অবস্থায় এখনই সংসারী হওয়া কতখানি সমীচিন হবে বুঝতে পারছি না!"

হজরত মহম্মদ গওস রামতনুর কথায় সামান্য মনঃক্ষুণ্ণ হলেন অবশ্যই। তবে রামতনুর আশঙ্কার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করতে পারলেন না। রামতনু যে এখনও নিজেকে তাঁর আশ্রিত বলে মনে করছে, এই ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁরই। রামতনুর মধ্যে নিশ্চিন্ত বোধ জাগিয়ে তোলার দায় এখন তাঁর নিজের। তিনি যে রামতনুকে আপন সন্তান বলেই গ্রহণ করেছেন, এবং সন্তানের ভাল মন্দের দায় যেমন পিতার, সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে সংসারে প্রতিষ্ঠা করানোর দায়ও তেমনই জনক-জননীর। এখন তো তিনিই রামতনুর একাধারে জনক এবং জননী; এ কথাগুলি রামতনুকে বুঝিয়ে বলা দরকার। কোথাও যেন ওর আত্মসম্মানে ঘা না লাগে!

মৃদু হেসে তিনি বললেন," তান্নো বেটা! তোমার বাস্তব বোধের আমি প্রশংসা করি। দোষ হয়তো, হয় তো কেন, নিশ্চয় আমারই। নচেৎ এখনও তুমি নিজেকে এই বাড়ীতে আশ্রিত বলে মনে করবে কেন!—"

—রামতনু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে কি বলতে গেল, তিনি হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন।—"

"আমি বুঝেছি তোমার মনের কথা। তবে আজ থেকে তুমি জেনে রাখো যে আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী তুমি। এ বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব মহারাণী মৃগনয়নীর কাছ থেকে আজ্ঞা আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত আমি করছি। ইতিমধ্যে একটা পত্রের মুসাবিদাও

করেছি। আজই মহারাণীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমার প্রস্তাবে কখনই আপত্তি করবেন বলে আমি মনে করি না। বরং আমার স্থির বিশ্বাস, তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে যত রকমের সাহায্য প্রয়োজন হবে, তা দিতে তিনি কার্পণ্য করবেন না। কারণ, তিনিও তোমাকে আপন সন্তানবৎ মনে করেন যে এ ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"...

...হজরত গওসের পত্রখানি হাতে নিয়ে চুপচাপ আপন কক্ষের মধ্যেই পায়চারি করছিলেন মৃগনয়নী। বারে বারে তাঁর চোখের সামনে সেই রাত, সেই মোহময়ী-রাত্রির আলেখ্যগুলি ভেসে ভেসে উঠছিল। রামতনুর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বরে গীত শ্রীরাধিকার বিরহ-ব্যাকুল চঞ্চলতা সেই ক্ষণে যেন তাঁরই হয়ে উঠেছিল। রভস-ভরা রজনীতে অভিসারে যেন শ্রীরাধিকা নয়, তিনিই বেরিয়েছিলেন। কি বাঁশির আহবান তিনি শুনেছিলেন রামতনুর গায়ন ভঙ্গিমাতে, সংসারাভিজ্ঞা রমণী হয়েও নিজেকে বেঁধে রাখতে তিনি পারেন নি। বিচ্যুতি? সংসারের দৃষ্টিতে অবশ্যই। কিন্তু বিসদৃশ কিছু নয়। অন্ততঃ তিনি তা মনে করেন না। তবে!

তবে, অস্বস্তির কারণ হ'তে পারতো রামতনু। কিন্তু তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে রামতনু আর দশজনের মত নয়। কোথায় যেন ওর মধ্যে এক নির্লোভ, নিরাসক্ত সাধক বিরাজমান। কিছুতেই ওর ওপরে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। আপন সাধনার জগতে ও সর্বদা এমনই তন্ময় হয়ে আছে যে সংসারের শত লোভ শত বাহু বিস্তার করেও ওকে বদ্ধ করে রাখতে পারবে না। ওর ভেতরের দৈবী শক্তির কঠিন প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। অন্ততঃ এই অভিজ্ঞতাই আজ তাঁর মধ্য যৌবনে নবলব্ধ জ্ঞান! তিনি একদিকে যেমন সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন বুঝি বা ক্ষণিক দুর্বলতার চরম মূল্যই তাঁকে দিতে হবে ভেবে। অন্যদিকে তেমনই প্রত্যাশার অতি ক্ষীণ রশ্মিটুকুও কি তিনি অম্লান রাখতে সচেষ্ট ছিলেন না! আর এইখানেই

ছিল তাঁর অস্বস্তির কারণ। রামতনু আবার আকাঙ্ক্ষা করলে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। দায়ী করতে পারতেন না রামতনুকে। নিজের সৃষ্ট অগ্নিতে নিজেকেই তিলে তিলে বিসর্জন দিতে হতো! তা ঘটে নি।

রামতনু আগেই মতই সহজ, সরল, স্বাভাবিক। সন্ধ্যার মহ্ ফিলে এসেছে আসছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলছে পূর্ববৎ সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। সঙ্গীত-সভার বিভিন্ন ওস্তাদগণ এই নবীন যুবক, প্রতিভাবান সঙ্গীতকারের গুণের প্রশংসায় শতমুখ। তিনিও লক্ষ্য করেছেন। দিনে দিনে বিকশিত হয়ে উঠছে রামতনু। অসাধারণ গুণী যুবক!

তবুও মৃগনয়নী নিজের কাছে একটা সত্য অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি আজও যেন তেমন করে সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পারেন নি। যদিও রামতনুর প্রতি স্নেহের আকর্ষণে তাঁর এতটুকুও ঘাটতি পড়ে নি। হজরত গওস যে তাঁর পত্রে লিখেছেন—মহারাণীও যে রামতনুকে আপন সন্তানবৎ স্নেহ করেন—তা তিনি জানেন,—এ তথ্য এতটুকুও মিথ্যা না।

রামতনুর বিবাহ প্রস্তাবে মৃগনয়নী তাই আনন্দিতই হলেন। এই আনন্দের গূঢ় কারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট। কারণ, তাঁর অস্বস্তির সম্ভাব্য এবং নিশ্চিত অবসান। তবে কি মহম্মদ গওসের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়েছে? রামতনুর হাবভাবে বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছেন কিছু? হ'তেও পারে। সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত হজরত মহম্মদ গওস্ যথার্থ সাধু প্রকৃতি, ঋষি প্রতীম ব্যক্তি। তাঁর অনুভূতিতে জীবের সকল স্পন্দন সহজেই ধরা পড়ে বা পড়তেও পারে। মৃগনয়ণীর পক্ষে তা জানা বা এক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব নয়। তবু হজরত গওসের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞই বোধ করলেন মনে মনে।

স্থির করলেন মৃগনয়ণী এ বিবাহ যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করে ফেলতে হবে। একটা বিষয় যে হজরত গওসের অজানা, তা মৃগনয়ণী পত্র পাঠ করে সহজেই বুঝে নিতে পারলেন। প্রেমার প্রতি রামতনুর অনুরাগের

সম্বাদ অবশ্যই তিনি জানেন না। জানলে তার উল্লেখ থাকতই। তিনি কেবল তাঁর তাম্নো বেটার জন্য সর্বগুণান্বিতা, বিশেষতঃ সঙ্গীত অনুরাগিনী একটি কন্যার অনুসন্ধান করতে বলেছেন। ভালই হলো। প্রেমাকে হজরতজী ভাল করেই চেনেন। চেনেন প্রেমার পরিবার পরিজনদের। রামতনুর সঙ্গে প্রেমার মত সঙ্গীত-সিদ্ধা কন্যার মিলন—এর চেয়ে সার্থক মিলন আর হতেই পারে না। মৃগনয়নী লক্ষ্য করেছেন প্রথম থেকেই। দিনে দিনে রামতনু আর প্রেমা উভয়ের গুণে মুগ্ধ। এখন তো ওদের অনুরাগ আরও গম্ভীর। তাও মৃগনয়নীর দৃষ্টি এড়ায় নি। অতএব, পাত্র-পাত্রীর দিক থেকে আপত্তির প্রশ্ন নেই। হজরতজীর দিক থেকেও আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। বাকী তাহলে প্রেমার বাবা-মা এবং পরিজন যারা আছেন, তাদের মতামত গ্রহণ। সেদিক থেকেও কোন অসুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন না। তবু কথাবার্তা বলে নিতে হবে। দায় যখন তাঁর ওপরেই চাপিয়েছেন হজরত গওস। তারপর অনুষ্ঠানের আয়োজন।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে মেন্‌কাকে দিয়ে সংবাদ পাঠালেন দপ্তর সচিব বীরেন্দ্র সিংজীর কাছে। তিনি যেন প্রেমকুমারীর বাবা-মা-কে একবার রাজমহলে আসতে বলে পাঠান। মহারাণীর জরুরী দরকার।...

... ...

বরপক্ষ এবং কনে পক্ষ, উভয় পক্ষেরই কর্ত্রী হলেন রাণী মৃগনয়নী। পৌরোহিত্য সম্পাদন করলেন স্বয়ং হজরত মহম্মদ গওস্। প্রেমকুমারী বা হোসেনী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে রামতনু পাণ্ডের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হলো। সুসম্পন্ন হলো রাজকীয় মর্যাদায় এবং আড়ম্বরে। রাণী মৃগনয়নী কন্যাসমা প্রেমা এবং স্নেহের ও আদরের রামতনুকে অজস্র উপঢৌকন এবং বিস্তর টাকা দিলেন যৌতুক স্বরূপ। হজরত মহম্মদ গওসও দিলেন অনেক উপহার এবং অনেক টাকা। তাঁরা উভয়েই বর কনে'কে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

এই বিবাহ উপলক্ষ্যে রাণী মৃগনয়নী রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সঙ্গীতবিদ ও যন্ত্রবিদ ওস্তাদগণকে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। বিবাহের রাত্রে বসলো সঙ্গীতের আসর। যদিও সমবেত ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই যাঁরা গায়ক গাইলেন; বীণ বাজালেন কেউ, কেউ সেতার বাজিয়ে শোনালেন। কিন্তু মুখ্য আকর্ষণ ছিল বর-কনে দুজন। বস্তুতঃ, বেশ কয়েকজন ওস্তাদ—যারা এতাবৎ রামতনু নামে কোন যুবকের বিস্ময়কর সঙ্গীর-প্রতিভার কথা পরম্পরায় শুনেছিলেন, আগ্রহ তাদেরই ছিল সব চেয়ে বেশী। এখন রামতনুকে নিতান্তই এক কাঁচা বয়সী যুবক দেখে তাঁদের মনে একটা তাচ্ছিল্যের ভাবই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য কেউ কেউ এমনও ভাবছিলেন যে রাণী মৃগনয়নীর মত অসামান্য সঙ্গীতগুণী যে ছেলেকে নিজে তালিম দিয়েছেন, সে মোটেও সামান্য যুবক নয়। আর হোসেনী তো নিতান্তই বালিকা। তার সম্পর্কে কেউ বিশেষ কিছু জানেন না। কেবল যে সব ওস্তাদ নিয়মিত রানীর সঙ্গীত সভায় আসেন তারা জানেন যে বালিকা হোসেনীও সঙ্গীতের মস্তবড় গুণী। অচিরেই সে সঙ্গীত জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবেই।

একে একে সমবেত সকল ওস্তাদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন-রামতনু এবং হোসেনীকে-স্বয়ং মহারাণী মৃগনয়নী। একপ্রস্থ শরবৎ পানের পর রাণী আহ্বান করলেন রামতনুকে আসরের মাঝে এসে বসতে। রাণী নিজেই তম্বুরা বেঁধে নিয়ে বসলেন।

রামতনুর গান সুরু হলো।

রামতনু নিজেরই রচিত বাণীতে সুরারোপ করে ধ্রুপদ গান সুরু করল। প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত ওস্তাদগণ চমৎকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। তাদের এতকালের শিক্ষার ওপরে কিসের যেন ছায়াপাত ঘটলো। তারা যেন সুর ও বাণীর ঘূর্ণী পাকে পড়ে দিশাহারা।—

—সুরের অন্তরে কত না অদ্ভুত শক্তি লুকিয়ে আছে। ধ্বনির বিচিত্র সংঘাত অন্তরে কত না ভাবের উন্মেষ ঘটিয়ে আপ্লুত করে,

কৃপাবদ্ধ করে। আর এ সকল তখনই অনুভূত হয় যখন একজন প্রকৃত সঙ্গীতের প্রতিভা তাঁর গানের দ্বারা হৃদয়ের গহীনতম আঁধারে সুরের আলোক পৌঁছে দেন, বানীর অন্তর্গূঢ় সত্বার যথার্থ প্রকাশ ঘটিয়ে দেন। একদিকে সুর তরঙ্গের মধুর কল্লোল, অন্যদিকে শব্দ-বাক্যের অলৌকিক ধ্বনি মাহাত্ম্য মিলে মিশে অনুভবের জগতে তোলে আলোড়ন, প্রত্যাশা জাগিয়ে উন্মুখ করে তোলে।—সে অনুভব কাব্যের, সে অনুভব সঙ্গীতের। এ দুইয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ, কারণ অতি সূক্ষ্ম তন্তুর মত কিছু অবরোধ করে আছে যা গানের অবকাশে ক্ষণে ধরা দেয় ক্ষণে হারায়। তবুও শেষ কথা, অনুভবের ঘরে ঝঙ্কার তোলা, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা, অনুরাগে ভরে তোলা। না হলে কি বা সঙ্গীত কি বা বাণী? কেবল কথার কলধ্বনি আর সুরের চক্রান্ত। কর্ণপীড়াদায়ক, মর্ম্মযন্ত্রনার কারণ।

সমবেত ওস্তাদগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে রামতনুর গানের আলোর বর্ণচ্ছটা, অতুলনীয় রূপ শোভা যেন সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করছিলেন।—

রামতনু বোল—তানের বিভূতি দিয়ে, বাণী ও সুর-ছন্দের বাঁধনে বেঁধে, রাগের এমন আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করল, যেখানে বাণী ও সুর, ছন্দের নিঃশব্দ আনাগোনার সুযোগে যেন আঁখ-মিচৌলী (লুকোচুরি) খেলতে লাগল। আর ওস্তাদগণ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে 'বাহবা' দিতেও ভুলে গেলেন।

সঙ্গীতের লয়ে বাণী ও সুরের পলকে তুফান, পরমুহূর্তেই শান্ত, ধীর আবির্ভাব। সমের বাগীচায় তাদের উভয়ের ধরা ছোঁয়ার খেলা; খেলার মধ্য দিয়েই মিলন আর বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদেই বা কত রঙ, মিলনও বা কত না মধুর। উপস্থিত কোন ওস্তাদই এরূপ অপূর্ব ঘটনা আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁরা গ্রাস করে নিচ্ছেন রামতনুর স্বর্গীয় কণ্ঠনিঃসৃত মহাধ্রুপদের অমৃতধারা।—

রাগের তূণীর থেকে বেছে বেছে সুরের কলম্ব তুলে নেয় রামতনু ; বাণীর সাজি থেকে চয়ন করে নেয় অক্ষরের শ্লিষ্ট ধ্বনিগুচ্ছ ; ছন্দ ও মাত্রার মিলন ক্ষণে বাণীর পুষ্পামৃতে আস্নাত সুরের শরগুলি রামতনুর কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে ছেয়ে যায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণের আকাশ ; মুহূর্তের জন্য ঘটে সেই পরিচয়। তারপর যখনই তারা শ্রুতির দিগন্তে যায় বিলীন হয়ে, সেই মুহূর্তেই ফুটে ওঠে সঙ্গীতের আসল স্বরূপ, আপন দীপ্তিতে ভাস্বর, আপন সুষমায় স্নিগ্ধ।—

সঙ্গীতের এমন মহিমময় মূর্তি, এ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল সমবেত সকল শ্রোতার তো বটেই, ওস্তাদগণেরও। তাদের গর্বিত, উন্নত মস্তক আপনা হতেই যেন অবনত হয়ে গেল এই যুবক সঙ্গীতস্রষ্টার সামনে। একবাক্যে তাঁরা স্বীকার করে নিলেন রামতনুর আশ্চর্য্য প্রতিভাকে। ধ্রুপদাঙ্গের গানে বাণী বৈচিত্রের এমন অপূর্ব মহিমান্বিত প্রকাশ আর কে কবে দেখেছে ?···

আজ সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। সারা প্রকৃতি থম্‌থম্‌ করছে। বড় বড় গাছ সব সটান সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা পাতারও শরীরে যেন প্রাণ নেই। সব স্থির। বাতাস যেন সব অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে! কেবল থেকে থেকে কি একটা পাখী ডেকে ডেকে উঠছে। আর দূর দিগন্তে কালো মেঘের পটচিত্রের উপর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো অঝোর ঝরঝর ধারা ধরণীর বুকে নেমে আসতে পারে। অথচ আশ্চর্য্য এই, এতক্ষণেও একটি বুঁন্দ (ফোঁটা) পাণী ঝরে নি। বেলা তো কম হয় নি। তিনবার ঘণ্টা বাজানোর শব্দ শুনেছে হোসেনী। তাছাড়া, সকাল থেকে নিত্য কাজও তো কম নয়। সেগুলো সবই সেরে ফেলেছে হোসেনী। স্বামীর ঘরে এসে নিয়মের ব্যত্যয় যে একেবারেই ঘটেনি, তা নয়। তবে তা প্রথম কয়েক দিনই মাত্র। তারপর যেদিন স্বামী রামতনুকে রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করে উঠে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে

রেওয়াজে বসতে দেখেছে, হোসেনীও সেদিন থেকেই একই সময়ে শয্যা ছেড়ে পবিত্র হয়ে পাশের কক্ষে গিয়ে রেওয়াজে বসেছে।

রেওয়াজ সেরে হোসেনী সোজা রসুই ঘরে এসে নিজের হাতে সকলের জন্য নাস্তা তৈয়ারী করে। অবশ্য, পাচিকাও সাহায্য করে। তারপর নিজের হাতে হজরতজী এবং স্বামীকে নাস্তা খাইয়ে নিজেও সামান্য খেয়ে নেয়। তারপর বাগীচায় যায়। ভোর বেলাতেই মালী ফুল গাছে জল দেয়। হোসেনী ঘুরে ঘুরে দেখে। গাছের গোড়ায় আগাছা কিছু থাকলে নিজে পরিস্কার করে দেয়। ফিরে এসে হজরতজীর কাছে বসে। শাস্ত্রকথা, তত্ত্বকথা তো শোনেই, অনেকরকম কিস্‌সা বলেন হজরতজী। সবই তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। মাঝে মাঝে স্বামী রামতনুও এসে বসে। তখন সঙ্গীতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। রামতনু নূতন কোন গীত রচনা করে, সুরারোপ করে। গেয়ে শোনায়। হজরতজীর মত নেয়। হোসেনীর মতও নেয়। কিছু কিছু সংশোধন করে। তবে সব-সময়ই না। হজরতজী বা হোসেনী সংশোধন করতে বললেও রামতনু মেনে নেয় না। হজরতজী নিজে প্রাচীন রাগ রাগিনীর অনুরাগী। সেই পদ্ধতিতেই তিনি সঙ্গীত বিদ্যা লাভ করেছেন। তিনি গেয়ে শোনান। এবং দেখিয়ে দেন কোথায় কি ভাবে রামতনুর বিচ্যুতি ঘটছে। মুসলিম সাঙ্গীতিক রীতির দিক থেকে হজরতজীর গায়ন পদ্ধতি নিখুঁত। সে প্রাচীন কানাড়া, সারং বা কল্যাণ—যাই হোক।

রামতনুও মুসলিম সাঙ্গীতিক রীতির সঙ্গে যেমন উত্তমভাবে পরিচিত, তেমনি প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের ধারার সঙ্গেও পরিচয় ওর অতি ঘনিষ্ঠ। আচার্য্য হরিদাস স্বামীজীর শিক্ষা ধারা ওর রক্তের ধারায় প্রবাহিত। তৎসত্ত্বেও নতুন রাগ-রাগিনী সৃষ্টির অদম্য আগ্রহ ওর সীমাহীন। দুই সঙ্গীত রীতিরই কিছু কিছু গ্রহণ বর্জন করে ও সৃষ্টি করতে চায় নূতন রাগ। সৃষ্টি করেও। প্রাচীন কানাড়া, কল্যাণ, সারং বা মল্লার রাগগুলিকে দুই রীতির মিশ্রণে

নব নব রূপে সাজিয়ে নেয়। তারপর ও গেয়ে শোনায়। যে যে স্থানে বিচ্যুতি ঘটেছে বলেন হজরতজী বা হোসেনী, ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে। তারপর আবার গেয়ে শোনায়। বারে বারে গেয়ে শোনায়।

হজরতজী অনুভব করেন। তাঁর সহৃদয় সংবেদনশীল মন উদ্বেলিত হয়। সমস্তটুকু না বুঝলেও বা তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে না পারলেও, এটুকু তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে রামতনুর এই অভিনব সৃষ্টি অচিরেই হিন্দুস্থানের সঙ্গীত জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলবে। কে কতখানি স্বীকার করে নেবেন সে সব স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু রামতনুর মধ্য দিয়ে যে সঙ্গীত প্রতিভা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হচ্ছে তা সূর্য্যের মতই অনন্ত দীপ্তিশীল। ওর প্রতিভার ভাস্বরে আর সকলেই ম্লান হয়ে যাবে। মনে তাঁর আজ যথার্থই আনন্দ। রামতনুর মধ্যে সেই উজ্জ্বল রশ্মি তিনি আগেই দেখেছেন।...

...অনেকক্ষণ ধরেই বিচিত্র ধ্বনিময় শব্দ মাঝে মাঝে কানের পর্দায় এসে ঝঙ্কার তুল্‌ছিলো হোসেনীর। ঠিক সচেতন মনে শুনছিলো না সে। পাচিকা বুড়ি একটু বেশী কথা বলে। তার অনর্গল কথার স্রোত থামাতে মাঝে মধ্যে হুঁ-হাঁ দিতে হচ্ছিলো হোসেনীকে। পুরীগুলো জ্বলে না যায়, সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছিলো। ফুলে উঠলেই ঝাঁজরা দিয়ে তুলে পাশে রাখা থালিতে সাজিয়ে রাখছিলো পুরীগুলো। সব ভাজা হয়ে গেলে আগে আব্বাজীর থালিটা সাজিয়ে নিয়ে তাঁর ঘরে গেল। আব্বাজী কি গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। চোখ তুলে হোসেনীকে দেখে বললেন, "ভাল্লো বেটাকে দিয়েছো?"

মৃদু লাজুক হেসে হোসেনী বলল, এইবার দেবো। আপনি আগে।

হজরত গওসও হাসলেন। বললেন, "তুমি এই কয়েক মাহিনা এসে তো আমার অভ্যাসই পাল্‌টে দিয়েছো! তুমি যখন চলে

যাবে তখন এমন প্যায়ার ভরে কে আমাকে খাওয়াবে, কে দেখ্‌ ভাল করবে বলো তো ?”

ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে হোসেনী বলল, “চলে যাবো কেন ?”

কিছুটা বা বিষণ্ণ স্বরে গওসজী বললেন, “কেন ? তান্নো বেটা তোমাকে কিছু বলে নি ? ও তো আবার হরিদাস স্বামীজীর আশ্রমে ফিরে যেতে চাইছে। বলছে যে ওর শিক্ষা তো এখনও শেষ হ'য়ে যায় নি। স্বামীজীর কাছে এখনও ওর ঢের শিক্ষণীয় আছে। তা, কথাগুলো নিশ্চয়ই ঠিক। তান্নো বেটার যে খওয়াঈস্‌ (আকাঙ্ক্ষা) তা পুরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। যদিও আমি যিন্দগীভর্‌ (সারাজীবন) সঙ্গীত আর তার ক্কাওয়ায়েদ (ব্যাকরণ) নিয়ে শেষ তক্‌ চর্চা করেছি। তবে তা সব পুরানি রীতি-কানুন মাফিক্‌। তান্নো বেটা আরও বেশী কিছু করতে চায়। আর আমার উম্মীদ (আশা) যে তান্নো বেটা তা পারবে। বেটি। তোমাকে কয়েকটা কথা বলি। আমি যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চা করেছি, সঙ্গীতের ফাল্‌ছাফাহ্‌ (দর্শন) নিয়ে ভেবেছি, তেমনি ইল্‌মে-চার্‌খিয়াৎ (জ্যোতিষ শাস্ত্র) নিয়েও খুব চর্চা করেছি। তান্নো বেটা এক হিসাবে আমারই মানস-সন্তান। তান্নোর বাবা যেদিন তান্নোর মা-কে (অবশ্য তখন তান্নোর মা নয়,) আমার কাছে নিয়ে এলো, সেদিন সেই দুঃখিনী মৃত-বৎসাকে দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল। তো সঙ্গে সঙ্গে আমার আরও মনে হয়েছিল যে এই মায়ের চেহ্‌রাহ্‌তে একটা পাক্‌ (পবিত্র) রওশ্‌নী (জ্যোতি) আছে। আর সেই রওশ্‌নী সোজা জান্নাৎ (স্বর্গ) থেকে স্বয়ং খোদাই পাঠিয়ে দিয়েছে, এমনই অনুভব হলো আমার। আমার বদনের রোম্‌ রোম্‌ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। মা তো আমার সসত্ত্বা হয়েছে। বীজ সবে রোপিত হয়েছে। তাই এখনও মা টের পায়নি। তো আমি মুখে কিছু বললাম না। আশীর্বাদ করে একটা কবচ্‌ দিলাম। বলে দিলাম যে বাচ্চা হলে যেন তার গলায়

এটা বেঁধে দেয়। কোন চিন্তা নেই। মৃতবৎসা দোষ মায়ের কেটে গেছে। আর ভয় নেই।—

—"তা, ছেলে হবার পর ওর মা-বাবা একবার এসেছিল আমার কাছে। তারপর তো এত বছর পর আবার এলো। আবার চলে যাবে। আবার আসবে।" বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হজরতজী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনেকটা যেন নিজের মনে আবার বলতে লাগলেন, "আমি ফকির মানুষ! আমাকে তো মায়ার বন্ধনে পড়তে নেই! তবু তান্নো বেটাকে তো আমি ছাড়তে পারবো না। এ পর্যন্ত বলেই সচকিত হলেন হজরতজী।—"এই দ্যাখো। আমি কেবল নিজের মনে বকেই যাচ্ছি। যাও বেটি। তান্নো বেটাকে নাস্তাপাণী দিয়ে তুমিও নাস্তা করে এসো। তখন আবার কথা হবে। যাও।"…

নাস্তার থালি নিয়ে স্বামী রামতনুর ঘরের কাছে আসতে আসতেই আবার সেই যন্ত্র-সঙ্গীতের শব্দ ঝঙ্কার ভেসে এল। থমকে দরোজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়লো হোসেনী। কি মোলায়েম অথচ গম্ভীর আওয়াজ। এক একবার মনে হচ্ছে বীণ্। কিন্তু পরক্ষণেই কান পেতে শুনে বুঝতে পারে হোসেনী যে ঠিক বীণ্ তো নয়। অনেকটা বীণের মতো হলেও এ নিশ্চয়ই অন্য যন্ত্র। কিন্তু কি; কোন্ যন্ত্র? মনে হচ্ছে যেন বুকের তটে সমুন্দরের ঢেউ এসে পড়ছে আর গম্‌গম্ গম্ভীর আওয়াজে বুক ভরে যাচ্ছে! অবর্ণনীয় সেই গভীর অপরিস্ফুট অনুভব! ধরতে গিয়েও ঠিক ধরতে পারে না হোসেনী। মনের মধ্যে নানা ভাব তরঙ্গের উচ্ছ্বাস! নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারে না সে। তবুও ধৈর্য্য ধরে ক্ষণিক বিরতির অপেক্ষা করে। এক সময় শব্দঝঙ্কার থামতেই ভেজানো দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে হোসেনী।

প্রথমেই রামতনুর কোলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে শোওয়ানো বস্তুটির ওপর নজর পড়ে হোসেনীর। অনেকটা যন্তর কিংবা বীণের মতই দেখতে যন্ত্রটি, কিন্তু দুটোর কোনটাই যে নয়, তাও

বুঝতে পারে হোসেনী। যন্তর্ কাঠ থেকে তৈরী হয়। দুই বাযু (হাত) লম্বা আর ভেতরটা থাকে ফাঁপা। দুদিকে থাকে উপরের দিকে খানিকটা করে কেটে বাদ দেওয়া দুটো কাদ্দু (লাউ)। দণ্ডটার উপর জুড়ে থাকে ষোলটা পর্দা আর তাদের উপর দিয়ে পাঁচটা লোহার তার দুই ধারে খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। বীণ্ ও অনেকটা যন্তরের মতই। কিন্তু তাতে তো তিনটে, বা পাঁচ, কি সাত, ন'টা থেকে একুশ কিংবা একশো তার থাকতে পারে। অথচ এখন স্বামীর কোলে যে যন্ত্র রয়েছে সেটা কি। বেশ ভাল-ভাবে লক্ষ্য করে দেখলো হোসেনী। মাত্র ছটা তার লাগানো। বীণেরই মত। কিন্তু বীণ নয়। আর তার গুলোও তো লোহা বা তামার নয়। মনে হচ্ছে, তাঁতের তার। মুখে কিছু বলে না হোসেনী। পাশের একটা নীচু চোপায়ার ওপর ধীরে নাস্তার থালিটা নামিয়ে রাখে সে। স্বামীর যন্ত্রের ওপর নত মুখের দিকে তাকায়। তখনই মুখ তোলে রামতনুও। চোখে চোখ পড়তেই হাসি ফোটে মুখে। দুজনেরই। হোসেনী বলে মৃদু স্বরে: "নাস্তা করো জী!"

যন্ত্রটা কোল থেকে এক পাশে নামিয়ে রেখে রামতনু বলে: তুমি নাস্তা করেছো? আব্বাজী নাস্তা করেছেন?"

"আব্বাজীকে দিয়েছি আগেই। আমি পরে করবো। তুমি আগে খাও!"

"না। আজকে তুমিও আমার সঙ্গে খাবে। এসো।" বলেই হাত ধরে টেনে নিয়ে একেবারে নিজের কোলের উপর বসিয়ে নেয় স্ত্রীকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে হোসেনী বলে ওঠে—আই মা।" দুহাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে। রামতনু স্ত্রীর লজ্জাটুকু উপভোগ করে। তারপর একটা পুরী তুলে নেয় থালি থেকে। স্ত্রীর মুখের কাছে ধরে। কৃত্রিম গাঢ় স্বরে বলে: "প্রেমাজী। একটু হাঁ করো তো।" দুচোখ বুঁজে ছোট হাঁ করে প্রেমা। স্বামী ওকে প্রেমা বলেই ডাকে। হোসেনী নয়।···

··নাস্তা শেষ করে, মুখ ধুয়ে জল খেয়ে সামনা সামনি বসে দুজনে। রামতনু পাশ থেকে ওর যন্ত্রটা ফের কোলে তুলে নেয়।

এবার হোসেনী প্রশ্ন করে: যন্ত্রটা নতুন রকম দেখছি। কি এটা?

"আগে শোনো। একটু বাজাই। কেমন লাগে বলবে। তারপর বলবো।"

তুম্বাটা ঠিক করে তারগুলো বেঁধে নিয়ে আলাপ সুরু করে রামতনু।

নায়েকীর তারে পয়লা সুলট পড়তেই প্রেমার বুকের মধ্যে এবং কক্ষের মধ্যে গম্‌গম্‌ করে উঠলো। মুহূর্তে সমগ্র বাতাবরণই পাল্টে গেল যেন। তারগুলির ওপর মসৃন গতিতে খেলা করে যাচ্ছে রামতনুর আঙ্গুলগুলি, দ্রুত অভ্রান্ত সুরক্ষেপ। ক্ষণে ক্ষণে যেন সুরের চিত্র সকল অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে শ্রবণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের পটে। অশ্রুতপূর্ব, অনুপম সুরচিত্রহারে হৃদয়ের অম্বর অলঙ্কৃত হয়ে উঠছে প্রেমার। অজানা, অনামা মধুর আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে সে। তারের উপরে জওয়ার আঘাতে, সুলট-উলটের কারিগরীতে রামতনু সুর-বাগীচাতে একের পর এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত সুরের ফুল ফোটাতে লাগল; জমজমা আর সুঁত-এর গজরা (মাল্য) দিয়ে নয়া নয়া সুরের চালচিত্র অঙ্কন করে যেতে লাগল; তানের ফুলকরি দিয়ে রাগের আরাধনা। শুনতে শুনতে যেন অনুভব করলো প্রেমা—রাগ স্বয়ং মূর্তি ধরে এসে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে। সুরচন্দনের স্নিগ্ধ সুবাসে চারিপাশ আমোদিত। রাগদেবতার মধুর হাসিতে অমৃতধারা। সেই অমৃত ধারায় যেন নিরন্তর অবগাহন করছে প্রেমা।

কখন হজরত গওস্‌জী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুনেছেন প্রায় সমস্তক্ষণ, দুজনের কেউই টের পায় নি। "তান্নো বেটা।" ডাক শুনে ওরা সচকিত হলো। উঠে দাঁড়ালো। রামতনু বলল, "আসুন, আব্বাজী। ভেতরে এসে বসুন।" বলে রামতনু এগিয়ে এল যন্ত্রটি প্রেমার কোলের উপর রেখে।

ঘরে ঢুকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে প্রেমার কোলের উপর রাখা যন্ত্রটির দিকে দেখে গওসজী বলে উঠলেন : "এটা কি যন্ত্র বল তো? আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেকটা বীণের মতো লাগছে বটে, কিন্তু বীণ তো নয়। আওয়াজও বীণের চেয়ে শতগুণ গভীর। এ জিনিষ কোথায় পেলে বলো তো? আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না? যন্ত্রটির কোনও ঘাট-ও (সারিকা) নেই দেখছি। তার রয়েছে দেখছি ছটা।"

রামতনু ঈষৎ লজ্জিত বোধ করলো। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছুটা গর্ব বোধও যে না হলো তা নয়। প্রেমার কোল থেকে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে রামতনু বলতে লাগল, "অনেকদিন ধরেই বীণ যন্ত্রটিকেই একটু এদিক ওদিক করে নূতন একটা যন্ত্র করা যায় কিনা ভাবছিলাম। বৃন্দাবনে, গুরুদেব স্বয়ং বীণ বাজাতেন। সুর-মিলিয়ে গীত গাইতেন। তখন থেকেই আমার এই ভাবনা। আমার কেমন যেন মনে হতো—ধ্রুবপদের সঙ্গে বীণ-এর স্বর ঠিক যেন সমান তালে সমন্বয় করতে পারে না। সব ক্ষেত্রে নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে। ভেবেছি। কিন্তু কাজে কিছু করে উঠতে পারি নি। এখানে এসে ভাবনাটা আবার জোরদার হয়ে উঠলো। তারপর তৈয়ারী করতে আরম্ভ করলাম। এতদিনে এবার পেরেছি। আপাততঃ ছ'টাই তার। তাঁতের তার লাগিয়েছি। আমার তো স্থির বিশ্বাস যে এবার ধ্রুবপদ, চুটকলা বা খিয়ালের সঙ্গে ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্গত করা সহজ হবে। গায়কের গানের আস্‌লি মনোহর রূপও খুলে যাবে। স্বয়ং গায়ক অনুপ্রাণীত হবে।"

"তা হয়তো হবে, প্রেমা বলল, "কিন্তু ছ'টা মাত্র তার দিয়ে বাদ্যের কোমলত্ব বজায় রাখা যাবে কি?"

"নিশ্চয়ই যাবে," রামতনু জোর দিয়ে বলল, "তুমি গান গাও। আমি সঙ্গত করে প্রমাণ করে দেবো।

"কিন্তু আমি অন্য আর একটা কথা ভাবছি।" হজরত গওস বললেন, "তুমি তাঁতের তার লাগিয়েছো। এবং তাও মাত্র ছ'টা।

এতে একটা বিপদ আছে। বরসাতের সময় দেখবে যে তারগুলি ঢিলা হয়ে গেছে। তার ফলে হবে কি স্বরের প্রভেদ ঘটে যাবে। সে জন্যে, আমার মনে হয়, কয়েকটা তামার তার যদি লাগিয়ে নাও, তাহলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।"

"আমারও মনে হয়, তামার তার তো লাগানো দরকারই, তারের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। না হলে বয়েৎ ঠিক ঠিক তৈয়ারী করা যাবে না।" প্রেমা বলল।

"আলবাৎ যাবে!" রামতনু বেশ জোর দিয়েই বলল, এই ছ' তার দিয়ে বাজনাকে মোলায়েম, সুষ্ঠু করে তোলা যাবে। আসলে দেখতে হবে যিনি বাজাচ্ছেন, তিনি কেমন ওস্তাদ। ওস্তাদ যদি যথার্থই পটু হন, সে ক্ষেত্রে, আমার এই ষট্‌তন্ত্রী রবাব—হ্যাঁ, আমি এই যন্ত্রের নাম দিয়েছি রবাব, রুদ্রবীণা বললেও ক্ষতি নেই, এই রবাব দিয়েই যথাযথ সঙ্গত করতে সক্ষম হবেন। বাদকের বাজাবার কৌশলটাই হলো আসল কথা। আমি এই রবাব সে-সব ভেবেই তৈরী করেছি। অবশ্য, আব্বাজী একটা কথা ঠিকই বলেছেন! বরসাতের সময় এই তাঁতের তারগুলি ঢিলা বা আল্‌গা হয়ে যেতে পারে। তবে আমি তারগুলি যে ভাবে বেঁধেছি, তাতে ঢিলা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া, বরসাতের সময় যদি এমনিই একটু ঢিলা করে বেঁধে রাখি তো কোনও ক্ষতি হবে না। যেমন, মৃদঙ্গ, ঢুল বা পাখোয়াজের ছাউনি ঢিলা করে রাখে বরসাতের সময়। আর প্রেমা যে বললে তারের সংখ্যা বাড়াতে তা ভেবে দেখবো। আগে আরও পরীক্ষা করে দেখি। প্রয়োজন বুঝলে বারোটা কি আঠারোটা তার লাগিয়ে নেবো। তখন তামার তার ও কিছু লাগিয়ে নেবো। কিন্তু এখন যা আছে তাই থাক।"

হজরত গওস্ হেসে বললেন, "তাই ভাল। তোমার নিজের তৈরী যন্ত্র। তুমি যেমন ভাল বুঝবে তেমনই করবে। এ ব্যাপারে আমাদের কারো কিছু বলার নেই। থাকতেও পারে না। না

কি বল বেটি ?" প্রেমার দিকে তাকিয়ে অনাবিল হাসি হেসে উঠলেন তিনি।

রামতন্থ আর প্রেমাও হেসে উঠলো।…

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে তিনটে বছর চলে গেল। ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অস্থিরতা ক্রমশঃ যেন রামতন্থকে গ্রাস করে ফেলছিলো। অনুভব করছিলো রামতন্থ একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন। স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। ওর কেবলই মনে হচ্ছিলো যে এভাবে ওর আজীবনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা —সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ, কখনই সম্ভব হবে না। আরও অনেক কিছু এখনও ওর শিখবার প্রয়োজন আছে। কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেই ফাঁক হজরত গওসজীও পুরণ করতে পারবেন না। এবং—হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ওর যে মহারাণী মৃগনয়নীও পারবেন না ওর এই মহাক্ষুধার নিবারন করতে। একথা অবশ্যই সত্য যে মহারাণীর অকুণ্ঠ দানে ওর জীবনপাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বস্তুতঃ, মহারাণীর ঋণ ও বাকী জীবনে কখনই পরিশোধ করতে পারবে না। কেন না, মৃগনয়ণীর একান্ত সাহচর্যেই জীবনের এক নূতন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে ও। কিন্তু সে রূপ যত মধুর হোক, তার আস্বাদনে থাক যত না মনোহারীত্ব, সে রূপ কখনও প্রকৃত সাধককে সম্যক তৃপ্তি দিতে পারে না। বরং তা অতৃপ্তিই জাগিয়ে তোলে। অন্ততঃ রামতন্থ তো তাই অনুভব করে। তা না হলে এই অস্থিরতা কেন? কেন এই অপূর্ণতার যন্ত্রনা ?…

…মৃগনয়ণীও বুঝতে পারেন। স্বীকার করেন রামতন্থর কাছে এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে, সাধনার যে পূর্ণত্ব অর্জনের জন্য ওর প্রবল অভিলাষ, সে পথে কতটুকু তিনি রামতন্থকে এগিয়ে দিতে পেরেছেন তা তিনি জানেন না; তবে নিজেকে নিঃশেষিত করেই তিনি আস্তৃত করে দিয়েছেন ওর সুগম পথ যাত্রায়। এখন বাকী

পথটুকু নিজেরই শক্তিতে এগিয়ে যাবার দায় রামতনুর। এবং এগিয়ে ওকে যেতে হবেই। মধ্য পথে থেমে যাবার অধিকার নেই ওর। সে কথাই অবশেষে বললেন তিনি রামতনুকে: "তুমি আর সময় নষ্ট করো না। তোমার গুরুদেব আচার্য্য হরিদাস স্বামীজীর কাছে চলে যাও এখনই!"...

...মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলো রামতনু। যে কথা ওর মনের মধ্যে বারে বারে জেগে উঠছিলো, যা ও মুখ ফুটে বলতে পারে নি আব্বাজীকে, এমন কি স্বয়ং মহারাণীকেও; সে কথাই আজ মহারাণী স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বলতেই ওর এই কৃতজ্ঞতা বোধ তাঁর প্রতি। দুদিক থেকে ভেবে ভেবেই ওর মন অস্থির হয়ে পড়ছিলো ইদানীং। প্রথমতঃ, ওর নিজস্ব কোন উপার্জন নেই; এই চিন্তাই ওকে পীড়ন করেছিলো বেশী। যতদিন একাকী ছিল, আব্বাজীর স্নেহের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই কাটিয়েছে। ওর পৈতৃক-ধনে আব্বাজী কখনও হাত দিতে দেন নি ওকে। ফকির মানুষ হলেও আব্বাজীর ধন-সম্পদ যথেষ্টরও বেশী পরিমাণেই আছে। এবং একথাও রামতনু জানে যে হজরতজীর সমস্ত উত্তরাধিকার ওরই। কিন্তু, স্বভাবতই লোভী চিত্ত সংসারী মানুষ তো ও নয়। এই সব নিয়ে ও তাই কখনই কিছু ভাবে নি। বিষয় বৈভবে ওর কোন স্পৃহা নেই। ওর বৈরাগী-মন এসবের অনেক উর্দ্ধে।

কিন্তু, এখন, যখন ও সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন জীবনের কিছু কিছু দাবীর প্রতি উপেক্ষা দেখানো আগের মত এত সহজ হয়ে উঠছে না। অবশ্য, একথা সত্য যে আব্বাজী এবং স্বয়ং মৃগনয়ণী মহারাণী যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সামগ্রী উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছেন ওদের বিবাহে, তাতে আগামী বেশ কয়েক বৎসর অতি নিশ্চিন্তেই ওদের চলে যাবে। তারপর?—একক জীবনে এত কিছু ভাবার অবকাশ ওর ছিলই না। ভাবেনিও। ওর কেবল মনে হচ্ছে যে আগামী এই নিশ্চিন্ত বৎসর গুলির সময়

সামাতেই ওকে সব কিছু অতিক্রম করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতেই হবে। এবং এইখানেই ওর মনে জাগছে প্রশ্নের দ্বিতীয় দিক।

যে সাধনায় পূর্ণকাম হওয়া ওর জীবনের একমাত্র ব্রত ; সেই সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধাই লাভ করতে হলে, এখন ওকে আরও কঠোর অনুশীলন যেমন করতে হবে তেমনই আহরণ করতে হবে ওকে আরও সূক্ষ্ম হয়তো বা জটিল সঙ্গীতকলার বিচিত্র রূপাবলী। কিন্তু এই দুর্গম পথের দিশারী হবে কে? ওর মনে এ প্রশ্নের আছে অসংশয় উত্তর। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করাতেই ছিল ওর দ্বিধা। অবশেষে মহারাণীও প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন। নূতন ভাবে, নূতন করে আর কিছুই দেবার নেই মৃগনয়ণীর। রামতনুকে আচার্য্য হরিদাস স্বামীজীর কাছে পুনরায় ফিরে যেতে বলে এই সত্যকেই স্বীকৃতি দিলেন মহারাণী।

এবং স্বস্তি বোধ করলো রামতনু। মনে মনে তো ও প্রস্তুত হয়ে ছিলই। এবার বাস্তবে বিদায় নিতে হবে গোয়ালিয়র থেকে। কাজটি খুব সহজ হবে না যে ও বুঝতে পারলো। আব্বাজীকে মানানো কঠিনই হবে। তবু তিনি নিশ্চয়ই রামতনুর আকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবেন না।

কিন্তু এই ক্ষণে আর এক চিন্তা ওর মনে অস্বস্তির রূপে দেখা দিল। এবার তো রামতনু একা নয়। ওর সঙ্গে থাকবে প্রেমা। কি ভাবে গ্রহণ করবেন আচার্য, গুরুদেব প্রেমাকে। আদৌ গ্রহণ করতে চাইবেন কি। ওকে বিমুখ করবেন না তো! ফিরিয়ে দেবেন না তো! সেক্ষেত্রে কি করবে রামতনু! কি উপায় হবে তখন! ওকে শেষ পর্য্যন্ত তাহলে ফিরেই আসতে হবে! মনোস্কামনা পুর্ণ হবে না ওর। যেটুকু পেয়েছে, শিখেছে, সেটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে! আর বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে, এই দুনিয়ার আর পাঁচজন মানুষের মতো, গাল ফুলিয়ে, বাগাড়ম্বর করে, আমার চেয়ে বড় ওস্তাদ এই পৃথিবীতে আর কে আছে, এই সব বলে, আত্মপ্রতারণা করে যশের দাবীদার হতে হবে ; আর কাপট্যের অন্নে এই শরীর প্রতিপালন করতে হবে ?

অসম্ভব। তা কখনই হতে পারে না। তেমন করে বাঁচার কথা ও কল্পনাও করতে পারে না। তবু এই ক্ষণে বিষন্নতার কৃষ্ণ মেঘ ওর মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে তুললো। ওর কেবলই মনে হতে লাগল প্রেমার বাবা-মা এবং আত্মীয় স্বজনদের কথা। বিবাহের পুর্বে রামতনুকে তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করবার জন্য যথেষ্টই পীড়াপীড়ি করেছিলেন। এমন কি তারা ওর নূতন একটা নামও স্থির করে দিয়েছিলেন—মহম্মদ আতা আলী খাঁ। কিন্তু ঐ টুকুই। রামতনু আপত্তি করে নি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মান্তর গ্রহণও করেনি। প্রয়োজন বোধ করে নি। এ বিষয়ে প্রেমার মনেও কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিলো না।

কিন্তু আজ বৃন্দাবনে আচার্য্যদেবের আশ্রমে ফিরে যাবার ক্ষণে ওর মন কিছুটা চঞ্চল। একটা অস্পষ্ট সংশয়ের দোলায় ও কিছুটা বা অধীর।

...আব্বাজীকে পুনরায় ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মহারাণী মৃগনয়ণীর কাছে বিদায় নিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওয়ানা হলো ওরা। প্রেমার মনে এ সমস্ত প্রশ্ন আদৌ জাগেই নি। স্বামীর সঙ্গে নূতন স্থানে নূতন জীবন শুরু করতে যাচ্ছে, এই আনন্দেই সে উচ্ছ্বল, আত্মহারা।

অশ্ব-শকট তার নিজের গতিতে চলছে। চারিপাশের নূতন নূতন দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলেছে প্রেমাও। তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে স্বামীর চিন্তামগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থম্‌কে যাচ্ছে বটে। পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি মেলে দিচ্ছে দূর দিগন্তের দিকে।

রামতনু ভাবছে। যত ভাবছে ততই নিজেকে বারবার তিরস্কৃত করছে। এমন অসংযত ভাবনা ওর মনে জাগছেই বা কেন? সেই বাল্যকাল থেকে এতগুলি বৎসর যাঁর শ্রীচরণের ছায়ায় থেকেছে; যাঁর অশেষ কৃপাধারায় আস্নাত হয়ে শুদ্ধ হয়েছে; যার অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ হয়েছে, সর্বোপরি, যাঁকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে ও দেখেছে,

আপন পিতার চেয়েও বেশী মান্য করেছে, নিজেকে যাঁর সন্তান বলেই ও মনে করে, তাঁর সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধেয় ভাবনা কেন জাগছে? জাগলেও, সজ্ঞানে ও কেন প্রশ্রয় দিচ্ছে এমন ভাবনাকে? আচার্য্যদেব অবশ্যই এমন অনুদার নন, বা হ'তে পারেন না যে নিছক জাতপাতের দোহাই দিয়ে তিনি পুত্রতুল্য রামতনুকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দেবেন। এ কখনই হ'তে পারে না। তিনি তো কেবল ওর সঙ্গীত গুরু নন। তিনি ওর শিক্ষা গুরু এবং ধর্মগুরুও তো বটেন! তিনি যেমন বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠে রামতনু এবং অন্যান্য শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই ধর্মবিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যাদি নিয়েও তো মুক্ত মনে তাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কই, এমন কথা তো কিছুতেই রামতনু মনে করতে পারছে না যে গুরুদেব ধর্মালোচনা করতে গিয়ে কখনও, কোনও ধর্ম সম্পর্কে এতটুকুও বিরূপ কথা বলেছেন! বরং সব ধর্মেরই অন্তর্নিহিত বক্তব্য যে এক, সে সব কথাই তিনি বারে বারে বুঝিয়ে বলেছেন। তবে হ্যাঁ, একথা এখন মনে করতে পারছে রামতনু যে প্রায় সমস্ত ধর্মেরই বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি কথা বলেছেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিয়েছেন। এবং সেই সূত্রেই হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সর্বাধিক উদারতা বর্তমান, সংস্কারহীন, সঙ্কীর্ণতাহীন যে ধর্ম নিছক ধর্মের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে সর্বাঙ্গীন জীবন-দর্শনে পরিণত হয়েছে; যেখানে সর্বংসহ উদারতাই এই জীবন দর্শনের মূল কথা, এসব কথাও তো তিনি বলেছেন! তিনি তাঁর শিষ্যদের কখনও অনুদারতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন নি। রামতনু এবার সত্যিই মনে মনে লজ্জা অনুভব করতে লাগল। গুরুদেব সম্পর্কে এমনতর ভাবনার প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত হয়েছে ওর পক্ষে! ও মনে মনে গুরুচরণ বন্দনা শুরু করলো।...

...গুরুদেব আচার্য্য হরিদাসস্বামী শান্ত, সস্মিত হাসিমুখে একমনে শুনছিলেন প্রাণাধিক পুত্রসম রামতনুর কথা। রামতনু তাঁর

সামনেই মুখোমুখি বসেছিল। ওর বাম পাশে বসেছিল প্রেমা। দৃষ্টি নত করেই বসে ছিল সে। তবে মাঝে মাঝে মুখ তুলে আচার্য্যের দিকে দেখছিল। কিন্তু পাশে স্বামীর দিকে একবারও ফিরে দেখে নি বা দেখার চেষ্টাও করে নি।

রামতনু নিবেদন করছিলো গুরুদেবের কাছে। বৃন্দাবন থেকে যাওয়ার পর গোয়ালিয়রের সমস্ত ঘটনা। একে একে। যা যা ঘটেছিল। পর পর। বলা শেষ হলে ও গুরুদেবের চরণে প্রণাম করলো। প্রেমাও প্রণাম করলো। তিনি ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত চোখ বুঁজে রইলেন। রামতনু আর প্রেমা দেখলো তাঁর পবিত্র আননে এক উজ্জ্বল আলোকাভাস। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। এবং সস্নেহ স্বরে বললেন : "রামতনু। তোমার মনে যে সঙ্কোচ, যে প্রশ্ন, তা আমি অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারছি। কিন্তু, এ কথা তো তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কোনরূপ জাতিভেদ আমি মানি না। মানুষ হিসাবেই আমার কাছে মানুষের শেষ পরিচয়। আমি তো রামতনু আর মহম্মদ আতা আলীর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। আর বধূমাতা হোসেনী বা প্রেমকুমারী কোনরূপেই আমার কাছে পৃথক না। তোমরা উভয়ে আমার সন্তান। অতএব পিতার কাছে কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধার কোন কারণই থাকতে পারে না। নেইও। তোমরা যেমন এসেছো তেমনই থাকবে। তোমাদের উপস্থিতি, বসবাস, এই আশ্রমের জীবন চর্যায় কোন ব্যাঘাত ঘটাবে বলে আমি মনে করি না। এখন তোমরা যাও। নারায়নকে বলে দিয়েছি। তুমি যে ঘরে থাকতে, সেই ঘরেই এখন তোমরা থাকবে। আশা করি তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। সন্ধ্যার পর আমার গোপালের আরতি শেষে যেমন সঙ্গীত শিক্ষা এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা হয়, তেমনই হবে।"

রামতনু ও প্রেমা আবার গুরুদেবকে প্রণাম করে উঠে বাহিরে এল। গুরুদেবের উদারতায় অন্তরে বাহিরে একান্ত ভৃত্যের মতই

হয়ে গেল রামতনু। আজ এই মুহূর্ত থেকে গুরুদেবই হয়ে গেলেন রামতনুর জীবনের একমাত্র উপাস্য, একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। গুরুমন্ত্র এবং গুরুদত্ত যোগ ওর সর্ব-অস্তিত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরলো রামতনু।...

...দিনগুলি রাত্রিগুলি কোথা দিয়ে চলে যায় খেয়ালও করে না রামতনু। সঙ্গীত সাধনার সর্বাধিক দুরূহ পর্বের মধ্য দিয়ে এখন ক্রমশঃ অগ্রসরমান রামতনু। যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে ওর। কি এক ঘোরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। যখন যে রাগ বা রাগিনীর আরাধনায় ও বসে, চোখের সামনে ও দেখতে পায় দেবদেবীগণ মূর্তি ধরে আবির্ভূত হন। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ওর বক্ষদেশ সিক্ত হয়। মনে মনে অসংখ্য বার শতকোটি প্রণাম জানায়, প্রার্থনা করে, চিরদিন এমনি করেই আমার কাছে ধরা দিও, আর আমি কিছু চাই না।...

...মাঝে মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষাক্রম স্থগিত রেখে গুরুদেব সঙ্গীতের সূত্রেই, বিভিন্ন শাস্ত্রাদি নিয়ে আলোচনা করেন। সেদিন তিনি আলোচনা আরম্ভ করলেন কলাবিদ্যা বিষয়ে :—

—কলাবিদ্যা বলতে তো কেবল শিল্পকলাই বুঝায় না। কলাবিদ্যার অর্থ আমাদের শাস্ত্রে আরও গভীর। কলাবিদ কাকে বলে? তার আগে জানা প্রয়োজন শাস্ত্র কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? শাস্ত্র অর্থাৎ বিজ্ঞান। কলাবিদ্ তাকেই বলে যে কলা-বিজ্ঞান সম্পন্ন। কলা শব্দের অর্থ কি? আমাদের শাস্ত্র বলছে শক্তি। এই শক্তি আসলে কি? এই শক্তিই পরা-প্রকৃতি, মহাশক্তি, যিনি সৃষ্টির আদি কারণস্বরূপিনী। আমরা যে জানি সঙ্গীতে সর্বসিদ্ধি, অর্থাৎ নাদসিদ্ধ হওয়া; এই মহাশক্তিই নাদরূপে জগতের বিকাশ করেছেন। এই নাদ দ্বিবিধ!—প্রথম বর্ণাত্মক এবং দ্বিতীয়, ধ্বন্যাত্মক! বর্ণাত্মক-নাদ বলতে বুঝি যা হতে বেদ বা অপৌরুষেয় মন্ত্রের উৎপত্তি। আর ধ্বন্যাত্মক-নাদ হতে সপ্তস্বর এবং রাগ রাগিনীর উৎপত্তি হয়েছে। এই নাদ বিদ্যাকেই বলা হয় কলাবিদ্যা।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছো যে কলাবিদ্ হতে পারা মোটেও সহজ সাধ্য নয়। একমাত্র গভীর, একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারাই সম্ভব শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ হওয়া।—

হঠাৎ কথা থামিয়ে তিনি প্রেমার দিকে তাকালেন: আজ আর আমি কিছু বলবো না। এখন আমরা গান শুনবো। প্রেমা বেটি আজ আমাদের গান গেয়ে শোনাবে: কি, প্রেমা বেটি। তোমার আপত্তি নেই তো? তুমি তো রাণী মৃগনয়নীর কাছে বালিকা বয়স থেকেই তালিম পেয়েছো। আমি জানি, রাজা মানসিংহ তোমর নিজে ছিলেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অশেষ ভাণ্ডার। তিনি যে দুরূহ কর্ম করে গেছেন, একেবারে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত ধ্রুপদী সঙ্গীতকে উদ্ধার করে, তাকে যথাযথ শোধন করে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন একেবারে একক ক্ষমতায়, তার কোন তুলনা নেই। অবশ্য, একথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মহারাণী মৃগনয়নীর মত সিদ্ধা-সঙ্গীতগুণীকে সহধর্মিণী-রূপে না পেলে এতখানি সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারতেন কি না সন্দেহ।" বলেই এক প্রকার গূঢ় দৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমে প্রেমা এবং রামতনুর দিকে দেখে মৃদুস্বরে হেসে উঠলেন। বলতে লাগলেন, "দ্যাখো আমার ভুল! প্রেমার গান শুনবো তাই আমি আজ আর কিছু আলোচনা করবো না বলে নিজেই কথা বলে যাচ্ছি!" আবার প্রাণখোলা নির্মল হাসিতে ঘর ভরে তুললেন তিনি।

ঘরে উপস্থিত সকলেই সেই হাসিতে যোগ দিল।

প্রেমা হাসিমুখেই বলল: গুরুদেব! গান আমি অবশ্যই শোনাবো। কিন্তু আপনি যে বললেন রাজা মানসিংহ তোমর অন্ধকারে নিমজ্জিত ধ্রুপদী সঙ্গীতধারার পুনরুজ্জীবন করেছিলেন, সে বিষয়ে আরও কিছু বলুন।"

"কেন মা। তুমি তো অতি অল্প বয়স থেকেই মহারাণী মৃগনয়নীর কাছে কাছে ছিলে। তাইলো? তা তিনি তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি?"

"কিছু কিছু অবশ্যই বলেছেন। কিন্তু তখন ওই বিষয়ে, অর্থাৎ সঙ্গীতের ইতিহাস বিষয়ে আমার তত আগ্রহ জন্মে নি।" প্রেমা লজ্জিত স্বরে বলল।

"খুবই স্বাভাবিক। অত কম বয়সে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ না হওয়াই সম্ভব। তবে এসব বিষয় নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা আগেই করেছি, রামতনু এবং এদের, এই নারায়ণ, গোবিন্দা আর বিশ্বনাথের সঙ্গে। এখন সে অবকাশ নয়। তুমি বরং তোমার পতি দেবতার কাছ থেকে সব ধীরে ধীরে জেনে নিও। এখন তোমার সুবিধার জন্য খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে একটুখানি আলোচনা করছি শোন:

"সঙ্গীত বিদ্যার অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলন। সঙ্গীতের মূল উৎস রূপে সঙ্গীত আচার্যগণ সামবেদকেই মেনে থাকেন। বেদএর উৎপত্তি ব্রহ্মা থেকে। এ নিয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। অনেকে বলেন যে দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে পাঁচটি রাগ এবং পার্বতীর মুখ থেকে একটি রাগ—এই ছয়টি রাগের উৎপত্তি হয়। আমাদের ছয় ঋতু, তোমরা জানো। ব্রহ্মা এই ছয় ঋতু অনুযায়ী ছয়টি রাগ উপযোগ করেন প্রথম। যেমন গ্রীষ্মকালে দীপক, বর্ষায় মেঘ, শরৎকালে ভৈরব, হেমন্তে শ্রী, শীতকালে মালকোষ এবং বসন্তকালে হিন্দোল। এই ছয় রাগ এর আবার ছটি করে ভার্যা: অর্থ্যাৎ রাগিনী: মোট ছত্রিশটি রাগিনীর কথাই সঙ্গীতের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেকালের সঙ্গীত আচার্যগণ দত্তিল, বিশ্বাবসু, রম্ভা, অর্জুন, হনুমান, রাবণ, তুম্বুরু, নারদ, নন্দিকেশ্বর ইত্যাদি সকলেই এই বিভাগ মেনে নিয়েই সঙ্গীত চর্চা করেছেন। আদিতে ব্রহ্মাই মহাদেবের অনু-মোদন নিয়ে এই ছয় রাগের সঙ্গে ছত্রিশ রাগিনীর যোজনা করে ভরত, নারদ, রম্ভা, তুম্বুরুদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। এঁরা আবার পরবর্তী কালে অনেকগুলি উপরাগের সৃষ্টি করেন।"

এই সময় প্রেমা বলে ওঠে: গুরুদেব ক্ষমা করবেন। আপনি

সঙ্গীত আচার্যদের মধ্যে হনুমান, রাবণ এবং অর্জুনের নাম বলেছেন। আমি সেই শৈশবকাল থেকে মা বাবার কাছে রামায়ণ, মহাভারতের কথা শুনেছি। তাঁরা যে সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন, তেমন কথা তো শুনি নি। সে সময় কি এই এখনকার মতো সঙ্গীত চর্চা হতো?"

"অবশ্যই হতো। এখনকার চেয়েও বেশী পরিমাণে হতো।" আচার্যদেব বললেন, হনুমান সে যুগে কিষ্কিন্ধার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁর তুল্য জ্ঞানী গুণী সেই সময় কমই ছিল। বিবিধ শাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সঙ্গীত শাস্ত্রেও। তোমরা তো জানোই যে এক সময় তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সচিব। লঙ্কা মহাসমরের কালে। আর সেই সময় লঙ্কাধিপতি শ্রীরাবণও ছিলেন মহাজ্ঞানী পুরুষ শ্রেষ্ঠ। দশবেদবেত্তা রাবণের গুণের অবধি ছিল না। তিনি ছিলেন পরম শৈব। অতি প্রত্যুষে শুদ্ধ হয়ে দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত অর্ঘ্য প্রদান করে তাঁর দিন আরম্ভ হতো। তারপর মহাভারতের যুগে অর্জুন। তিনি কেবল মহাযোদ্ধা নন্, একজন অতি উৎকৃষ্ট নর্তক এবং গায়কও ছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন অজ্ঞাতবাসে কাল কাটাচ্ছিলেন তখন এক সময় তাঁরা বিরাট রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সকলেই গুপ্তবেশে ছিলেন। অর্জুনও বৃহন্নলা নামে বিরাট রাজার সঙ্গীত অধ্যাপক রূপে তাঁর কন্যা উত্তরার শিক্ষক নিযুক্ত হন।—তা এসব তো বহুযুগ আগের কথা।"—

"তা হোক, গুরুদেব! আপনি আরো কিছু বলুন। সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চা কি কেবল আমাদের দেশেই হয়েছে? দুনিয়ার অন্য কোথাও কি সঙ্গীতের অনুশীলন, অধ্যয়ন ছিল না?" প্রেমা আগ্রহী মুখে তাকালো গুরুদেবের দিকে। আচার্য্য দেখলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি।

তিনি হেসে বললেন, "সঙ্গীত চর্চা দুনিয়ার সমস্ত সভ্যদেশেই প্রচলিত ছিল এবং আছে। তোমরা সিকন্দরের (আলেকজাণ্ডার) নাম অবশ্যই শুনেছো! যবন দেশের মহা শক্তিশালী রাজা।

যিনি আমাদের এই হিন্দুস্থান বিজয়ের উদ্দেশ্যে বহুশত বৎসর পুর্বে অভিযান করেছিলেন। যদিও তাঁর আকাঙ্ক্ষা পুরণ হয় নি। তাঁর দরবারেও গীত এবং বাদ্যের চর্চার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। সেই যবন দেশেরই এক দৃষ্টিহীন গায়ক সিকন্দরের বহু বৎসর পুর্বের এক মহাসমরকে কেন্দ্র করে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি সেই দুই মহাকাব্য বীণা বাজিয়ে গান করে শুনিয়ে দেশবাসীকে মুগ্ধ করে দেন। রোমক দেশে, পারস্য এবং বোগদাদেও সঙ্গীত ও বাদ্য চর্চার প্রচলন ছিল এবং আছে। আর এই হিন্দুস্থানের সর্ব প্রান্তেই উৎকৃষ্ট গায়ক বাদকদের কখনও অভাব ঘটেনি। গজনীর মাহমুদ যখন কনৌজ আক্রমণ করেন, সেই সময় সেখানে ছয় সহস্রাধিক গায়ক এবং বাদক ছিলেন। যে সোমনাথ মন্দির বারে বারে লুণ্ঠন করেছেন মাহমুদ সেই মন্দিরে দুইশতেরও অধিক গায়ক বাদক ছিলেন নিয়মিত বৃত্তিভোগী।"

"এ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম। কিন্তু, গুরুদেব! হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নূতন ভাবে, নূতন রূপে অনুশীলন বা ব্যবহার কবে, কখন আরম্ভ হয়?" প্রেমা প্রশ্ন করে।

"নূতন রূপে, নূতন ভাবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রথম ব্যবহার হয় আজ থেকে দুইশত বৎসর পূর্বে, সম্রাট আলাউদ্দিনের সময়। তাঁর দরবারে বিখ্যাত কয়েকজন সঙ্গীত গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। বৈজুবাওরা তাদের পুরোধা। তারপর দাক্ষিণাত্য থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে বাদশাহের দরবারে আসেন নায়ক গোপাল। তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার। অতঃপর আমির খুসরৌ। ইনি একাধারে অভিজাত বংশীয় কবি, গায়ক এবং রাজনীতি বিশারদ। পারস্য দেশের সঙ্গীত এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মিশ্রণ করে কয়েকটি রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি করেন। এঁদের বিষয়ে তুমি রামতনুর কাছ থেকেই বিশদ রূপে জানতে পারবে। কেবল এটুক জেনে রাখো যে খ্যাল্ (খেয়াল) গানের জন্মদাতা খুসরৌ। তাঁরই সৃষ্টি কব্বালি (কাওয়ালি) রীতি অনুযায়ী খ্যাল্ গাওয়া হয়। ইয়ামন

(ইমন্) রাগিনীর স্রষ্টাও খুসরৌ। আমাদের হিন্দোল রাগ-এর সঙ্গে পারস্যের মোকাম সম্মিলিত করে এই রাগিনীর সৃষ্টি। আবার যন্ত্র সঙ্গীতে স্‌হ-তার (সেতার) উদ্ভাবনও করেছেন তিনিই। সে যাই হোক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একেবারে প্রাথমিক রূপ আমরা সর্বপ্রথম পাই বিখ্যাত কবি জয়দেবের কাছ হতে। বঙ্গদেশের কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রসিদ্ধ "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্" কাব্যের রচয়িতা। কৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ এর সকল কবিতাই বহু বহু বিখ্যাত রাগ ও তান সংযোগে গঠিত। জয়দেবের এই কাব্য, গীতগোবিন্দম্ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অতি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু অত্যন্তই দুঃখের কথা যে তৎকালের ওই সব রাগ-রাগিনীর যথার্থ রূপ বর্তমানে নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।"

"গুরুদেব। আমরা তো শুনেছি যে বৈজুবাওরাই চারতুক বিশিষ্ট ধ্রুপদ গানের প্রথম প্রবর্তন করেন। তারপর তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করে নায়ক গোপাল অনেক সুললিত ও মধুর পদযুক্ত ধ্রুপদ রচনা করেন। এর পর মহারাজা মানসিং যখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরুত্থান করেন, তখন ধ্রুপদ সঙ্গীতেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। আসলে আমরা যে ধ্রুপদ সঙ্গীত জানি সে তো তারই নবধারার ধ্রুপদ সঙ্গীত। এখন আমার জানতে খুব ইচ্ছা জাগে যে ধ্রুপদ ধারার সঙ্গীত কি বৈজুবাওরারই প্রতিভার দান! না পূর্বেও এই ধারার সঙ্গীত এদেশে প্রচলিত ছিল?"

প্রেমার প্রশ্ন শুনে আচার্য হরিদাস খুবই প্রসন্ন হলেন। এমন করে কেউ জানার আগ্রহ প্রকাশ করে নি। তিনি বললেন, বিশদ বিবরণ দিতে গেলে আজ রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। অতি সংক্ষেপে বলছি। শোন! ধ্রুপদ কোন নূতন সৃষ্টি নয়। বহু পূর্ব থেকেই সালগ-পর্যায়ের প্রবন্ধ সঙ্গীত "ধ্রুব" হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে এর বহু রূপভেদও ঘটেছে। রাজা মানসিংহ এই সমস্ত বিভিন্ন রূপের ধ্রুব গীতকেই একটি সহজ এবং সুসম্বদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন। রাজা মান-এর সঙ্গীত চিন্তার প্রধান ফল ধ্রুপদ,

তাতে কোন সন্দেহ নেই। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে ধ্রুব সঙ্গীতের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে এটি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ধ্রুব গীতের অনেক প্রকারভেদ ছিল। তিনিও অবশ্য তাঁর এই রত্নাকরে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সঙ্গীত গুলিরই সুবোধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। আচ্ছা! আজ এ পর্য্যন্তই থাক!'

আচার্যদেব প্রেমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার আরও কিছু যদি জানবার থাকে, তোমার পতি দেবতাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। এইবার তোমার সঙ্গীত আরম্ভ কর। রামতনু! তুমি পাখোয়াজ ধর। নারায়ণ ধরবে তুম্বরু।—

প্রেমা সুস্থির হয়ে বসলো। এটুকু প্রেমা বুঝতে পেরেছিলো যে আচার্য হরিদাস স্বামীজী আসলে সঙ্গীত শাস্ত্রে সে কত খানি বুৎপত্তি লাভ করেছে, সেটুকু পরিমাপ করে নিতে আগ্রহী হয়েছেন। এতক্ষণ প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে সে তার উত্তেজনার সামান্য পরিমাণ অন্ততঃ লাঘব করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তার উত্তেজনার কিছুই যে লাঘব হয় নি, তা এই ক্ষণে বুঝতে পারল' প্রেমা। তবু ঈশ্বর ও গুরু স্মরণ করে আরম্ভ করলো প্রেমা।

প্রেমার সঙ্গীত যেন সুরনদীর মত বহে চলেছে আপন স্বর্গীয় মহিমায়। সুরতরঙ্গের সে এক মহাখেলা। যুগপৎ সন্নিপতিত সেই তরঙ্গ-ধ্বনি ক্ষণে ভীরু ক্ষণে প্রেমার্ত আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত করে ফেলে, কখনও বা সুরধ্বনি পরম্পরা এক অজানা বিষাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে! যথার্থ সঙ্গীতকার আপন সুরের মাধুর্য্য দিয়ে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, আবেগে উদ্বেলিত করে শ্রোতার হৃদয়, তা বুঝি আর অন্য কোন প্রক্রিয়াতেই সম্ভব হয় না। কেবল মাত্র সিদ্ধ সঙ্গীত গুণীই যথার্থ সুর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেন না, সুর সৌন্দর্য্যই সেই যথার্থ শক্তি যা সিদ্ধ সঙ্গীতকার নিজস্ব পদ্ধতির দ্বারা প্রকাশ করেন, চারিপাশের বাতাবরনে এক শৈল্পিক সুগন্ধ বিস্তৃত হয় তখন।

ক্ষণে ক্ষণে চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছিলেন আচার্য হরিদাস স্বামীজী!

অসামান্য তাল-লয় জ্ঞান ; অসাধারণ মধুর অথচ দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী এই সদ্য যুবতী। এতো নাদসিদ্ধা। স্বভারতঃতই। যদিও একেবারেই অস্বাভাবিক তাঁর মত সন্ন্যাসী মানুষের এমত ভাবনা ; তবুও নিতান্ত এক সাংসারিক লোকের মতই এই ভাবনাটি তাঁর মনে জাগলো যে পুত্রবৎ রামতনুর যোগ্য সহধর্মিণী হয়েছে এই হোসেনী ব্রাহ্মণী—প্রেমকুমারী! তিনি অন্তরের অন্তস্থল হ'তে আশীর্বাদ করলেন—তোমরা সফল হও। সুফল হও। তিনি দুই চক্ষু মুদে প্রেমার সঙ্গীত সুধা আপন শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে পান করতে লাগলেন।···

···আপা মধ্যে আপৈ বোলে, আপৈ সিরজন হারা : নিজের ভিতর নিজেই গেয়ে চলেছে, নিজেই সেই গানের প্রণেতা। একদিকে শেষ পর্বের সঙ্গীত-সাধনা ; তারপর অবসরের ফাঁকে ফাঁকে গীত-রচনা। এই ভাবেই দিন গুলি, মাস গুলি, বৎসর গুলি পার হয়ে যেতে লাগল। রামতনু যেন আত্মবিস্মৃত। সঙ্গীতের অপার বারিধির অতলে ডুবে যে কোনও মানুষের পক্ষেই অপ্রাপ্য মণিরত্ন সব তুলে তুলে আনছে। আর তাই দিয়ে দিয়ে মালা গাঁথছে। গানের মালা। প্রস্তুত হচ্ছে 'রাগমালা'। পরিস্কার করে লিখে, সুর সংযোজনা করে পরপর সাজিয়ে, বেঁধে রাখছে পুস্তকাকারে।—

একটা অনন্ত, অস্থির তাগিদ ওকে সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। নিরন্তর ওকে টানে। কোথায়. কোন্‌দিকে তা ও বুঝতে পারে না। বিভ্রান্তি এসে মনের আকাশ মাঝে মাঝে ঘোর জলদ-ঘটায় আচ্ছন্ন করে। সঠিক পথেই কি ও এগিয়ে চলেছে! যে চারা গুলি আজ রোপণ করে যাচ্ছে মন-বাগীচায়, সেগুলি যথার্থই ফলের,—মিষ্টি ফলের তো! নাকি বাবলা-কাঁটা রোপণ করে দ্রাক্ষা ফল পাবে বলে আশা করছে ভবিষ্যতে ? পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করে উঠছে এমন চিন্তা মনে জাগছে বলে ; 'মেরে সারগুরু

পকড়ী বাঁহ্'—সদ্‌গুরু আমার হস্ত ধারণ করেছেন; আমার কেন এমত কু-চিন্তা। সত্যই, রামতনুর এমন চিন্তা করার আপাত দৃষ্টে কোনই কারণ নেই। কিন্তু, তবুও অনিশ্চিত এবং অদৃশ্য ভবিষ্যৎ, মনে কতক দ্বিধার জন্ম দেয়। কেবলই মনে হয় তখনও এই এখনকার মতই সাধারন জন থেকে জ্ঞানী, গুণী, রসিক-ঋষিজন সকলেই আমি যে সঙ্গীতান্ন পরিবেশন করব', তাতে পরিতৃপ্তি পাবে তো! তারপরই ভাবে,—কেন পাবে না। আমি যদি প্রেম ও বৈরাগ্যের সঙ্গীতান্নে আমার পরিপূর্ণ পাত্র সমভাবে পরিবেশন করতে সমর্থ হই, তবে পরিতৃপ্তি পাবে না কেন? ওতো সর্বদা, সর্বক্ষণ, এমন কি, প্রেমার সঙ্গে বিহারের সময়ও অনুভব করে, যেন এক সত্য পুরুষ নিরন্তর ওকে আগ্‌লে আছেন।···

···এক একদিন স্বামীকে একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল বসে থাকতে দেখে ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধ করে প্রেমা। অপরাহ্ন গড়িয়ে যায়। অথচ রামতনু চুপ করে বসে আছে। এ সময় যে প্রত্যহই ওরা বেড়ায়! হয়তো বাগীচায়। কিংবা যমুনাজীর ধারে ধারে। কতক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে প্রেমা স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। এক অনির্বচনীয় রসাস্বাদে বুক ভরে ওঠে! যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেব! অস্বস্তি ভাবটা কেটে যায়! মনের মধ্যে একটু দুষ্টুমী জাগে। প্রেমা নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে রামতনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, "মুনিজী। বাগ্‌মে মওর নাচ্ রহি হ্যায়। আঁখে খোলিয়ে, উস্‌কি অপার রূপ তো দেখিয়ে সহী।"

রামতনুর মুখে মধুর হাসির রেখা জেগে উঠল। ও এক হাতে প্রেমাকে বেড় দিয়ে কাছে টেনে নিলো। আঁ আঁ করে চাপা স্বরে আঁতকে উঠলো প্রেমা। বাধা দিতে পারলো না স্বামীকে। রামতনু চোখ খুলে হেসে বলতে লাগল: বাগো ন যা রে না যা, তেরে কায়া মেঁ গুলজার। সহস্ কম্‌বলপর ব্যয়ঠ্‌কে, তু দেখে রূপ অপার।—(বাগীচায় যেও না, যেও না, হে মিত্র; তোমার মনোভূমিতেই

কুসুমোদ্যান বিরাজিত। সহস্রপদ্মদলে উপবিষ্ট তাঁর দুষ্পার সে রূপ প্রত্যক্ষ কর তুমি!—)

বলতে বলতেই প্রেমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রামতনু। হেসে বলল: চলো, চলো! আজ একটু দেরী হয়ে গেল!'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে যমুনাজীর পারে চলে এল। এসে বসলো সেই স্থানে যেখানে রামতনু বসতো। এখন ওরা প্রায় নিত্যই এই খানে এসে বসে। নূতন কোন গীত লিখে সুর সংযোজন করে সর্বপ্রথম এখানে এসে স্ত্রী প্রেমাকে শোনায়। প্রেমার অভিমত কিছু থাকলে যথাযথ মনোযোগ দিয়ে শোনে। ঐখানে বসেই আবার সংশোধন করে। তারপর আবার গেয়ে শোনায়। যতক্ষণ না প্রেমা বলে এইবার ঠিক হয়েছে, ততক্ষণ ও যেন কিছুতেই শান্তি পায় না। স্ত্রী প্রেমার উপর ওর অগাধ শ্রদ্ধা। ও মনে মনে বার বার আপন ঈশ্বরের প্রতি প্রণতি জানায় যে প্রেমকুমারীর মত এমন রসিকা বিদগ্ধা এবং সর্বোপরি সঙ্গীতে সিদ্ধা নারীকে স্ত্রী-রূপে পেয়েছে। আচার্য্য গুরুদেব স্বয়ং ওকে বলেছেন যে প্রেমকুমারীর মত সিদ্ধা সঙ্গীতজ্ঞা কদাচিৎ জন্মে। রামতনুর যোগ্য সহধর্মিণী এবং জীবন-সঙ্গীনি প্রেমা। রামতনু যেন কোনদিন এর অনাদর না করে।—

না। অনাদর করবার প্রশ্নই নেই। বরং দিনে দিনে ওদের উভয়ের প্রণয় নাদবিদ্যার সেবায় গাঢ়তর মধুরতর হয়ে ওঠে।

এখন সূর্যদেব তাঁর সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তবুও তাঁর দিব্য দেহের বিচ্ছুরিত বিভায় নভস্থলে অলসগতি শুভ্র মেঘদলের মধ্যে যেন রঙ নিয়ে হোরি খেলা চলেছে। আর সেইসব রঙের কতই না বাহার। যমুনাজীর নীল জলেও তাদের প্রতিচ্ছায়ার খেলা চলেছে। অনেকটা দূরে, যমুনা-জীর বুকে কয়েকটি বহিত্র (নৌকা) দেখা যায়। তাদের পালগুলিতেও রঙের স্পর্শ লেগেছে।

কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখলো ওরা। এক

সময় তারপর একটি গীত গেয়ে উঠলো রামতনু। আজই দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের অবকাশে রচনা করেছে। সুরও সংযোজিত করেছে। গানের বিষয় রাধা-কৃষ্ণের হোরিখেলা।—এই ফাল্গুন মাসে যখন আকাশে রঙবেরঙের মেঘের দল হোরিখেলায় মেতে উঠেছে, রাধাও আবীর গুলাল হাতে দয়িতের প্রতীক্ষায় ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে, তখনও সেই নিষ্ঠুর কৃষ্ণের দেখা নেই। আনমনা হয়ে পড়ছে রাধিকা। সখী, গোপীদের ডেকে বলছে—ওলো! তোরা এগিয়ে দেখ তো কেন প্রিয়তম এখনও আসছে না। সখীরা চলে যায় এগিয়ে সম্বাদ নিতে। আর পাষাণ প্রতিমার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাধিকা। বুকের মধ্যে অভিমান উথলে ওঠে। বক্ষ—আবরণী স্খলিত হয়ে পড়ে সেই চেতনাও থাকে না।···

ধ্রুপদাঙ্গের এই গীতের মাধুর্য্যে প্রেমা তো বটেই চারিপাশের প্রকৃতি এবং স্বয়ং যমুনাজীও যেন মুগ্ধ হয়ে যায়! গান শেষ হবার পরেও মধুর সুরের রেশ ব্যপ্ত হয়ে থাকে পারিপার্শ্বে। কত পল অনুপল কেটে যায় ওদেরও দুজনের অনুচ্চারিত প্রেমের আকর্ষণে। অবশেষে রামতনু বলে, "আজ আর তোমার গান শোনা হলো না। সন্ধ্যা নামছে গাঢ় হয়ে। একটু পরেই বাঁকে—বিহারীর আরতি আরম্ভ হবে।—

প্রেমাও মুখ তুলে চারিপাশে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ! চল, যাই।"

··· ··· ···

অঙ্গ প্রক্ষালন সেরে পবিত্র হয়ে রামতনু আর প্রেমা যখন বাঁকে বিহারীর মন্দির চত্বরে নির্দিষ্ট স্থানে বসলো, তখনও গুরুদেব আসেন নি। ভক্তজন অবশ্য সমবেত হয়েছেন। একটু পরেই গুরুদেব এসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। আরতি এবং পাঠ সমাপ্ত হলো।

অতঃপর গুরুদেবের ইচ্ছায় প্রেমা গান আরম্ভ করলো। প্রেমা এখন ভক্তজনের কাছেও আর অপরিচিতা নয়। তবুও যতবার

তারা প্রেমার গান শোনে, ততবারই তারা অনুভব করে কি এক দৈবী তড়িৎ প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে তাদের, আর তারা যার পর নাই পুলকিত হয়ে ওঠে। আর গুরুদেব থেকে রামতনু পর্য্যন্ত আশ্রমের সকলে! তাদের অনুভবের জগতে, তারা যেন সাক্ষাৎ রাগই আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর মূর্তি দর্শন করে ধন্য হচ্ছেন বলে মনে করতে বাধ্য হন।—যেন এক অনন্তকাল পার হয়ে যাবার পর দয়িতের আগমন বার্তা পেয়ে উৎফুল্ল নায়িকা প্রিয় সখীদের সম্বোধন করে বলছেন: হে সখি! দুঃখের রাত্রি প্রভাত হয়েছে। হয়েছে অবসান। তোমরা পুষ্প চয়ন করে আনো। তাঁর জন্য মালা গাঁথো। আনন্দে নৃত্য-গীত কর। তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে এসো আমাদের হৃদয়ের আকিঞ্চন জানিয়ে।—

—গান শেষ হয়ে যাবার পরে আর গানের কথা বা রাগ-তাল এসব কিছুই মাথায় থাকে না। শ্রোতাগণের অনুভবের যে উন্মেষ ঘটে তাতে অন্তত: কোন খাদ থাকে না। কারণ, অনুভবের সেই সব সূক্ষ্ম মুহূর্ত গুলিকে কখনই বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায় না; বাণীরও থাকে না কোন গুরুত্ব। কেবল এক দৈবী কণ্ঠস্বরের যাদু মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে এক অনুপম মাধুর্য্যের জগত উন্মোচিত হয়। সে মুগ্ধ অবস্থার ব্যাখ্যা কদাপি সম্ভব না। সে অমৃত-আস্বাদনের কোন তুলনা হয় না।—কেবল মনে হয়—ধন্য হলাম, পরিপূর্ণ হলাম!—···

···রাত্রের আহারাদির পর রামতনুকে ডেকে গুরুদেব বললেন: "রামতনু। আজ সন্ধ্যার কিছু আগে, তোমরা তখন ছিলে না, পত্র বাহক এসে একটি পত্র দিয়ে গেছে তোমার নামে। ফকির মহম্মদ গওস বুঝি বা মৃত্যু শয্যায়। অবিলম্বে তোমার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। আগামীকাল প্রাতঃকালেই তোমরা গোয়ালিয়র রওনা হও! তিনি তোমার পিতৃতুল্য। তুমি ভিন্ন আর কেউ তাঁর নেইও। এই সময় তাঁর পাশে থাকা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। পত্র যিনি লিখেছেন, তিনি আশঙ্কা প্রকাশ

করেছেন যে ফকির গওসের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়ে পড়েছে।—এই হলো প্রথম সংবাদ। দ্বিতীয় আর একটি সংবাদ পত্রবাহক মারফৎ জানলাম যে দিল্লীর বাদশাহ্ শের শাহের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে। কলিঞ্জের দুর্গে এক আকস্মিক দুর্ঘটনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। অবশ্যই তাঁর পুত্র এখন দিল্লীর সুলতান হয়েছেন। কিন্তু এখনই তার শাসনের হস্ত দৃঢ় হয় নি। কিছুদিন সময় নেবে। এ সময় পথে প্রান্তরে কিঞ্চিৎ হলেও অরাজকতা সৃষ্টি হবেই। সুতরাং গোয়ালিয়-রের পথে তোমরা সতর্ক থাকবে। আমি জন চারেক শক্তিমান ব্যক্তিকে তোমাদের সঙ্গে যেতে বলেছি। তারা তোমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। তোমরাও অবস্থা বুঝে আবার এখানে এসো। এইটুকুই এখনকার মত আমার বলার কথা।”

... ...

রামতনুরা গোয়ালিয়রে পৌঁছলো নিরাপদেই। ফকির সা'র তখন অন্তিম দশা। তবুও মানুষ চিনতে পারছিলেন। কথাও বলতে পারছিলেন আস্তে আস্তে। কিন্তু রামতনুদের দেখে তাঁর রোগ পাণ্ডুর জীর্ণ মুখাবয়বে রক্ত সঞ্চার হলো। সত্য সত্যই যেন তাঁর রোগ যন্ত্রনা দুরীভুত হলো। যদিও উত্থান শক্তি তার ছিল না। তিনি কাঁপা কাঁপা দুই বাহু মেলে ধরে উৎসুক নয়নে ওদের দিকে তাকালেন। তাঁর ওষ্ঠযুগলে মধুর হাসি, স্বস্তির হাসি জেগে উঠলো। ডান হাতে রামতনুকে এবং বাম হাতে প্রেমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন তিনি। দুজনের মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করলেন। সেই তাঁর শেষ আশীর্বাদ।

অকৃত্রিম ভক্তির সহিত সেবা শুশ্রূষা করেও ফকির সা'র অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারলো না রামতনু এবং প্রেমা। ক্রমশঃ নিঃশেষ হ'য়ে যেতে লাগলেন তিনি। যদিও শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁর জ্ঞান অটুট ছিল। অন্তিম মুহূর্তে দুপাশে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল রামতনু আর প্রেমা। হঠাৎ দুই চক্ষু মেলে তাকালেন তিনি একবার প্রেমার দিকে, তারপর রামতনুর দিকে। তাঁর মুখে

ক্ষীণ হাসি। তিনি যেন ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে কি বলতে চাইলেন। রামতনু ঝুঁকে পড়লো তাঁর মুখের কাছে। কথা অস্পষ্ট, জড়ানো। একটা কথাই কেবল ও উদ্ধার করতে পারলো—'পানী।'

হেকিম সা' বলে গেছেন সামান্য মিস্‌রী ভেজানো পানী সব সময় তৈরী রাখতে। ফকির সা' পান করতে চাইলে যেন দেওয়া হয়। রামতনুর কথা শুনে প্রেমা তৎক্ষণাৎ এনে দিল। রামতনু বাম হাতে ফকির সা'র ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে মাথাটা তুলে ধরে ধীরে ধীরে তাঁব মুখে মিস্‌রী ভেজানো পানী দিতে লাগল। তিনি থেমে থেমে অনেকটাই খেলেন। তাঁর চক্ষু দুটি বুঁজে এলো। শেষ মুহুর্তে চক্ষু দুটি অকস্মাৎ পূর্ণরূপে খুলে গেল। তিনি এপাশে ওপাশে চক্ষু ফিরিয়ে সকলকে দেখলেন। তাঁর মুখের কোণে মৃদু হাসি। তারপর চক্ষু দুটি বুঁজে গেল তাঁর—চিরতরে।···

···মহম্মদ গওস সা'র ধনরত্নের তো অভাব ছিল না! জমি জায়দাদও ছিল। সে সমস্তই তিনি ওয়াসিয়ৎ করে রামতনুকে মৃত্যুশয্যায় দান করে গেছেন। রাণী মৃগনয়নীও সেই সময় খুবই অসুস্থ ছিলেন। ফলে, নিজে এসে তিনি খোঁজ খবর নিতে পারেন নি। তবে তাঁর খাস সহচরী নির্মলা সব সময়ই উপস্থিত ছিল। সমাধির উপযুক্ত বন্দোবস্ত রাণীর তরফেই করা হয়েছিল। সব কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন হলো।

গওস সা' চলে যেতে কেমন যেন এই প্রথমবার নিজেকে অসহায় অভিভাবকহীন অনুভব করলো রামতনু। কয়েকটি মাস ভীষণ এক উদাসীনতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

গওস সা'র ভৃত্য এবং রাধুনী সহ পাঁচজন পোষ্য ছিল। তারা একদিন কি জানি কি ভেবে রামতনুর কাছে আর্জি জানালো। তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা যে বেশ চিন্তিত, তা বুঝতে পারলো রামতনু।

আশ্বাস দিল তাদের রামতনু। তারা এখানে, এই বাড়ীতেই, যে যেমন ভাবে ছিল, তেমন ভাবেই থাকবে। উপরন্তু ফকির সা'

ওকে যা দিয়ে গেছেন, তা ও সমভাবে বণ্টন করে দেবে ওদের মধ্যে। রামতনুর কথা শুনে তারা সকলে শান্ত হলো। নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার কাজে গেল।

রাত্রে, আহারাদির পর প্রেমা কিঞ্চিৎ অনুযোগের স্বরে বলল: 'তুমি তো সব কিছু দান করে দিচ্ছো। আমাদের বিবাহের সময় যা সমস্ত পেয়েছিলে, প্রায় সবই তো আশ্রমে দান করেছো। এখন ফকির সা' যা দিয়ে গেলেন, তাও তো সব দান করে দিচ্ছ দেখছি।'

"হুঁ! তাতে কি হয়েছে?" নির্লিপ্ত স্বরে বলল রামতনু।

"হয়নি কিছুই!" প্রেমা তার ডাগর চোখ দুটি স্বামীর মুখের দিকে তুলে ধরে বলল, 'তবে, সংসার তো বাড়ে—বাড়ছে—।' বলতে বলতে একরাশ লজ্জা এসে মুখ বন্ধ করে দিল প্রেমার। মুখ নত করে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

রামতনু কয়েক মুহূর্ত বিস্ময় এবং আনন্দ মেশানো দৃষ্টিতে স্ত্রীর আনত মুখের তাকিয়ে রইলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিল তাকে। স্বামীর বুকে নিঃশব্দে সমর্পণ করলো প্রেমা নিজেকে। কতক্ষণ পর রামতনু বলল: ভয় কি প্রেমা! আমাদের কারও দানের ওপর ভরসা করে জীবন যাপন করতে হবে কেন? আমি তো আর অলস নই। বা কর্মবিমুখও নই। আমি উপার্জন করবো। সেই উপার্জনেই আমরা সংসার যাত্রা নির্বাহ করবো। তুমি আমার পাশে থেকো। তবে আর কোনদিনই আমাদের কোনও অভাব হবে না।"...

...রামতনু ও প্রেমার প্রথম সন্তান সরৎ যখন ছয়মাস বয়স্ক শিশু, সেই সময় দিল্লী দরবার থেকে রামতনুর কাছে আমন্ত্রণ এলো। সুলতান ইস্‌লাম শাহ্‌ স্বয়ং সাদরে ওকে আহ্বান করেছেন। রামতনু শুনেছে যে ইস্‌লাম শাহ স্বয়ং উত্তম সঙ্গীত গুণী। খুবই ইচ্ছা হলো ওর যেতে। কিন্তু প্রেমাকে একা ছয় মাসের শিশু সহ ছেড়ে যেতে ইতঃস্তত করতে লাগল। তা

ছাড়া, সব চেয়ে বড় কারণ, গুরুদেব আচার্য হরিদাসের নিকট শিক্ষা ওর এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। অন্ততঃ ওর নিজের সেই অনুভব। তাই এখানে, গোয়ালিয়রে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেও ফকির সা'র মৃত্যুর পর থেকে নিয়মিত ভাবেই, বরাবর গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করছে ও। সঙ্গীত শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য তো বটেই, যোগ সাধনার জন্যেও। যদিও গুরুদেব ওকে সম্প্রতি অনুমতি দিয়েছেন। স্বাধীনভাবে সঙ্গীত চর্চার ও অবশ্যই যোগ্য হয়েছে। এখন ও নিজেই শিক্ষকরূপে নিজেকে পরিচিত এবং প্রচারিত করতে পারে।

প্রেমাও অনুমতি দেয় স্বচ্ছন্দে।—"আমি মা বাবার কাছে গিয়ে থাকবো। এত কাছে থেকেও আলাদা আছি বলে ওঁরা কত দুঃখ করেন।"

প্রেমার কথার পরই মন স্থির করে রামতনু। গুরুদেবকেও জানায়। তারপর তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সুলতান ইসলাম শাহ্-এর দরবারে যোগ দিতে একদিন রওয়ানা হয়ে যায়।···

··· ··· ···

দিনে দিনে সুলতান ইসলাম শাহ্-র সঙ্গে রামতনুর সখ্যতা গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠ্‌লো। দুজনেই দুজনের সঙ্গীত প্রতিভাকে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বস্তুতঃ, রামতনু পাণ্ডের খ্যাতি সুলতানের দরবারের সীমা পার হয়ে সমস্ত হিন্দুস্থানের সঙ্গীত গুণী মহলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সুলতান ইসলাম শাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের যেখানে, যে প্রান্তেই সঙ্গীতগুণীর সন্ধান পেতেন, তাঁদেরকে যথাযোগ্য সমাদর সহকারে দরবারে আহ্বান করে আনতেন। বসতো সঙ্গীতের ম্যাহ্‌ফিল। সকল ওস্তাদগণই আপন আপন যোগ্যতার প্রদর্শন করতেন। কিন্তু প্রতিজন ওস্তাদই অনুভব করতেন অবশেষে যে রামতনু পাণ্ডের ধ্রুপদী মহিমাকে খর্ব করার শক্তি তাদের নেই। ফলে ক্রমশঃ তাদের মধ্যে ঈর্ষার জন্ম হতে লাগল। কিন্তু ঈর্ষা করে তো আর প্রতিপক্ষের যোগ্যতার, প্রতিভার

অবমূল্যায়ন ঘটানো যায় না। এই বোধ যখন তাদের হলো, তখন অনেকেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। অন্যেরাও রামতনুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল। রামতনুর বিজয় কেতন হিন্দুস্থানের সঙ্গীতগুণী মহলের আকাশে সগৌরবে উড্ডীয়মান হলো।

একদিন একান্ত আসরে সুলতান ইস্‌লাম শাহ্ হাসতে হাসতে রামতনুকে বললেন, "পাণ্ডেজী। এখন তো আর সারা হিন্দুস্থানে কেউ রইলো না যে আপনার সঙ্গীত প্রতিভার মুকাবলা করতে পারে।"

রামতনু বিনীতভাবে বলল, "আমার গুরুদেব আচার্য হরিদাস স্বামীজী তো আছেন।"

"আহা, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো আর প্রতিযোগী নন্।"

"তবুও আমি এখনও নিজেকে পূর্ণরূপে সিদ্ধ বলে ভাবতে পারি না।"

"এ তো আপনার বিনয়। এমন কথা আপনার মুখেই শোভা পায়। আমি তো আপনার মধ্যে কোন অপূর্ণতা দেখি না।" বলে সুরার পাত্রে এক দীর্ঘ চুমুক দিলেন সুলতান। পাত্র নামিয়ে রাখতে রাখতেই তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে গেলো।

রামতনু লক্ষ্য করেছে। রোজই করে। যতই মদ্যপান করেন সুলতান ততই তাঁর শরীরে মৃদু কম্পন হয়, মুখ বিকৃত হয়। দরবারের হেকিম সুলতানকে বেশী মদ্য পান করতে নিষেধ করেছেন। জানে এ কথা রামতনু। সুলতান বাদশাহেরা যে মদ্যপান বিনা থাকতেও পারেন না, এ তত্ত্বও অজ্ঞাত নয় ওর। তবু আজ, এইক্ষণে ও আর না বলে থাকতে পারলো না: সুলতান! একটা কথা আপনাকে বলবো, যদি কিছু না মনে করেন, আপনি এই অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করুন! হেকিম সা' তো নিষেধ করেছেনই। আমিও আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি তো কেবল সুলতানই নন, আমার বন্ধুলোকও তো বটেন।"

হা হা করে হেসে উঠলেন সুলতান ইসলাম শাহ। হাসতে হাসতেই বললেন: "দোস্ত্! মধু পান করি বা আঙ্গুরের রস পান করি। তার বেশী তো কিছু নয়। এ গুলো স্বয়ং খোদারই দেওয়া জিনিষ তো! তা খোদার দেওয়া জিনিষ খেয়েই যদি আমার সেহত্ (স্বাস্থ্য) খারাপ হয়ে যায় তো যাক। ও নিয়ে আপনি অত চিন্তা করবেন না। আসুন একহাত দাবা খেলা যাক।...

...মাঝে মাঝে বাদশাহী মহলের ঘেরাটোপ ছেড়ে একেবারে একা পথে বেরিয়ে আসে রামতনু। একা একাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় রাজপথে জনপথে বা অলিগলিতে। কখনও বা একেবারে যমুনার ধারে চলে আসে পুরানা কিল্লাকে পিছনে রেখে। যমুনার পার ধরে ধরে অনেক দূর চলে যায়। কখনও বা খেয়াঘাটের এক পাশে বসে পড়ে। লোকজনের যাওয়া আসা দেখে। কত রকমের লোক, নারী, যুবতী, বালিকা, বালক, কিশোর, যুবক। দেখতে দেখতে রামতনুর মনে হয় এই যে মানুষের যাওয়া আসা, আসা যাওয়া বিরামহীন চলছে, এর মধ্যেও যেন একটা সঙ্গীতের ছন্দ আছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই সুরু হয় এই যাত্রা। তারপর জীবনের পথে কত না জটিল কুটিল বাঁক। সেই সব পেরিয়েই জীবনকে পাওয়ার জন্য, পূর্ণরূপে তার আস্বাদনের জন্য, মানুষের আকুল আকাজ্ক্ষা। কিন্তু সেই আকাজ্ক্ষার কি পুরণ হয়? এক আয়ুষ্কালের মধ্যে? জীবন যতো এগিয়ে যায়, যাওয়ার দিনও তো ততই আসে এগিয়ে। দেখতে দেখতে ওর নিজের জীবনও তো মধ্যপথের প্রান্তে এসে পড়েছে। তবু তো নিজেকে এখনও পুর্ণ বলে ভাবতে পারছে না ও। ওদিকে সংসার বেড়েছে—বাড়ছে। অথচ এইসব ক্ষণস্থায়ী সুলতানদের আশ্রয়ে থেকে জীবনের স্থিতি-স্থাপকতার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে নিজস্ব কোন কিছু একটা গড়ে তোলা প্রয়োজন। না হলে যাওয়া-আসার পথের মাঝেই সঙ্গীতের ছন্দ, তাল অকস্মাৎ থেমে যাবে।

নিজের মনেই হেসে উঠলো রামতনু। কি সব অসংলগ্ন ভাবনা।

একজন মাঝির ডাকে ফিরে তাকালো রামতনু। খেয়াঘাটের একজন মাঝি ওকে ডাকছে। "আও ভাইয়াজী। যমুনাজীকা সুন্দর করা দেঁ। আও। ক্যায়া অকেলে বৈঠকে সোচ্ রহে হো।"

রামতনু হেসে নেমে গেল। নৌকোতে উঠে বসল। নৌকা ছেড়ে দিল মাঝি। নৌকায় পাঁচ ছয় জন আরও রয়েছে। সকলের দিকেই একবার দেখলো রামতনু। এরা কেউই ঠিক যাত্রী বলে মনে হলো না রামতনুর। এই শহরবাসী বলেও তাদের মনে হলো না। নূতন এসেছে। ঘুরে ফিরে দেখছে। আজকালই হয়তো চলে যাবে। তাদের কথাবার্তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ও। ও মুখ ফিরিয়ে যম্‌নাজীর অগাধ নীল জলের দিকে তাকালো। জলের উপর আকাশের মেঘের ছায়া পড়েছে। যদিও এই মেঘ বৃষ্টির নয়। শরৎকালের বেলা। রৌদ্র মেঘের আড়ালে। সন্ধ্যা হতে বাকী আছে এখনও।

নৌকা ভেসে চললো তর্ তর্ করে মাঝ দরিয়ার দিকে। মাঝে মধ্যে পারের দিকে এক আধটা মন্দির বা মস্‌জিদ চোখে পড়ে। যাত্রীরা মাঝিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে। মাঝিও জবাব দেয়। রামতনু আপনাতেই মগ্ন হয়ে চারিপাশে দেখতে দেখতে কত কি ভাবে।

তারপর একসময় নৌকার গতি ফেরে খেয়া ঘাটের দিকে। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরতের কোহ্‌রা (কুয়াশা) যমুনাজীর বুকে ধীরে ধীরে নামতে সুরু করেছে। দূর দিগন্ত রেখা মুছে গেছে। ক্রমশঃ আশপাশও ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে থাকে। নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় খেয়াঘাটের উদ্দেশে। তখন দেখা যায় আর একটি নৌকা, অপর পারের খেয়াঘাট থেকেই নিশ্চয়, দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। খেয়াঘাটের দিকেই। সেই নৌকায় অনেক মানুষ। সন্ধ্যার আগে শেষ পারাপারের নৌকা বলেই বোধহয় অত মানুষ। অকস্মাৎ বুকের ভেতর ছাঁৎ করে ওঠে রামতনুর।

হঠাৎ ওপাশের নৌকা থেকে কয়েক জনের চিৎকার ভেসে আসে : "আরে, আরে, কোই বঁচাও ; বঁচাও ! দেবীজী গির গয়ী, বঁচাও ! হায়, হায় ।" নৌকা বোঝাই মানুষ ! একপাশের যাত্রীরা কিছুই টের পায়নি । অন্য পাশ থেকে একজন মহিলা পড়ে গেছে জলে । মানুষের চাপ বা ধাক্কাতেই ! মাঝি দুজন দুপাশ থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে—কোই হিলিয়ে ডুলিয়ে মাৎ । নাও গাড় যায়েগী তো সব কে সব মারে যায়েঙ্গে ! মাঝিদের হুঁশিয়ারি শুনে নৌকার বাকী লোকজন নিজেদের বিপদ বুঝতে পেরে স্থির হয়ে গেল । কেউ আর নড়বার চড়বার সাহস দেখাল না ।

—উ দেখো, উ দেখো । হায় । হায় । ডুব রহী হ্যায় ।" আবার কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল ।

এই বার রামতনুও দেখতে পেলো জলের ওপর হাত । ভেসে থাকার চেষ্টা । ওদের নৌকার অন্য যাত্রীও দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করে উঠলো । কুয়াশা তখন বেশ ঘন হয়ে নেমে আসছে যমুনাজীর ওপর ।

রামতনু ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জলে । হাত লক্ষ্য করে সাঁতরে গিয়ে ডুবন্ত মহিলার চুলের মুঠি ধরে ফেলল পেছন থেকে । নৌকোতে থেকে বুঝতে পারে নি । জলে নেমে বুঝতে পারলো বেশ টান রয়েছে স্রোতের । আর এক মুহূর্ত দেরী হলে তলিয়ে যেতেন মহিলা । তার চেয়েও বড় কথা, এই কুয়াশার জন্য হয়তো হদিসই করতে পারতো না রামতনু । ও ঘুরে গিয়ে নিজের পিঠের ওপর মহিলার দেহটাকে ভাসিয়ে নিলো । স্রোতের টানে একহাতে সাঁতার কাটতে অসুবিধাই হচ্ছে । কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই । বিপদের উপর বিপদ ! নৌকা দুটিই চক্ষুর আড়াল হয়ে গেছে । তবু পার বেশী দূরে নয়, এটা ও নৌকা থেকেই দেখেছে । ও সাঁতরাতে লাগল । নির্দ্দিষ্ট খেয়াঘাট থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই । স্রোতের বিরুদ্ধে কতটা যুঝতে পারবে তা জানে না রামতনু । শরীর ক্রমশ অবসন্ন

হয়ে পড়ছিল। তবু ও সাঁতরাতে লাগল। পিঠের বোঝা ক্রমশঃ আরও ভারী হয়ে আসছে। অনেক খানি জল মহিলার পেটে গেছে সন্দেহ নেই। তার মাথা ওর ডান কাঁধের ওপর উর্দ্ধমুখী। আর জল খাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন অসুবিধা নেই। ও এগিয়ে চলল প্রাণপণে। অবশেষে—

পায়ের নীচে ভূমির স্পর্শ পেতে নিশ্চিন্ত হলো রামতনু। এখনও বেলা অবশিষ্ট আছে। পারে এখনও আঁধার নামে নি। যদিও মাথার উপর কুয়াশার চাদর দুলছে। সমস্ত শরীর ওর শিথিল হয়ে গেছে অনভ্যস্ত পরিশ্রমে। পিঠের উপর দেহটিকে নিয়েই স্খলিত পায়ে উঠে এলো জল থেকে। এদিক ওদিক দেখে একটা ভাঙ্গা শানের ওপর মহিলার দেহটিকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল রামতনু। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন মহিলা। তবে অঙ্গে কোন গ্লানির চিহ্ন নেই। আর্দ্র কেশরাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। বঙ্কিম ভ্রু-যুগল যেন তিরস্কারে উদ্যত! সিক্তবস্ত্রে ঘনাশষ্ট সৌন্দর্য আরও অনুভাবময় হয়ে উঠেছে। বিকারহীন মুখশ্রী। যেন সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। স্বচ্ছ জলের মত দোপাট্টার অন্তরালে সমস্ত শরীর দীপ্তিমতী প্রদীপ শিখার মত স্নিগ্ধ আলোকে চক্ষুকে প্রসন্ন করছে। মহিলা অবশ্যই অল্প বয়সী নন, কিন্তু এখনও সোচ্চার যুবতী।

রামতনু হঠাৎ ভেবে পেলো না এই মুহূর্তে ওর কর্তব্য কি! অপরিচিতা মহিলা। পোষাক বিপর্যস্ত। হাতের নখ পাণ্ডুর, পায়ের তলা ফ্যাকাশে, রক্তহীন। এ ভাবে কতক্ষণ আগলে বসে থাকবে রামতনু। আশে পাশে তো জনপদের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছে না। জানু পেতে বসে রামতনু মহিলার পাশে। পোষাক যতটা সম্ভব ঠিক করে দিল। নাড়ী দেখল। নাড়ী ঠিক আছে। দুই হাতের তালু ঘষতে লাগল তারপর। পায়ের নীচেও ঘষতে লাগল। কপালে হাত বোলালো। পা দুটি ধরে হাঁটু ভেঙ্গে পেটের উপর ধীরে ধীরে চাপ দিতে লাগল। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিল। দুই চোখের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠলো। তার চক্ষু দুটি উন্মীলিত হলো।

উঠে বসতে চেষ্টা করলেন মহিলা। রামতনু তার পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে সাহায্য করল'। উঠে বসে একবার তাকালেন মহিলা রামতনুর দিকে। সেই দৃষ্টিতে কোনও জিজ্ঞাসা ছিল না; কোন ভাব-বিভাব বা রাগ-বিরাগ, কিছুই না। কেমন এক শূন্য দৃষ্টি। যেন অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছেন না। ভ্রমে পড়েছেন কি ভুল করে এসে পড়েছেন, এমন একটা ভাব।

এদিকে সন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসছে। এই নির্জন যমুনার পারে আর থাকা যাবে না। রামতনু অবশেষে বলল, "দেবী, আপনার শরীর ক্লান্ত, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এই স্থানে তো আর থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের এখনই এ স্থান থেকে চলে যাওয়া দরকার।'

মহিলা মুখ তুলে আবার দেখলেন রামতনুকে। তারপর চকিতে মুখ নামিয়ে নিলেন। বমনের ঝোঁক এল। শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল তার। শুধুই জল অনেক খানি বমন করে হাঁফাতে লাগলেন।

রামতনু নিশ্চিন্ত হলো। এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন মহিলা।

তাই হলো। মহিলা মুখ তুলে যমুনার দিকে একবার দেখলেন।

রামতনু নম্র স্বরে বলল, "সুস্থ বোধ করছেন কি? এখন যেতে পারবেন? আপনি নিশ্চয়ই এই নগরীতেই থাকেন? পথ চিনে যেতে পারবেন তো? আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে থাকবো।"

মহিলা জবাবে ডান হাত তুলে ধরলেন। ইঙ্গিত বুঝে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল রামতনু মহিলাকে।

প্রায় সমস্ত শরীরের ভর রামতনুর শরীরে রেখে মহিলা ক্লান্ত স্বরে বললেন,' "আসুন। আমার সঙ্গে চলুন।"

... ...

আজ ভারী আঁধি সুরু হয়েছে। চরাচর আঁধার করে প্রবল বারিপাত চলেছে। বাতাসের শোঁ শোঁ আর বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ নৃত্য মিলে মিশে স্বর ও ধ্বনির এক অপূর্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়েছে।

তবুও রামতনুর মন আজ একাধিক কারণে বিষণ্ণ। সুলতান ইসলাম শাহের এন্তেকাল হয়েছে। তাঁর কবরের পানীও বোধহয় এখনও শুষ্ক হয়ে যায় নি। এর মধ্যেই তক্ত-তাউস দখলের জন্য রক্তপাত হয়ে গেছে। ইসলাম শাহের এক খুল্লতাত, শেরশাহ্ শূরের ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র মুবারিজ খাঁ আদিল শাহ্ নাম ধারণ করে তক্ত-তাউসে আসীন হয়েছেন। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যে নৃশংস, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়ে তিনি তক্ত-তাউস দখল করেছেন, সেই খানে বড়ই বেজেছে রামতনুকে। ইসলাম শাহের নেহাৎই নাবালক, দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র ফিরোজ শাহকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছেন তিনি। আর মনিব-পুত্রের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে রামতনু। ও স্থির করেই ফেলেছে এই নগরী ছেড়ে ও চলে যাবে। কোথায় যাবে তাও স্থির করে ফেলেছে। কিন্তু তার আগে বিদায় নিতে হবে ভৈরবীর কাছ থেকেও। ওর বিষণ্ণতার এও এক কারণ। গত এক বৎসর ও যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভৈরবীর মায়ার বাঁধনে নয় কেবল, ভৈরবীর গুণের বাঁধনেও!

যেদিন ও জলমগ্ন ভৈরবীকে উদ্ধার করেছিল, সেদিন ও ভাবতেও পারেনি যে ভৈরবীর গুণের কাছে ওকে নতি স্বীকার করতে হবে। অবশ্য এমন নতি স্বীকারে কোন লজ্জা নেই। বরং আছে এক পরম পাওয়ার সুখ। সেই সুখের বাঁধন ছিড়ে যেতে হবে, এই ভেবেই ওর আরও বিষণ্ণতা।

ওদিকে গোয়ালিয়র থেকে পত্র এসেছে। প্রেমার পত্র। ছোট পুত্র অসুস্থ। প্রেমার নিজের শরীরও নাকি ভাল নয়। যত শীঘ্র সম্ভব একবার আসা প্রয়োজন।

নাঃ! এই বৃষ্টিপাত সহজে থামার নয়। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কণ্ঠে সুর ভরে এল : ধা, নি, সা, গা, —মা,… …

…হর্ষোজ্জ্বল মুখ ও চক্ষু, এই সুন্দরী তরুণী কে ওর সামনে এসে

দাঁড়ালো? নারেঙ্গীর মতো দেহের বরণ, স্বর্ণাভ কেশপাশ, কে এই বিমুগ্ধকারিণী? লোহিত এবং শুভ্র বসনে চারুঅঙ্গের উজ্জলতা প্রখর সূর্যতাপের মতো। মঞ্জিরা বাজিয়ে নৃত্যের তালে গান করছে, ফলে কণ্ঠে দোলানো চম্পক পুষ্পের মালাখানি যুগল পয়োধরে ক্ষণে ক্ষণে চুম্বন করছে, কে এই—।

…হ্যাঁ। আমার নাম ভৈরবী। অন্ততঃ এখন তুমি আমাকে ভৈরবী নামেই ডাকবে। ছিল, আগে আমার একটা অন্য নাম ছিল। সে নাম আমার মনে নেই। মনে করতেও চাই না। সে আমার অন্য জীবনের নাম। সেই জীবনকেই আমি ত্যাগ করে এসেছি। সে প্রসঙ্গে আর ফিরে যেতে চাই না।—

—এখন তোমার কথা বল। তোমার নাম তো আমি নিশ্চয় শুনেছি। আমিও যখন এই নগরেরই বাসিন্দা। তোমার নাম এখন সারা হিন্দুস্থানের সঙ্গীত-গুণীদের মহলেও অপরিচিত না, তাও আমি জানি। তুমি আমার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছো। একটুখানি শোন।—তুমি কি ধ্রুপদ সম্রাট, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নব রূপকার, মহান সঙ্গীতজ্ঞ নায়ক গোপালের নাম শুনেছো? শুনেছো তো? হ্যাঁ, যিনি আলাউদ্দীনের দরবারে ছিলেন। সেই নায়ক গোপাল আমার পূর্বপুরুষ। আমি তারই বংশসম্ভূত তাঁর নাতির নাত্নী আমি! সুতরাং, বুঝতেই পারছো যে আমি একেবারে অনধিকারী নই। আমি জানি তুমি নাদসিদ্ধ। কিন্তু যথার্থ পারঙ্গমতা এখনও তুমি অর্জন করতে পারোনি। সর্ব রাগ রাগিনীর উপর সর্বাত্মক প্রভূত্ব এখনও তুমি লাভ করো নি। এটাই সত্য। এই সত্যকে তুমি অস্বীকার করার সাহস রাখো কি?—

রামতনু বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে ভৈরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর এই জীবনে এমন চমৎকার নারীর সাক্ষাৎ কখনও পায় নি। না, রাণী মৃগনয়নীও ওকে এতখানি চমৎকৃত করতে পারেন নি।

আত্মসমর্পণ করেছিল রামতনু। অসংকোচে এমন গুণার্ণবা কলাবিৎ! তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে কোন দ্বিধা ছিল না ওর। ভৈরবীও ওকে বঞ্চনা করে নি। চরণে নয়, আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে রামতনুকে। তনু-মনের অধীশ্বর করেছে, অকৃত্রিম প্রেমে ঋণী করেছে ওকে।

অথচ, প্রথম দিন, যেদিন ও যমুনার জল থেকে নিশ্চিতভাবে জীবন রক্ষা করেছিল সেই মহিলার, তারই নির্দেশ মত তাকে তাদের গৃহে পৌঁছে দিয়েছিল নগরীরই উপান্তে, সেদিনের পরে আর কোনদিনই সেই গৃহে যাবার প্রয়োজন অনুভব করতো না রামতনু। যদি না—

অবশ্যই, তাদের দুজন, ভৈরবী নামে মহিলা এবং তার মা, এ ছাড়া আর কারোকে দেখেনি রামতনু, অনুরোধ করেছিলেন বারংবার। ও যেন আবার আসে। রামতনু মাথা নেড়ে বলেছিল, যেমন বলতে হয় আবার আসবে। ফিরে আসার সময়ই ওর নজরে পড়ে। একটি বীণ এবং একটি তুম্বুরা। ওর দুই চক্ষুতে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বিদ্যুত চকিতে খেলেছিল। তাই দেখে ভৈরবীর মা বলেছিল, "ওই যন্ত্র দুটি আমার মেয়ের।" ভৈরবী কিছু বলে নি।

তবুও পক্ষকালের মধ্যে ওর যাওয়ার অবকাশ ঘটেনি। সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অপরাহ্নে দাবার আসর আর বসছিল না। যদিও সেই অবসরে নূতন নূতন গীত রচনা এবং সেগুলিতে যথাযথ সুর সংযোজনা করা, বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর মিশ্রণে নূতন নূতন রাগের সৃষ্টি এবং নিজে গেয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ওর কোন আলস্য ছিল না। তবুও শেষ অপরাহ্নে ও বেরিয়ে পড়তো। ঘুরে বেড়াতো যত্রতত্র। তেমনই এক অপরাহ্নে ও আবার চলে গিয়েছিল ভৈরবীর গৃহে।···

তারপর সঙ্গীতে, প্রেমে কোথা দিয়ে যে পার হয়ে গেল দিনগুলি রাত্রিগুলি। নিজের অপূর্ণতার কথা যা ওর নিজেরই একান্ত অনুভবে ছিল, ভৈরবীর সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি অচিরেই তা আবিষ্কার করে

ফেললো। সার্থক নাম্না ভৈরবী। যেটুকু অপূর্ণতা ছিল রামতনুর, আনুরক্তি সহকারে পূরণ করে দিল সে। ভৈরব রাগের সূক্ষ্ম কারুকলা আয়ত্ব করে নিতে, সিদ্ধির পথে ভৈরবীই হলো ওর প্রিয়তমা প্রেরণা।…

••

নর্মদা তীরে ছবির মত সুন্দর রাজ্য রেওয়া। চারিদিকের অরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে গেল রামতনু! ওর অশান্ত চিত্ত ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। এক সময় ও ভেবেছিল যে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াই ওর সাধনার সফলতার জন্য অন্ততঃ, শ্রেয়তর হতো। এই সংসারে থেকে বুঝিবা ওর সাধনা সফল হবে না। তাই ভেবেছিল একসময়।

অস্থির মন নিয়ে কোন কাজই সুষ্ঠু ভাবে নিষ্পন্ন করা যায় না। ভৈরবীর কাছ থেকে অনেক কষ্টে বিদায় নিতে পেরেছিলো। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল পুনরায় আসবে রামতনু!

গোয়ালিয়রে ফিরে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েও বেশ দমে যেতে হয়েছিল ওকে। প্রেমা কিছুই বলে নি। কোনও অভিযোগও জানায় নি বরং তিন ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে প্রেমাকে বেশ সুখীই মনে হলো ওর। তবুও কোথায় যেন ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাটল দেখা দিয়েছিল। এ কথা সত্য যে পিতার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে নি রামতনু। তবে প্রেমার বিরাগ কি কেবল সে জন্যই!

অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি রামতনু। প্রেমাও তেমন ভাবে কিছু প্রকাশ করে নি। কেবল তার সূক্ষ্মভাবে স্বামীকে এড়িয়ে চলাটুকু রামতনুর দৃষ্টি এড়ায় নি। তবে একটা বিষয়ে খুবই তৃপ্তি বোধ করেছিল রামতনু। তিন ছেলে সরৎ, সুরত, তরঙ্গ এবং কন্যা সরস্বতীকে প্রেমা মনের মত গড়ে তুলছিল। বিদ্যাশিক্ষা এবং সঙ্গীত শিক্ষা সমতালে চলছিল। প্রেমা যথার্থ

মায়ের মতই সন্তানদের গড়ে তুলছিল। এখানে রামতনুর আপাততঃ কিছুই করণীয় ছিল না। বরং ও সুখী বোধ করলো। নিশ্চিন্ত হলো।

রেওয়াতে যাবার আমন্ত্রন ছিলই। প্রেমাকে বলল সে কথা। কিন্তু প্রেমা এখনই গোয়ালিয়র ছেড়ে যেতে রাজী হলো না।— "এই সময় ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখান থেকে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার চেয়েও ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হবে বেশী। নূতন স্থানে, নূতন পরিবেশে ওদের তো কষ্ট হবেই, আমার পক্ষেও অসুবিধা হবে। তুমি একাই যাও। অর্থেরও তো প্রয়োজন আছে।" বলতে বলতে হেসে ফেলে প্রেমা। একটু বা বক্র স্বরে বলে, "তুমি তো মহারাজ দানবীর। কিন্তু খাজনা আদায় না হলে, খাজাঞ্চিখানায় জমা না পড়লে, মহারাজ দান করবেন কি ভাবে?"

কথা সত্য। নিজের মনেই হাসলো রামতনু। স্বস্তি বোধও করলো। প্রেমাকে বলল, "আমি রেওয়াতে যাবার পুর্বে কদিন বৃন্দাবনে গুরুদেবের কাছে গিয়ে থাকবো। রেওয়া যাবার আগে এখানে একবার আসবো হয় তো। এখনই সঠিক বলতে পারছি না। না এলে পত্র লিখে জানাবো। আশা করি, এখানে তোমাদের অসুবিধা হবে না।"

•••

রেওয়ার মহারাজ স্বয়ং একদিন সপার্ষদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিতা বীরভান সিংহ কয়েক মাস হলো গত হয়েছেন। এখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজারাম রেওয়ার সিংহাসনে বসেছেন। সেই রাজারামই গুরুদেব আচার্য্য হরিদাস স্বামীজীর দর্শনে এসেছেন।

উদ্দেশ্য অবশ্যই তাঁর আছে। আচার্য্যজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য রামতনুকে নিয়ে যাবার জন্যই তিনি এসেছেন। তাঁর আগমনের এটাও অন্যতম কারণ। আমন্ত্রন করেছিলেন তাঁর পিতা। রামতনু স্বীকৃতিও জানিয়েছিল। নানা কারণে তখন ফলপ্রসূ হয়নি ওর ইচ্ছা। আজ এখন আর কোন প্রতিবন্ধক নেই।

মহারাজ রাজারাম একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। রামতন্নুকে রেওয়ার সভাগায়ক রূপে সসম্মানে নিয়ে যাবেন। গুরুদেব আচার্য্যজী সানন্দে অনুমতি দিলেন। আশীর্বাদ করলেন শ্রেষ্ঠতম শিষ্যকে। "তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। জয়যুক্ত হও তুমি!"...

রেওয়াতে এসে রামতন্নুর অশান্ত চিত্ত শান্ত হলো। ওর অস্থিরতার হলো উপশম। সঙ্গীত চিন্তার, সঙ্গীত চর্চ্চার এমন সুপরিবেশ এর পূর্বে ওর পাওয়া হয়নি! ও প্রাণমন ঢেলে বীণাপাণীর আরাধনায় নিযুক্ত হলো। মহারাজ রাজারাম বাঘেলার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো ও। রাজারামের প্রশস্তি সূচক গীত রচনা করে তাঁকে গেয়ে শোনালো। মহারাজ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে শ্রেষ্ঠতম বন্ধু বলে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। কেবল তাই নয়। বহু পরিমান অর্থ বন্ধু রামতন্নুকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে চিরকালের জন্য এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

মহারাজ, বন্ধু রাজারামের অনুরোধে রামতন্নু রেওয়াতে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলো। অর্থ যখন যেমন প্রয়োজন হবে মহারাজই দেবেন স্বভাবতঃই। মহারাজ স্বয়ং বেছে বেছে শিক্ষার্থীদের রামতন্নুর কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। রামতন্নু আবার তাদের মধ্য থেকে যাকে যাকে উপযুক্ত মনে হলো তাদের নির্বাচিত করলো। মহারাজও সম্মতি জানালেন।

নূতন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ নামে দুটি কিশোর সব চেয়ে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন বলে রামতন্নু তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হলো। এবং এই মনোযোগ বৃথা গেল না। সত্য সত্যই এই কিশোর প্রতিভা দুটি অচিরেই রামতন্নুর শ্রেষ্ঠতম শিষ্যে পরিগণিত হলো।

...

একদিন খুবই চিন্তিত মুখে মহারাজ রাজারাম তাঁর নিজস্ব ঘরে গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একটি বিশেষ কাজের সূত্রে রামতন্নু তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হলো। তিনি স্বয়ং উঠে এসে ওকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

উভয়ে আসন গ্রহণ করবার পরও কিছু বলছেন না দেখে রামতনুই জিজ্ঞেস করলো : মহারাজকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু। আমি একটু চিন্তিতই বটে।" কথা কটি বলে চুপ করে গেলেন তিনি। আনমনে কিছুক্ষণ ধোঁয়া উদ্গীরণ করলেন। তারপর রামতনুর দিকে তাকিয়ে বললেন : "একদিকে আমার আনন্দও হচ্ছে। আবার একটু চিন্তিত হয়েও পড়ছি !" কিছুক্ষণ আবার চুপ করে থেকে মহারাজ বলতে লাগলেন, "দিল্লীশ্বর সম্রাট একদিকে যেমন দেহে মনে ভীষণ শক্তিশালী, কূট কৌশলী ধুরন্ধর, তেমনই উদার হৃদয়, সঙ্গীতপ্রিয় ! গুণের কদর করতে জানেন এই যুবক সম্রাট। এবং এইখানেই আমার ভয়। এবং সে জন্যই আমি চিন্তিত।"

রামতনু সত্য বলতে কি, মহারাজের এই সব কথার তাৎপর্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না! সম্রাট আসবেন, তিনি গুণের কদর করতে জানেন, সে তো আনন্দেরই কথা। এতে ভয় বা চিন্তার কি আছে ?"

মহারাজ রাজারাম হাসলেন রামতনুর দিকে তাকিয়ে।—"বুঝতে পারলেন না তো, বন্ধু ? শুনুন তবে। সম্রাট আসবেন। এতো তাঁরই করদ রাজ্য। তবে তিনি এতই উদার যে কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। প্রতিবেশী বন্ধু রাজ্যের মতই ব্যবহার তাঁর। এমন উদারতা তাঁকেই শোভা পায়। তা, এমন একজন বন্ধু এলে তাঁর যথাযোগ্য সমাদর তো করতে হবে ! এবং তা আমি পারবো। সম্রাটকে খুশী করতে পারবো। কারণ, আমার কাছে আছেন বর্তমান হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুণী রামতনু পাণ্ডে। এই জন্য আমার আনন্দ হচ্ছে। আবার চিন্তিতও হয়ে পড়ছি এই জন্যই। আমার বন্ধুকে হারাতে হবেই। সম্রাট অবশ্যই আমার এই বন্ধুকে ভালবাসার দোহাই দিয়েও নিয়ে যাবেন।"

মহারাজের ম্রিয়মান অবস্থা দেখে রামতনু হেসে ফেলল।

"আপনি বৃথাই চিন্তিত হচ্ছেন, মহারাজ। আমি যদি না যাই, তবে তো আর উনি জোর করে আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না।"

"ঐখানেই বিপদ!" মহারাজ মোটেও ভরসা পেলেন না রামতনুর কথায়। তিনি জোর করবেন না মোটেও। কিন্তু আমাকে মেনে নিতে হবে এবং আপনাকেও যেতে হবেই। আপনি তখন বুঝবেন। সম্রাটকে অস্বীকার করা যায় না।" হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে মহারাজ বলে উঠলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না। এখানে তো আপনার শিষ্যা রূপবতী দেবী রয়েছেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞা এবং নৃত্যপটিয়সী। তিনি আসাতে আমাদের বিদ্যালয়ে নৃত্যশিক্ষার প্রচলন সম্ভব হয়েছে। তাকে যদি আমি অনুরোধ করি সম্রাটকে সম্বর্ধনা জানাতে, তিনি কি সম্মত হবেন না? আসরে আপনিও তো থাকবেনই একজন বাদ্য কার রূপে। সম্রাট এখনও আপনাকে চাক্ষুস দেখেন নি। এইটা মস্ত সুবিধা। কেমন! আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?"

"আমার আপত্তি হবে কেন! গুণী জানেন গুণের কদর। গুণের প্রদর্শনে গুণীর জীবনের সার্থকতা তো সেইখানেই। আমি অবশ্যই রূপবতীকে বলবো। সেও নিশ্চয়ই রাজী হবে। কিন্তু সম্রাট আসবেন কবে?"

"তা জানি না। সংবাদ পাঠিয়েছেন। অকস্মাৎ যে কোন দিন এসে পড়বেন।"

রাত্রির কয় প্রহর কে জানে। চারিপাশে অথৈ নিস্তব্ধতা। ঘরের একমাত্র প্রদীপ নিবু নিবু। বুঝি বা তৈল কমে এসেছে। আলোর চেয়ে আঁধারই বেশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা জেগে উঠলো সঙ্গীত জগতের নূর, তানসেনের। ওঁর জীবনেও তো এমনি আঁধার নেমে আসছে। আর কয়েকটা দিনই হয়তো বা। তবু এই মুহুর্তের মত সত্য তো আর কিছু নেই। যখন রূপবতী পরম নিশ্চিন্তে ওঁর বক্ষলগ্ন হয়ে আছে। হয়তো এই নিশ্চিন্ত সুষুপ্তির পথেই সে

ফিরে গেছে সেই সুনিবিড় আনন্দের দিনগুলিতে—রেওয়াতে সেই প্রথম সাক্ষাতের প'র থেকে কয়েক বৎসরের দীর্ঘ, প্রসারিত দিনগুলিতে…

নারায়ণ এসেছিল গুরুদেবের পত্র এবং রূপবতীকে পৌঁছে দিতে। রেওয়াতে রামতনু আসার মাস ছয়েক পরেই। গুরুদেব পত্রে লিখেছিলেন যে এই সদ্য যুবতী রূপবতী অতিশয় গুণের আধার। বারানসীর মেয়ে রূপবতীর পিতা নামী দামী ব্যক্তি কেউ নন। কিন্তু অশেষ গুণবান পুরুষ। সঙ্গীত এবং নৃত্য উভয় বিষয়েই ওস্তাদ। তিমি বারানসীর বিখ্যাত কয়েকজন তওয়াইফের নৃত্য-গীতের শিক্ষক ছিলেন বলে সমাজে অন্ত্যজ গণ্য হতেন। রূপবতীর মা সদব্রাহ্মণ কন্যা। রূপবতীর পিতার গুণে বশীভূতা হয়ে বিবাহ করে গৃহ ছাড়া হন। তিনি নিজেও নৃত্য-গীতে পারদর্শিণী ছিলেন। কন্যা রূপবতীকে তারা অতি যত্নে গড়ে তুলেছেন। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। বারানসীতেই গুরুদেবের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই একাকী যুবতী রূপবতী নিরাপত্তার অভাবে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনও ঠিক উপযুক্ত স্থান নয় বলে তিনি রূপবতীকে রামতনুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।…

…প্রথম দিকে রূপবতীর প্রতি তত মনোযোগ দেয় নি রামতনু। যদিও মহারাজাকে বলে রূপবতীর জন্য পৃথক থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কোন অসুবিধার কথা কোনদিন বলেও নি রূপবতী। স্বভাবে অন্তর্মুখী। তবে শিক্ষা গ্রহণে তার নিষ্ঠা দেখে ক্রমশঃ আকৃষ্ট বোধ করছিল রামতনু। গুরুদেব যথার্থই বলেছেন। রূপবতী অশেষ গুণবতী। গুণই গুণকে আকৃষ্ট করে। রূপবতী তো রসের ভাণ্ডার। মাধুর্যময়ী। মানুষের হৃদয় দ্রবীভূত হতে বাধ্য এমন গুণের সংস্পর্শে। বিশেষতঃ, কি কণ্ঠ সঙ্গীতে বা ধ্রুপদী নৃত্যে এমন এক অপরূপ উন্মাদনী এবং দ্রাবনী শক্তির অধিকারীণি রূপবতী যে রামতনু তার পরিচয় পেয়ে আনন্দের তন্ময়তায়

আত্মহারা হয়ে গেল! কয়েক মাস কেন তেমন করে মনোযোগ দেয় নি ভেবে নিজেকেই তিরস্কৃত করলো বারংবার। এর পর আর দূরে ঠেলে রাখতে পারে নি রূপবতীকে স্বভাবতই। রূপবতী কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নি। বরং নিজেকে নম্র, বিনত রাখাতেই ছিল তার আনন্দ। বিনত চিত্তেই রামতনুর কাছে এগিয়ে এসেছিল সে।···

তা অকস্মাৎই এসে পড়েছিলেন সম্রাট আকবর। মহারাজ যথার্থই বলেছিলেন। ব্যাঘ্রের মত নিঃশব্দ গতি এই যুবক সম্রাটের। অথচ, উদার-হৃদয় রুচিবান মানুষ। শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও অযথা শক্তি-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ। বন্ধুত্ব কামনায় সর্বদাই তাঁর হস্ত প্রসারিত। এই ভাবেই তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে চলেছেন। রাজারামের সঙ্গে এভাবেই সখ্যতা স্থাপিত হয়েছে তাঁর।

তিনি যেদিন রেওয়াতে এলেন, একমাত্র মহারাজা ভিন্ন—আর কেউ জানতে পারে নি। রামতনুও না। রাতের খাওয়ার পর নিত্যকার অভ্যাসমত সম্রাট বাগীচায় পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ সঙ্গীতের রেশ তাঁর কানে প্রবেশ করতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।··

···অনেকদিন পরে, তখন রামতনু বাদশাহ্ আকবরের দরবারে শ্রেষ্ঠতম গায়ক, বাদশাহ্‌র অশেষ সম্মানাস্পদ, সর্বোত্তম ও সবচেয়ে—অন্তরঙ্গ মিত্র। একদিন রামতনু সঙ্গীতের ঝঙ্কারে সিংহাসনোপবিষ্ট বাদশাহ্‌র এমন এক জীবন্ত বর্ণনা মূর্তিমান করে তুললেন যে বাদশাহ্ তাঁর কণ্ঠস্থিত মণিহার খুলে জিগ্‌রী দোস্তের কণ্ঠে পরিয়ে না দিয়ে পারলেন না; উপরন্তু, তাঁর হৃদয় এমনই দ্রবীভূত হয়ে পড়েছিল যে সেই মুহূর্তেই তিনি রামতনু পাণ্ডেকে নূতন পদবী দিয়ে আরও সম্মানিত করলেন—তানসেন! সেইদিন থেকে রামতনু পাণ্ডে চলে গেল অন্তরালে। নূতন পরিচয় হলো ওর তানসেন!

রাজা বিক্রমাদিত্যের মতই আকবরের দরবারেও নবরত্ন তো ছিলই এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতম রত্নই ছিলেন তানসেন। এরা ছাড়া আরও অনেক গুণী রত্নও ছিলেন, যাদের মধ্যে তানসেনই আদিত্যের মত উজ্জ্বল ভাবে শোভা পেতেন। তা সেদিন দরবারে যারা উপস্থিত ছিলেন, মিঁয়া খোদাবক্স, বাবা রামদাস, মিঁয়া মসনদ আলী খাঁ, সুরদাস (রামদাসের পুত্র), দরিয়া খাঁ, জ্ঞান খাঁ, কেল্ শশী, প্রভৃতি সহর্ষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। রামতনুর "তানসেন" পদবী প্রাপ্তির সম্মানার্থে তারা একদিন বাদশাহী ভোজের আয়োজন করবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করলেন। সম্রাটও সানন্দে তার সম্মতি জানালেন এবং ঘোষণা করলেন যে কেবল ভোজসভা নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্যও থাকবে।—

দরবার শেষ হলে, তানসেন ছাড়া বাকী সকলেই চলে যাবার পর সম্রাট আকবর তানসেনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আজ আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আপনাকে যদি না পেতাম, তাহলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে আমি মনে করতাম সেটা। অথচ, আপনাকে পাওয়া তো প্রায় দৈবক্রমেই বলতে গেলে। আমার বন্ধু এবং আপনারও প্রিয় বন্ধু মহারাজ রাজারাম তো আপনাকে লুকিয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন। বলুন! তাই না? আমি যদি হঠাৎই পূর্বরাত্রের বাগীচায় স্ফয়র করতে করতে আপনার কণ্ঠের বে-মেসল্ (অনুপম) সঙ্গীত শুনতে না পেতাম, তো আপনি আমার কাছে আনজান্ (অজ্ঞাত) থেকে যেতেন! অবশ্য স্বীকার করবো যে আপনার শিষ্যা, রূপবতীর নৃত্য এবং গীত অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল সেইদিন। কিন্তু, এই যে বললাম, তখন আপনার গানের সুর যে আমার প্রাণের ভেতর দরদের মত বাজছে! আমার শান্তি নেই আপনাকে না দেখা পর্য্যন্ত।...

'একথাগুলি বাদশাহের সত্য কথা। সেইদিন মহারাজ রাজারামের ফন্দি খাটে নি। রূপবতীর সঙ্গে নৃত্য ও গীতে সঙ্গতিয়া বাদ্যকার রূপে রামতনুই ছিল। মহারাজ তো ঘুনাক্ষরেও ভাবেন

নি রূপবতীর ধ্রুপদী নৃত্য-গীতের পরও বাদশাহ্ পুর্বরাত্রের সঙ্গীত কারকে দেখার জন্য অমন পীড়াপিড়ি করবেন। অগত্যা বাদ্যকারের রূপ ত্যাগ করে রামতনুকে উঠে আসতে হয়েছিল। গান গেয়ে শোনাতে হয়েছিল বাদশাহ্কে। এবং অনিবার্য্য ভাবেই বাদশাহ্ রাজারামের কাছে যাচ্ঞা করেছিলেন রামতনুকে দিয়ে দেবার জন্য। রাজারামও শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে রামতনুকে উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন বাদশাহ্ আকবরের কাছে।—

সেই রাত্রিই প্রথম রাত্রি। রূপবতী এসেছিল। এমনি করে ওর বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদেছিল। বিচ্ছেদ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না সে। রামতনু আশ্বস্ত করেছিল রূপবতীকে। এমন কথাও বলেছিল যে হোন না আকবর সর্বশক্তিমান হিন্দুস্থানের বাদশাহ্, যদি ওর সেই বাদশাহী দরবার ভাল না লাগে তাহলে দশজন আকবরেরও সাধ্য হবে না রামতনু পাণ্ডেকে বেঁধে রাখে। কারণ, রামতনু পাণ্ডেও তো হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-জগতের সম্রাট-বাদশাহ্! এমনি করেই রূপবতীর পিঠে, আলুলায়িত কেশপাশে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল ও। বলেছিল মহারাজ রাজারাম অতিশয় সজ্জন। এখানে রূপবতী নিরাপদ নিঃসঙ্কোচে থাকতে পারবে। কোন অসুবিধাই তার হবে না। এবং যেদিন যে মুহূর্তে রামতনু অবস্থা অনুকূল বুঝবে, সেই দিন, সেই মুহূর্তেই নিয়ে যাবে রূপবতীকে নিজের কাছে।—কথা রেখেছিল রামতনু। কিন্তু অনেক বিলম্বে। সে জন্য আজও নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কেবল রূপবতীর কাছে নয়। স্ত্রী প্রেমার কাছেও অপরাধী ও। তবুও তো এখানে এসে রূপবতী বুঝেছিল অনেকখানি। সবটুকু নয় যদিও। কিন্তু প্রেমা তো আসেই নি। বার বার অনুরোধ, উপরোধ সত্ত্বেও আসতে চায় নি প্রেমা দিল্লীতে রামতনুর কাছে। কেবল তিন পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কন্যা—সরস্বতীকে কিছুতেই পাঠাতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত আর কিছু বলেনি বা বলতে চায় নি রামতনুও। বললে প্রেমা বুঝতো না, মানতোও না।

আর সত্য এই যে তিনি বোঝাতেও পারতেন না। কারণ, কি যে ওর হয়েছিল, তা কি আজও তিনি সম্যকরূপে জানেন ? না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও, আজও, সেই দিন গুলির রহস্য তিনি ভেদ করতে পারেন নি। কি এক মহা-বিষণ্ণতায় ভরা সেই দিনগুলি! আহারে রুচি নেই কারণ ক্ষুধা বোধই নেই। জেগেই আছেন কারণ নিদ্রাকর্ষণ নেই। বসেই আছেন এক স্থানে, এক-ভাবে—কারণ চলতে ফিরতে ইচ্ছাই করে না। কেমন যেন জড়-মানুষে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। এক বিধ্বংসী জাড্য ক্রমশঃ যেন স্থবির করে দিচ্ছিলো ওকে। কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছিল ওকে ভিতর থেকে সেই মহাবিষন্নতার অদৃশ্য কীটগুলি। সেই দুর্দিনে মেহের এল একঝাঁক পুষ্পের মত। উনবিংশতির অপাপবিদ্ধা যুবতী শরীরের প্রমত্ত সৌরভে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল ওর। বিষন্নতার ঘোর কেটে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। মেহেরের অকৃত্রিম সাহচর্য জীবনের দিনগুলি আবার অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো! গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক ছাপিয়ে এক মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হলো দুজনের মধ্যে।

সম্রাট আকবর খুশী হলেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন প্রতিভাসম্পন্ন দুর্জয় সঙ্গীত-সাধককে চোখের সামনে দিনের পর দিন ক্ষয়ে যেতে দেখে নিজেকেই অভিশাপ দিচ্ছিলেন সম্রাট! তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিলো যে রেওয়া থেকে যদি তিনি নিয়ে না আসতেন, তাহলে বুঝি এমনটা ঘটতো না। মানুষের মন গভীর সমুদ্রের মত দুরবগাহ, দুর্জ্ঞেয়। তাই তিনি যেন দিশাহারা বোধ করছিলেন। মনে মনে সহস্রবার আশীর্বাদ করলেন বড় আদরের কনিষ্ঠা কন্যা শুক্কুর উন্নিসাকে—যাকে সকলেই মেহের উন্নিসা বলে ডাকে। স্বয়ং আকবর বাদশাহ্‌র আম্মা মরিয়ম-মকানী (হামিদা বানু বেগম যার আসল নাম ছিল।) নাতনীর মেহের উন্নিসা নাম রেখেছিলেন।

মেহেরের মা বয়সের প্রশ্ন তুলে রামতনুর সঙ্গে শাদিতে আপত্তি

করেছিল। কিন্তু শাস্-এর (শ্বাশুড়ি) ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। পুত্র আকবরের সমক্ষেই পুত্রবধুকে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন মরিয়ম-মকানী। "তুমি কি জান যে বেটা আকবরের আব্বার সঙ্গে যখন আমার শাদী হয়, তখন আমার উমর চোদ্দ সালও পুরা হয় নি। আর বাদশাহ হুমায়ুঁর উমর তখন কমপক্ষে চাঁওতিস্-পাঁয়তিস্ (চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ) ?"

এরপর আর কারো কোনও আপত্তির প্রশ্নই উঠলো না। আকবর বাদশাহ্‌র দিক থেকে তো কোনও আপত্তিই ছিল না। কারণ তিনি তো চেয়েছিলেনই এই বিরাট সঙ্গীত-প্রতিভাকে আরও কাছে, আরও আপনার করে পেতে।—

—দুজনেই নিজের নিজের ভাবনার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। প্রহর ঘোষণার ঘণ্টাধ্বনি কানে যেতে প্রথমে বাদশাহ্‌ই সজাগ হলেন।—"কি এত ভাবছেন মিঁয়াজী? আসুন! রাত অনেক হলো!"—

চম্‌কে ফিরে তাকালেন তানসেন! বাদশাহ্‌র মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বোধ ফিরে এল ওর। দীর্ঘশ্বাস দমন করে উঠে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ, চলুন!'

হারেম-সায়েরের (অন্তঃপুর) দিকে যেতে যেতে বাদশাহ্ বললেনঃ —"কোন নূতন রাগ বাঁধলেন নাকি?"

"হ্যাঁ। আপনাকে আজই শোনাবো। আর যে রাগ আমি কখনও দরবারে গিয়ে শোনাবো না, কোনদিনই না, তা আমি শোনাবো আপনাকে আগামীকাল ভোরে। ভোরেরই রাগ। কিন্তু যেমনটি এখন প্রচলিত আছে; হয়তো কোনও ওস্তাদ আপনাকে শুনিয়েও থাকতে পারে, সেই একই রাগ আমি আপনাকে গেয়ে শোনাবো। শোনার পর আপনি আমাকে বলবেন এমনটি আর কখনও শুনেছেন কি না। অনেক বছর আগে এই দিল্লী নগরীতেই আমি একজনের কাছ থেকে এই রাগ শিখেছিলাম।—"

খেতে খেতে, যেমন প্রায়শঃই হয়, আজও নানা বিষয়ে আলোচনা উঠলো। এবং স্বভাবতই শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের দুনিয়াতে এসে পড়লো সেই সব আলোচনা।—" আচ্ছা, মিঁয়াজী! আমি অনেক দিন ধরেই একটা কথা বলবো বলে ভাবছি। কিন্তু, বলতে একটু বাধছে। কি জানি, হয়তো আপনার মনে আঘাত দিয়ে ফেলবো। আপনি আঘাত পেলে তো আমাব চোখের সামনে সব আঁধার!"

মহামতি আকবরের দিকে তাকিয়ে মিঁয়া তানসেন হেসে ফেললেন। একটু ঠাট্টার স্বরে বললেন, "তবে তো বাদশাহ আমাকে খুব চিনেছেন। এতদিনে আপনার এই ধারণা হলো যে আপনি বললেন আর তাতে আমি আঘাত পাবো?"

বাদশাহ্ও হাসলেন। বললেন, "আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তো আপনাকে বলি। আমি বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছি আর নিজেকেই ডেকে ডেকে বলছি: "এ্যায়্ শাহ্-এন্-শাহ্ বাদশাহ্ আকবর! তোমার সঙ্গীতের দরবারে তো একটাই কোহিনুর আছে, কণ্ঠ সঙ্গীতের কোহিনুর, মিঁয়া তানসেন! কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এমন কোন যন্ত্রী তো নেই! এ কথা ঠিক যে তানসেনজী নিজে কেবল গায়ক নন্, উত্তম যন্ত্রীও বটে। তাঁর রবাব বাদন বা বীণাবাদন, তার তো কোনও তুলনাই নেই। আবার ঢুহুল্ কি পখোয়াজেও তাঁর জুড়ি নেই! তিনি যখন নৃত্যের সঙ্গে বা গানের সঙ্গে সঙ্গতিয়া রূপে সঙ্গত করেন, তখন যেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়, তেমন তৃপ্তি তো তাঁর গানের সঙ্গে যখন অন্য সঙ্গতিয়া সঙ্গত করেন, তখন পাওয়া যায় না! কিংবা কেবলই বীণ বা সহ্তারও যারা বাজিয়ে শোনান এই দরবারে, তাদের বাদন শুনেও তো আর তেমন দিল্খুশ্ হয় না। মন ভরে না। তো, বাদশাহ্ আকবর! এর তো একটা বিহিত করতে হয়! তামাম হিন্দোস্থানে কি এমন কোনও যন্ত্রী নাই, যার দেল্চস্প্ (চমৎকার!) বাদন শুনে অন্তরাত্মায় শান্তি হয়!—তা মিঁয়া তানসেন! আপনি

জানেন না কি হিন্দুস্থানে এমন যন্ত্রী কেউ আছেন কিনা? যদি থাকেন তো আমাকে বলুন। আমি সসম্মানে তাঁকে নিয়ে আসি!"

তানসেন বাদশাহ্‌র কথা শুনে হেসে ফেললেন।—"আপনাকে যন্ত্র সঙ্গীতে তুষ্ট করবে, এমন কোন ওস্তাদ, যারা পেশহ্‌দার (পেশাদার) ওস্তাদ বিশেষ করে, তাদের হিম্মত নাই। তবে হ্যাঁ, আমি একজন বীণকারকে জানি, বর্তমান হিন্দুস্থানে যাঁর কোন তুলনা নাই। বাদশাহ্‌কে খুশী করার, সত্যিকারের আনন্দ দেবার হিম্মত রাখেন তিনি। বাদশাহ্‌ যদি তাঁকে দাওয়াত দিয়ে (নিমন্ত্রণ) নিয়ে আসতে পারেন তো তাঁর বীণবাদন শুনে আপনি মোহিত হয়ে যাবেন। কিন্তু—"

—"কিন্তু? কিন্তু বলে থেমে গেলেন কেন, মিঁয়া? বলুন?"

"তিনি একজন মহারাজা।" তানসেন ঈষৎ সন্দেহ ভরা স্বরে বললেন,—"উপরন্তু রাজপুত! সে জন্যেই ভাবছি, বাদশাহ দাওয়াত দিলেও তিনি আসবেন কিনা! কারণ, তাঁর রাজ্য সিংহলগড় বাদশাহ্‌র অধীন নয়। বাদশাহ্‌ নিশ্চয়ই বুঝেছেন? আমি মহারাজ সমুখন সিং-এর কথাই বলছি। তাঁর এক পুত্র আছে। তার নাম জানি না। সেও নাকি ওস্তাদ বীণকার। বাদশাহ্‌ একবার দাওয়াত পাঠিয়ে দেখতে পারেন।"

তানসেন বোধহয় অজ্ঞাত সারেই বাদশাহ্‌ আকবরের গোপন অহঙ্কারের তারে মৃদু আঘাত দিয়ে ফেললেন! হিন্দুস্থানের মহা-শক্তিমান শাহেনশাহ্‌ বাদশাহ্‌ আকবরের দাওয়াত পেয়েও কোনও প্রতিবেশী রাজা বা মহারাজা না আসার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবেন, হোন না তিনি রাজপুত, এ সত্য মেনে নেওয়া আকবরের পক্ষে সহজ নয়। তাই তানসেনের সন্দেহের কথা শুনে ক্ষণেকের জন্য তাঁর মুখ কঠিন আকার ধারণ করল। তবে তা ক্ষণেকের জন্যই। পরমুহূর্তেই তিনি হেসে বললেন: তানসেনজী! আপনি তো জানেন যে অস্ত্র ধরতে আমার স্বভাবতঃই অনিচ্ছা। কিন্তু প্রয়োজন হলে তো আমি চুপ করে থাকবো না। আপনি তো

আমার নীতি জানেন। জিস্‌কি লাঠি উস্‌কি ভঁইস্‌ (জোর যার মুল্লুক তার)—এই নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আমার নীতি দোস্তি পাতানো। তাতেই আমার দুতরফে লাভ হয়। এক দিকে দোস্তি অন্যদিকে সব রাজ্যগুলিকে দোস্তির বাঁধনে বেঁধে ফেলা। তাতে আমার যেমন উপকার, এই দেশের পক্ষেও উপকার। তাই না?—

তানসেন হেসে বললেন, "বেশক্‌। লাখ কথার এক কথা বলেছেন।

"ভেবে দেখুন, "আকবর বলতে লাগলেন, "রাজা সমুখন সিং-এর বীণবাদন শুনে যেমন আনন্দ পাবো, তেমনি তাঁর সিংহলগড় রাজ্যের সঙ্গে দোস্তির সম্পর্ক হলে আমি অন্যদিক থেকে আনন্দিত হবো। আশাকরি, আমার কথার আসল অর্থ আপনি বুঝতে পেরেছেন? দুদিক থেকেই আমার লাভ হবে। বলুন, ঠিক কি না?

তানসেন হাসলেন। "ঈশ্বর আপনার মনোস্কামনা পূরণ করুন।"

"আমি কালই মহারাজ সমুখন সিং-কে দাওয়াত পাঠাবো। বলবো যে তাঁর বীণ্‌বাদনের সুখ্যাতি শুনে আমি বেচ্যয়ন হয়ে (উৎকণ্ঠিত হয়ে) অপেক্ষা করছি। মহারাজকে কৃপা করে একবার দিল্লীতে পদধূলি দিতেই হবে।" ··

·· শাহী মহলে পা দিয়েই তানসেন শুনতে পেলেন যে বাদশাহ বারিশখানায় আছেন। সেখানে তানসেন এবং মানসিংহ ছাড়া আজ আর কারও যাবার হুকুম নেই। তানসেন একটু অবাক হলেন। সাধারণতঃ যখন ঘোর বরসাত সুরু হয়, তখনই বাদশাহ মাঝে মাঝে বারিশখানায় একা একা চলে যান। অপরিমিত মদ্যপান এবং সেই সঙ্গে আফিমযুক্ত তামাকের ধুম্রপান। ভীষণ নেশাগ্রস্থ হয়ে ভূতের মত বসে থাকেন। সময়ের হুঁস্‌ থাকে না। কিন্তু এখন তো কেবল বর্ষা আরম্ভ হয়েছে মাত্র। তেমন ঘোর বর্ষা তো নামে নি। তখন ওঁর মনে পড়লো যে কোন কারণে অন্তরে দুঃখ বোধ করলেও মাঝে মধ্যে তিনি চলে যান বারিশখানায়। ওর মনে পড়ে গেল বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। ··

…বারিশখানাতে প্রায় পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন শাহেন-শাহ্ আকবর। সামনের তশ্তরীতে রাখা একরাশ চাঁপাফুল। আকাশে ঘোর বর্ষার মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি নামে নি। চারিপাশে কেমন যেন একটা চাপা বিষণ্ণতার আঁধার ক্রমশঃ ধরিত্রী ছেয়ে ফেলছে। আকবর স্থির বসে আছেন।

সঙ্গমর্মরের (পাথর) সিঁড়িতে নিঃশব্দ পা ফেলে ফেলে উঠে এলেন মানসিংহ। দেখেও যেন দেখতে পেলেন না বাদশাহ্। কেবল একবার মাথা নেড়ে বসতে ইশারা করলেন। একটু পরেই এলেন তানসেন।

তখন মুখ তুলে তাকালেন বাদশাহ্। তানসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নীরব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চাইলেন যেন।

তানসেনের মুখেও কি এক করুণ বিষণ্ণতা।

কতক্ষণ কেউ-ই কোনও কথা বললেন না। তারপর বাদশাহ্ মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন : জগত গোঁসাইন তাহলে আমাদের ছেড়ে চলেই গেলেন।" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাদশাহ আকবরের বুক ভেঙ্গে। "সেই দিনটার কথা আমার বড় বেশী মনে পড়ছে আজ। তাঁর প্রতিটি কথা এখনও আমার বুকের মধ্যে লেখা হয়ে আছে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা। তাঁর সেই স্বর্গীয় গান শোনার পর যখন তিনি আমার সত্য পরিচয় জানলেন, তখন তাঁর মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি যখন বললেন যে তোমার চোখে মুখে একটা প্রখর শক্তির আভাস পাচ্ছি, তুমি পারলেও পারতে পারো। দেখো চেষ্টা করো, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ বিচার এত বেশী, ধর্ম নিয়ে অযথা কুসংস্কার, রেষারেষি, মারামারি, জাত-পাত নিয়ে চরম নোংরামি যা এই দেশটাকে ক্রমশঃ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তুমি পারবে এইসব মুছে দিয়ে একটা সমন্বয় আনতে? তোমার বয়স কত? শুনে বললেন যে এখনও ঢের সময় আছে। তোমার পক্ষেই সম্ভব কিছু করতে পারা। রাজপুত রাজারা তো সুযোগ পেয়েও কিছু করতে পারলো না।"…

"তানসেনজী! আপনার তো মনে আছে। তখন আমাদের দুজনের নয়া নয়া দোস্তি হয়েছে। প্রথম যেদিন আমি আপনার কণ্ঠে সেই অনবদ্য ভজন গান শুনলাম, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এমন অনুপম গান কোন্ ওস্তাদ আপনাকে শিখিয়েছে? তো আপনি হেসে বলেছিলেন যে আমি আর এমন কি গেয়েছি। সঙ্গীতের সাধনা সব সাধনাব শেষ কথা। এই জিনিষ কাউকে শেখানো যায় না। মানুষের অন্তরে যত দুঃখ, বেদনা, প্রেম, আনন্দ, ভালবাসা, সবই সে এই সঙ্গীতাঞ্জলী দিয়ে নিবেদন করে ঈশ্বরের চরণে। এই গানগুলিও তেমনই এক নিবেদিত প্রাণা রমণীর রচিত। তিনিই আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া,—জগত গোঁসাইন মীরাবাঈ। তিনি আমাকে স্নেহ করেন, ভাল বাসেন। তাই আমিও সময়ে সময়ে তাঁরই গান গেয়ে তাঁর পূজা করি।—

"জানেন তানসেনজী! আপনারই দয়ায় সেদিন তাঁর স্বকণ্ঠে তাঁর সামনে, ঘাসের আসনে বসে, সেই গাছের স্নিগ্ধ ছায়ার নীচে গান শোনবার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তার জন্য কতখানি কৃতজ্ঞ রয়েছি আমি আপনার কাছে। সেই পক্ককেশ বৃদ্ধার অপরূপা মাতৃমূর্তি আমার হৃদয়ের পটে আজও অম্লান। আজ তাই আমি মাতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করছি।" বলতে বলতে চোখ দুটি জলে ভরে উঠল তার।

তানসেন কোনও উত্তর দিলেন না। বাদশাহর মনের ব্যথা তিনি সহজেই অনুভব করতে পারছেন। খানিক পরে তিনি বললেন, "আজ আমি মীরাবাঈর গান গেয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবো।"

তানসেন মীরাবাঈ রচিত মল্লার রাগের একটি গান আরম্ভ করলেন।

তখন চরাচর ব্যেপে টুপটাপ্ টুপ্টাপ্ পুষ্পের মতো বারি ধারা ঝরতে শুরু করেছে।···

···ভাবতে ভাবতে কখন বারিশখানার সঙ্গমর্মরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে একেবারে বাদশাহ্র মুখোমুখি হয়েছেন, তার খেয়ালই ছিল না

তানসেনের। বাদশাহ্‌র গলার স্বরে তার সম্বিৎ ফিরল।—"আসুন মিয়া তানসেন। বসুন। আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম!"

তানসেন সামনের আসনে বসলেন। তাকালেন বাদশাহর দিকে। খুবই ক্লান্ত এবং কিছুটা বা বিমর্ষ মনে হলো বাদশাহকে।

"আপনার সন্দেহই শেষ পর্য্যন্ত সত্যি হলো। আমাকেও অপ্রিয় কাজ করতেই হলো! বাদশাহ্‌ এইটুকু বলে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর আবার কতকটা যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন: "আমি তাকে এত সম্মান জানিয়ে দাওয়াত দিলাম। আর আমার সেই দাওয়াতের উত্তরে তিনি হুমকি দিয়ে জানালেন যে এই দাওয়াতের পিছনে মুঘল সম্রাটের যে অভিসন্ধি আছে তা তিনি ভালভাবেই জানেন। সাচ্চা রাজপুত রাজারা মুগলদের সঙ্গে দোস্তি অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে করেন। আমিও যবন সম্রাটের দোস্তি চাই না। আমি জানি যে এ জন্যে আমার সর্বনাশ করতে মুগল সম্রাট এতটুকুও দেরী করবেন না। তিনি বরং এই সর্বনাশকে চিতোরের মত গৌরবের বলেই মনে করবেন। বাদশাহ্‌ স্থির জেনে রাখুন—শিবমন্দিরের পুজোর আসনে বসে আমার আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে যে যন্ত্র আমি শোনাই তা কোন যবন সম্রাটের শ্রুতিগোচর হোক, তা আমি কখনই চাইবো না। বাদশাহ্‌র ক্ষমতা আছে। পারলে আমার রাজ্য লুঠ করে নিয়ে যান, আমাকে হত্যা করুন, কিন্তু বীণা বাজিয়ে আপনাকে কোনদিন শোনাবে না মহারাজা সিংহলগড়াধিপতি সমুখন সিং।—

'তানসেনজী! আপনিই বলুন! এমন জবাব পাওয়ার পর বাদশাহ আকবরের পক্ষে চুপ করে মেনে নেওয়া সম্ভব? সে জন্যেই, আপনাকে না জানিয়েই, আপনি কদিনের জন্য গোয়ালিয়র চলে গেছেন তো, তাই, সিংহলগড় দখল করে নিয়েছি। আমার সৈন্যদের হাতে রাজা সমুখন প্রাণ দিয়েছেন। আমি যুবরাজ মিশ্রী সিং-কে বন্দী করে এনে বন্দিশালায় রেখে দিয়েছি।' এ পর্য্যন্ত বলে বাদশাহ কি যেন ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ একসময় আবার বলতে লাগলেন : "আমি যে কিভাবে গত দুদিন ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছি! এবার আপনি এসে গেছেন। আমি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন আমার কথা শুনে। তাই না?" বাদশাহ হাসলেন। বললেন, "তবে শুনুন! আমি দুদিন আগে খুব গোপনে বন্দিশালায় গিয়েছিলাম। আমি যখন সমুখন সিং-এর পুত্র যুবরাজ মিশ্রী সিং-কে বন্দী করে এখানে নিয়ে আসি, তখন কয়েকজন আমাকে সংবাদ দিয়েছিল যে যুবরাজও তার পিতার মতই বীণ বাদনে অত্যন্ত দক্ষ। কতটা দক্ষ তা অবশ্য তখনই আমার জানা ছিল না। সম্ভবও ছিল না। যা হোক। সেদিন বন্দিশালায় গিয়ে, যে কক্ষে যুবরাজ বন্দি আছেন, তার কাছাকাছি হতেই বীণার ঝঙ্কারে আমি চমকে উঠলাম! এই রকম বীণাবাদন, মনে হলো আমার, আমি তো আর জীবনে কখনও শুনি নি! তানসেনের গানের পর যেমন আমার আর কারও গান শুনতেই ইচ্ছা হয় না, কোন যন্ত্রীর যন্ত্র শোনা তো পরের কথা। কিন্তু যুবরাজের ওই বীণা বাদন শুনে, বিশ্বাস করুন, আমি একটুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না, আমার কেমন য়কীন হলো, মনে হলো, কেউ যেন তানসেনের কণ্ঠস্বর বীণার সোয়ারিতে কেটে কেটে বসিয়ে দিয়েছে। যন্ত্র-সঙ্গীত এই-রকম অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, এতো আমার কল্পনাতেও কোনদিন ছিল না। সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুনলাম। আমি আনপঢ় (লেখাপড়া না জানা) লোক। তবু শুনে শুনে যা ধারণা হয়েছে, তাতে মনে হলো রাগ পূরবী বাজালেন তিনি।—

"তা, বাজানো শেষ হলে, আমি তার কক্ষের দরজা খুলিয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম। তার কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তা, তিনি উত্তর দিলেন যে বন্দি-শালায় যেমন হয়, ততটুকুই অসুবিধা। তা ছাড়া, তিনি ভালই আছেন। তিনি তার প্রাণের যন্ত্রটি কাছে রাখতে পেরেছেন সে জন্য ধন্যবাদ জানালেন। আমি তখন তাঁকে আহ্বান জানালাম।

আসুন আমার দিল্লী দরবারে আসুন। তানসেনের সমতুল্য সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকুন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হচ্ছেন না, হচ্ছেন না। —আমি বুঝতে পারছি যে তাঁর অন্তরে ক্ষোভ রয়েছে, তা তিনি ভুলে যেতে পারছেন না। আর আমার পক্ষে তাঁর এই চিত্ত বিক্ষোভে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া নিতান্তই নিরর্থক হবে।' একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বাদশাহ আবার কতকটা অনুনয়ের স্বরেই বলতে লাগলেন, "তানসেনজী! আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন! দেখুন তাঁর ওই ক্ষোভের উপশম করতে পারেন কিনা। আমার বিশ্বাস যে আপনি নিজে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হতে পারেন। আসলে, জানেন তানসেনজী! এমন একজন গুণী ব্যক্তি একেবারে আমার এত কাছে এসেও মনে ক্ষোভ নিয়ে চলে যাবেন, এটা যেন আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারছি না।"

"বেশ! আপনি যখন বলছেন, আমি চেষ্টা করে দেখবো।" মৃদু স্বরে তানসেন বললেন।

"তাহলে এখনই যান। আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করি।"

ভোরের আজানের সুর শুনে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল তানসেনের। রূপবতীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসল ঈষৎ লজ্জিত মুখে। কেশপাশ গুছিয়ে আলগা খোঁপা বেঁধে নিল। অসংবৃত পরিধেয় কোনমতে শরীরে জড়িয়ে নিল। একবার তাকাল তানসেনের মুদিত চক্ষু মুখের দিকে। একটা অনামা আশঙ্কায় শরীরের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল! তাড়াতাড়ি ডান হাত দিয়ে তানসেনের কপাল স্পর্শ করল। একটা নিশ্চিন্ততার শ্বাস ফেলল তারপর।

তানসেন টের পেয়েও চক্ষু খুললেন না বা জেগেই আছেন তেমন আভাসও দিলেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর শরীর

ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে ফেলছে! সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি তিনি ফিরে পাবেন না। নাহ! কোনও রকম আফশোষ বা আকাঙ্ক্ষা নেই আর। ছেলেরা সকলেই উপযুক্ত হয়েছে। বাদশাহর কৃপায় সকলেরই দরবারে যথাযোগ্য আসন মিলেছে। কেবল কনিষ্ঠ সন্তান বিলাসের জন্য একটু দুশ্চিন্তা হয় মাঝে মাঝে। বিলাস তাঁর তিন দাদার মত নয় মোটেও। বিলাসের মধ্যে কেমন একটা আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ জন্ম নিচ্ছে, এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন। ইদানীং তার পোষাক পরিচ্ছদেও পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিক থেকে জামাতা মিশ্রী সিং-এর সঙ্গেই তার মিল বেশী। তেমনই রক্তাম্বর পরিচ্ছদ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালের উপর সিন্দুরের মস্তবড় রক্ত বর্ণ ফোঁটা, মিশ্রীর মতই।

কিন্তু মিশ্রী তো শাক্ত বংশের সন্তান। সরস্বতীর সঙ্গে বিবাহের সময় বাদশাহ আকবর তার নূতন নামকরণ করলেন নবাৎ খাঁ। স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু তার আচার আচরণ বা পোষাক পরিচ্ছদ তো আর পাল্টায় নি। কিন্তু বিলাস ওঁর ঔরসজাত হলেও মেহেরের গর্ভের সন্তান। আজন্ম বাদশাহী পরিবেশে মানুষ হয়েও তার মধ্যে শাক্তভাব যে কি করে এলো! সৃষ্টি কর্তার যে কি অরূপ লীলা! এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষতা অর্জনে সরৎ, সুরত এবং তরঙ্গের চেয়েও বিলাসের সাফল্য বেশী। তিনি উপলব্ধি করেন, যেমন তার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদ্বয় তানতরঙ্গ ও মান-তরঙ্গ, তেমনই তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ ভাণ্ডারী বিলাস। এদের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গীত ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় বিস্তৃত হবেই, এই দৃঢ় প্রতীতি তাঁর। কন্যা সরস্বতীও তাঁর অশেষ গুণবতী! আর জামাতা মিশ্রী সিং! মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলির কথা!···

··· ··· ···

বাদশাহকে অপেক্ষা করতে বলে তানসেন সোজা বন্দিশালায় মিশ্রী-সিং এর কক্ষে চলে গেলেন। কারা রক্ষক নিজে ওকে পৌছে দিয়ে বাইরে প্রহরায় দাঁড়িয়ে রইলো।

সেদিন অনেক করে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, তাঁর ক্ষোভ দূর করে সম্মত করালেন যে বাদশাহর দরবারে সে বীণালাপ করবে। এবং বাদশাহও তাকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে দরবারে গ্রহণ করলেন। একে তো মিশ্রী সিং শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশের এবং একজন স্বাধীন নৃপতির সন্তান বলে সম্মানীয় ছিলেনই, উপরন্তু হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠতম বীণা বাদক বলে তাকে আরও একটি বিশিষ্ট সম্মান দেওয়া হলো। দরবারের সমস্ত গুণীজন বিনা প্রতিবাদে একবাক্যে যন্ত্র-সঙ্গীতের তানসেন বলে তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। তানসেন স্বয়ং তাকে বাদশাহর সঙ্গীত সভার সর্বমান্য প্রধান গুণীজন বলে মেনে নিলেন। এর পর থেকে তানসেনের সঙ্গে সঙ্গতে যথার্থ বীণাবাদক হলেন মিশ্রী সিং। মিশ্রী সিং আসার ফলে এতদিন বাদশাহর দরবারে যে উপযুক্ত সঙ্গতিয়ার অভাব ছিল, তা পুর্ণ হলো। বাদশাহ আকবরের সঙ্গীত-সভা এই দুই ওস্তাদের উপস্থিতিতে একেবারে ঝলমল করে উঠলো।—

তানসেন ধ্রুপদ রচনা করে ঠিক যেমনটি গেয়ে যান ঠিক তেমনি ভাবেই মিশ্রী সিং সেই গীত হুবহু বীণাতে বাজিয়ে শুনিয়ে দেন। দরবারের সঙ্গীত সভা এখন দুই প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এবং অনিবার্য ভাবেই সংঘাতও এল ঘনিয়ে। দুজনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলতে লাগল। দরবারের গুণী মণ্ডলীও মজা দেখবার জন্য দুভাগে ভাগ হয়ে গেলো।

তানসেন ইচ্ছে করেই একদিন এমন তানযুক্ত গীত রচনা করে গান গেয়ে গেলেন যে বীণাতে সঙ্গত করতে গিয়ে কোন খেই ধরতেই পারলেন না মিশ্রী সিং। খুবই স্বাভাবিক। বীণা একটি যন্ত্র। তার সুরের বাঁধন পর্দা গুলিতেই সীমাবদ্ধ। সে তো তার বাহিরে যেতে পারে না। আর গায়কের কণ্ঠ তো মুক্ত বিহঙ্গের মত আপন ইচ্ছামত গতিশীল। সজীব কণ্ঠের তান জড়বস্তু যন্ত্র আর কতদূর পর্যন্ত তুলতে সমর্থ হবে?

মিশ্রী সিং পারলেন না সেই তান বীণাতে তুলতে। অপমানে দুই কান তাঁর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। তানসেন যে তাঁকে জব্দ করবার জন্যই অমন তানযুক্ত গীত রচনা করেছেন, তাতে তার সন্দেহ রইল না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরকম আচরণ অসাধুতার পরিচায়ক। তিনি তানসেনকে সরাসরি অভিযুক্ত করে তাঁর মনোভাবের নিন্দা করলেন।

তানসেনও রূঢ় জবাব দিয়ে বলে উঠলেন, "শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে অহঙ্কার করা সহজ; কিন্তু যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন!"

মিশ্রী সিং ক্রোধে ভালমন্দ বিচার বোধ হারিয়ে ফেললেন। কোমরের খাপ থেকে দীর্ঘ খড়্গ খুলে নিয়েই তানসেনের মাথায় আঘাত করলেন। দরবারের গুণীমণ্ডলী 'আরে! আরে! করে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে তানসেনের শরীর রক্ত স্নাত হয়ে গেছে!

রক্ত দেখেই মিশ্রী সিং-এর সম্বিত ফিরলো। কাজটি যে অতীব গর্হিত হয়েছে বুঝতে পেরেই ধীরে ধীরে দরবার ছেড়ে চলে গেলেন তিনি!

তানসেন কিন্তু আঘাত পেয়েও মিশ্রী সিং-এর প্রতি কোনও বিদ্বেষ বা বৈরীভাব পোষণ করেন নি। নিজে প্রতিভাবান হয়ে অন্য প্রতিভার অবমাননা করবেন, অত সঙ্কীর্ণমনা তিনি নন।

আকবরও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। মিশ্রী সিং-এর মত প্রতিভাকে খোয়াতে তিনিও রাজী ছিলেন না। মিশ্রী সিংও কোথাও পালিয়ে যান নি। দরবারে না এলেও তানসেনের অবস্থার খোঁজ খবর নিতেন।

সুযোগ বুঝে বাদশাহ একদিন ধরে আনলেন তাঁকে। সোজা তানসেনের কাছে নিয়ে এলেন! বললেন, তানসেনজী! এই নিন আপনার আসামী। আপনি হুকুম দিন এর গর্দান নিচ্ছি! শুধু আমাকে আর একজন মিশ্রী সিং এনে দিতে হবে আপনাকে।"

তানসেন হেসে ফেললেন! "আমার কোন রাগ নেই মিশ্রীর উপর। আমি অনেক আগেই ওকে মাপ করে দিয়েছি।"

"না, না, শুধু এই টুকুতে হবে না। আপনাদের দুই প্রতিভার একটা পাকা, স্থায়ী মিলন হওয়া দরকার। আপনার কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে এর বিবাহ দিন। ভেবে দেখুন! এমন উপযুক্ত পাত্র আপনি আর পাবেন না! গুণীর সঙ্গে গুণীর মিলন হোক। আমি বলছি এই মিলন সুখের হবে। সরস্বতী মায়ের কল্যাণ হবে। আপনি রাজী হয়ে যান। কোন আপত্তি করবেন না।'

আমার তো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু—বলে মিশ্রী সিং-এর দিকে তাকালেন।

মিশ্রী সলাজ মুখে তানসেনের দুই পদযুগল ছুঁয়ে প্রনাম করলেন।

... ...

আহ্! কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল তানসেনের বুক ছিড়ে দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে। পলকের জন্য চোখ দুটি খুলে গেল। রূপবতী চলে গেছে। শূন্য ঘর। প্রদীপের আলো নিভে আসছে। তেল নিঃশেষ হয়ে গেছে বুঝি। জমাট অন্ধকার চারিপাশ থেকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। চোখ দুটি আবার আপনিই বুঁজে গেল।...

হঠাৎ চমকে উঠলেন তানসেন! সুষুপ্তির ওপার হ'তে কার আহ্বান ভেসে আসে? কে? কে আমাকে ডাকে? আমি কোথায়?—তন্নু তন্নু বেটা! আরে কঁহা ছুপ গয়া তু?—

..."বাবা! বাবা! এই ছাখো! কে এসেছে!" সরস্বতী ডাকল।

চোখ মেলে তাকালেন তানসেন। তাকিয়েই রইলেন কতক্ষণ। তারপর ঈষৎ জড়ানো স্বরে বললেন, "প্রেমা! এসেছো!" প্রেমা স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে ডান হাত কপালের ওপর রাখলো। রূপবতী পাশে সরে দাঁড়াল।

এই সময় বাইরে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। বাদশাহ আকবর এসেছেন। চারজন বৈদ্য এসেছেন সঙ্গে। মেহের এসেছে। সঙ্গে বিলাস। সরৎ, সুরত, তরঙ্গও এল। সকলের দিকেই একবার

তাকালেন তানসেন। তারপর বাদশাহকে বললেন, "খোদাবন্দ্! আমার অন্তকাল এসে পড়েছে! মায়ের ডাক শুনতে পেয়েছি আমি। আমাকে আপনি গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন! আমি প্রেমার সঙ্গে চলে যাই।"

বাদশাহ বৈদ্যদের দিকে তাকালেন। চারজন বৈদ্যই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন: "এই অবস্থায় পথের ধকল সহ্য হবে না। পথেই বিপদ ঘটে যেতে পারে।" চারজন বৈদ্যই একমত হয়ে বললেন।

অন্যরা সকলেই বারণ করল। নবাৎও এসেছে। সেও বোঝাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তানসেন বললেন: বেশ! যদি না-ই যেতে দাও তোমরা, দিও না। কিন্তু আমার সমাধি যেন গোয়ালিয়রেই গওস্ আব্বাজীর পাশেই হয়।"

"না, না, মাৎ বোলিয়ে, এ্যায়সে মাৎ বোলিয়ে—"

বাদশাহ আকবর তাঁকে আশ্বাস দিতে গিয়ে নিজেই হু হু করে বালকের ন্যায় কেঁদে উঠলেন। উপস্থিত সকলেরই চোখে জল!

তানসেন মুখ ফিরিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র বিলাসকে কাছে ডাকলেন।

বিলাস এগিয়ে এল। জানু পেতে বসল বাবার শিয়রের কাছে। তানসেন বিলাসের মাথায় ডান হাত রেখে বললেন: সেই গানটা গাও তো বাবা! তোড়ি রাগিনীর সেই ধ্রুপদ গানটি।

বিলাসের দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারার প্লাবন। সে গেয়ে উঠল "কোন্ ভ্রম ভূলোবে মন অজ্ঞানী!—

শুনতে শুনতে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন তানসেন। ...দেখলেন সেই বিহট গ্রামে পৌঁছে গেছেন তিনি আবার ছোট্ট শিশুটি হয়ে, মায়ের সেই ছোট্ট তন্নুটি হয়ে।

"তন্নু! তন্নু বেটা!"...

ছুট্ লাগালো তন্নু মায়ের কোল লক্ষ্য করে—

"মা! "আয়া মা"! অভি আতা হুঁ!..."

॥ সমাপ্ত ॥